আড়কাঠি

ভগীরথ মিশ্র

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

AARKATHI : A Bengali Novel Rs. 40.00 onlty
By Bhagirath Mishra.
Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street
Calcutta - 700 073

প্রকাশক
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ISBN-81-7079-347-5

দাম : চল্লিশ টাকা

মা—

প্রয়াত চারুবালা দেবীর

স্মৃতির উদ্দেশে

এই লেখকের অন্য বই

উপন্যাস

অন্তর্গত নীলস্রোত

তস্কর

গল্প সংকলন

লেবারণ বাদ্যিগর

জাইগেনসিয়া ও অন্যান্য গল্প

ছোটদের জন্য

ছড়ারু গোয়েন্দা

আড়কাঠি

১. গুমো নামে ট্রেন, ঘুমো নামে দেশ

ট্রেনের নাম গুমো-প্যাসেঞ্জার, সবাই বলে ঘুমো-প্যাসেঞ্জার ।

টিকিয়ে টিকিয়ে চলে, যেখানে সেখানে মর্জিমত দাঁড়িয়ে যায় । ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ইঞ্জিন, ভকভকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে নাক-মুখ দিয়ে, যেন শাল পাতার চুটা টানছে দিন রাত । যেখানে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়েই থাকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, নড়ে না, চড়ে না । কি হল হে, এ বাতুয়া রুগীর ? প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় কেউ কেউ । কেউ বলে, ইঞ্জিনে জল লিচ্ছে । কেউ বলে লাইন কিলিয়ার নাই, সিংগেলবাবু সিংগেল লামাতে ভুইল্যে গেইনছেন । কেউ বলে, গার্ডবাবু হাগতে গিছেন হে, হু-ই মাঠের মধ্যে খুলিয়ার ধারে উঁয়ার কালা কোট দিখা যায় । হুড়মুড় করে নেমে পড়ে প্যাসেঞ্জারের দল, প্রতিটি কামরা থেকে, মুরগির ছানার মতো ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে । হাতে-পায়ের আড় ভাঙে আওয়াজ তুলে, মটমটিয়ে গাঁট ফোটায় । জানু অবধি কাপড় তুলে পেচ্ছাপ করতে থাকে প্রকাশ্যে ।

সোল্লাসে গেয়ে ওঠে কেউ : রেলগাড়িটা পাহাল পাড়ে
হুঁকুর হুঁকুর ধুঁয়া ছাড়ে হে–,
বৃইসো রইছে দু-দশ কুড়ি
খাড়াই রইছে হাজার-জন,
হায়রে, অবোধ মন- ।

একজন গায়, দু'চারজন দুয়োর ধরে, বাকিরা দাঁত গিজুড়ে হি-হি করে হাসে ।

এমনই এ গাড়ি, একবারটি হাওড়ার ইস্টিশনে যদি চড়েছো তো নাববার কথা বেমালুম ভুলে যাবে । দিন যাবোক, রাত যাব্যেক, ভোর হবোক, ততক্ষণে তুমি পৌছুবে বাঁকুড়া ইস্টিশনে । অতএব ভাবনা নেই তোমার, উঠে যখন পড়েচ, কাল সকালের আগে নামা নেই। কাজেই, ঘুমো, সারারাত নিশ্চিন্তে ঘুমো, রেলগাড়ি তোমার ঘুম ভাঙিয়ে বাঁকুড়া ইস্টিশনে নামিয়ে দিয়ে, তবে যাবে ।

ঘুমোচ্ছে অনেকেই, গাড়িময়, প্রতিটি কামরায় । সিটে-বাঙ্কে, মেঝের ওপর, ভূতের মতো পড়ে পড়ে ঘুম মারছে কাতারে কাতারে মানুষ । এমন কি সর্বাঙ্গ গেরুয়া বসনে মোড়া যে বাউলটি এতক্ষণ গানে গানে মাতিয়ে রেখেছিল পুরো কামরাটি, সেও একতারাটি পাশে নামিয়ে রেখে চোখ বুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে । বড় অদ্ভুত আচরণ মানুষটির । খালি একের পর এক গান গাইছিল আর ফিক ফিক করে হাসছিল । সেও এখন নিদ্রায় অচেতন । শুধু কয়েক জনের চোখে ঘুম নেই । রাজীব, তার চোখে ঘুম আসছে না কিছুতেই । বুকের মধ্যে কে যেন মোলায়েম চিরুনি চালাচ্ছে অবিরাম । মৃদু রোমাঞ্চ শিরায় শিরায় । ততোধিক আরাম, সুখ । আজ বড় সুখের দিন, সৌভাগ্যের, ইচ্ছা-পূরণের ।

ঘুম আসে না সুচাঁদ ভক্তার চোখে, মাদল মল্লিক, কান্‌চা মল্লিক, বদন কোটালের চোখে। সরেস্বতী সবর, কৌশল্যা সবর আর রঙী কোটালের চোখেও ঘুম নেই এ রাতে। শুয়ে-বসে রয়েছে বটে কামরার এখানে ওখানে, কিন্তু চোখের পাতনি জোড়া লাগছে না পলকের তরে। সবাইয়েরই বুকের মধ্যে ঐ চিরুনি চালানোর শিরশিরানি।

রাজীব জানালা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে বাইরের দিকে। ছুটে চলেছে ট্রেন, দু'পাশের গাছ-পালা, কালি-ঝুলি মাখা দৃশ্যপট হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। আকাশ-পাতাল ভাবছে রাজীব, ভাবনায় ডুবে যেতে ভাল লাগছে তার।

মাস্টারজি,- সহসা রঙলাল দাঁড়ায় চোখে সামনে, মিচিক মিচিক হাসে। বলে, এদেশে লাচ দেখিয়ে পেট ভরে না মাস্টারজি, বরং লাচতে লাচতে, বিল্‌কুল খালি হয়ে যায়। কথাটা রাজীবকে বলেছিল রঙলাল, একবার নয়, তিন বছরে কথাটা একাধিকবার বলেছে। আর, এ ধরনের কথা বলতে গিয়ে রঙলালের মুখে, চোখে, কপালের বলিরেখায়, প্রত্যেকবারই জমে ওঠে গাঢ় শ্লেষ্মার মত শ্লেষ। আর, সেই শ্লেষের পরতে পরতে এতখানি বিষ যে রাজীবের মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে, পিছু হটি, পালিয়ে যাই। সুতপাও বলেছিল, ঠাট্টা করে নয়, গভীর আশঙ্কা থেকে বলেছিল, স্বপ্ন তো, তাই ভয় হয়, ভাঙতে কতক্ষণ। বহরমপুর কলেজে চাকরি পেয়ে চলে গেছে সুতপা। ওখান থেকেই চিঠি লিখেছে রাজীবকে। লিখেছে, তুমি গিয়েছ বাঁকুড়ায়, আমি চললুম বহরমপুর। কোলকাতায় থাকতেও দেখা-সাক্ষাৎ কমছিল। এবারে আরও কমল। কবে কিভাবে দেখা হবে কে জানে। বাঁকুড়ায় এক স্বপ্নের জগৎ আবিষ্কার করেছ জেনে অভিনন্দন। তবে স্বপ্ন তো, তাই ভয় হয়, ভাঙতে কতক্ষণ! তোমার হাতে চিরকালই সময় কম থাকত আমার জন্য, এবার আরও কমল। সুতপার চিঠিখানা রাজীবের পকেটেই রয়েছে। খুব জলদি একটা জবাব দেওয়া দরকার। রাজ্যমেলায় এতখানি সাফল্যের পর সুতপাকে সেটা না জানানো ঘোরতর অন্যায় হবে। কেমন করে জানাবে রাজীব! কোন্‌ বাক্যবন্ধ দিয়ে প্রকাশ করবে তার সাফল্যের খবরটি! ভাবতে ভাবতে তার সামনে ভেসে ওঠে রাজ্য মেলার সমগ্র দৃশ্যপট। গ্রীনরুমের টুকরো টুকরো দৃশ্য। মেক-আপ করছে শিল্পীরা, রাজীব ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে, টুকিটাকি নির্দেশ দিচ্ছে, সাহস জোগাচ্ছে, আড়ষ্টতা ভাঙছে। একসময় মঞ্চের ঘোষণা শুনতে পায় সে : রাজ্য লোক-উৎসবের শেষ উপস্থাপনা : মঞ্চে আসছেন বাঁকুড়া জেলার গজাশিমুল সংস্কৃতি-সংঘের শিল্পীরা।

চাপা টেনশনে সিগারেট ধরায় রাজীব। উইংস্‌-এর পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। ইশারায় নির্দেশ দেয়। ঘন্টা বাজে। স্পট লাইটের আলো জোরাল হয়। বেজে ওঠে ধাম্‌সা, মাদল, চাং, বাঁশির সমবেত অর্কেস্ট্রা। এক সময় শুরু হয় নাচ।

বুঝতে পারেনি রাজীব, কখন সুঁচাদ এসে দাঁড়িয়েছে পাশটিতে। ওর মুখ-চোখ ফ্যাকাশে, রাজীব দেখে। সুঁচাদের পিঠে নিঃশব্দে হাত রাখে রাজীব।

নাচ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হাততালির শব্দে চমকে ওঠে দুজনেই। রাজীব ততক্ষণে বুঝে গিয়েছে, কি ঘটতে চলেছে একটু বাদেই। প্রবল উত্তেজনায় সে জড়িয়ে ধরে সুঁচাদকে।

মন্ত্রীর দেওয়া মডেল গলায় ঝুলিয়ে ওরা যখন মঞ্চ থেকে নেমে আসছিল একে একে, তখনই এলেন সেই নীল-নয়না শ্বেতাঙ্গিনী। রিমলেস চশমার আড়ালে এক জোড়া পরিতৃপ্ত

উজ্জ্বল চোখ। রাজীবের দু'হাত সজোরে ঝাঁকিয়ে বললেন, কনগ্রাচুলেশনস্ প্রফেসর চৌধুরী, তুমি একেবারে কামাল করে দিয়েছ। এমনটা আমি সত্যিই কল্পনাও করি নি। ফ্যানটা-স্টিক!

জবাবে সলজ্জ হাসে রাজীব, থ্যাঙ্ক য়্যু, ম্যাডাম।

'আই অ্যাম ক্যাথি বার্ড, ইস্ট-ওয়েস্ট ফোক ফাউণ্ডেশন-এর ইস্টার্ন জোনের ডিরেক্টর। সত্যি প্রফেসর, তুমি একটা মার্ভেলাস কাজ করে ফেলেছ।'

'আমি কিছুই করিনি, ম্যাডাম।' রাজীবের গলায় দারুন অস্বস্তি, 'যা করবার ওরাই করেছে। অভিনন্দন ওদেরই প্রাপ্য।'

'অবশ্যই, তবে তোমার কৃতিত্বও কিছু কম নয়। তুমিই এদের আবিষ্কার করেছ, গভীর জঙ্গল থেকে একথোকা বুনো ফুল এনে উপহার দিয়েছ আমাদের।'

অস্বস্তিটা চাপা দিতে রাজীব প্রসঙ্গ বদলায়, 'ওদের গানের কথাগুলো নিশ্চয়ই বুঝতে পার নি।'

ক্যাথি বার্ড হাসে, 'পেরেছি বৈকি।'

'সে কি! আপনি ওদের ডায়ালেক্ট বোঝেন?'

'তা অবশ্য বুঝি নে। তবে ফুলের গন্ধ উপভোগ করবার জন্য গাছ-বিশেষজ্ঞ হতে লাগে না। ডু য়্যু গেট ইট?'

'বুঝেছি।' মৃদু হাসে রাজীব।

'তোমাদের ঐ গজাশিমুলে আমাকে নিয়ে যাবে না?'

'অবশ্যই।' রাজীবের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, 'কবে যাবে, বল?'

'খুবই তো ইচ্ছে করে, কিছু সময় যে বড় কম। ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ার অতগুলো রাজ্য দৌড়ে বেড়াতে হয়। তবে যাব আমি, যাবই। চিঠি দিয়ে জানাব তোমায়। তোমার ঠিকানাটা দাও তো।'

রাজীবের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে রঙী, কৌশল্যা, সরেস্বতীদের দিকে সোল্লাসে এগিয়ে যায় ক্যাথি বার্ড। বুক চাপড়ে সাবাস জানায়। রঙীর গাল টিপে দেয়। বলে, 'ব্রেভ গার্ল, একটুও ভয় পাও নি।'

ভয়ে, আশঙ্কায় এতক্ষণ কাঁটা হয়ে ছিল রঙী-সরেস্বতীরা। সাহস পেয়ে লাজুক ঠোঁটে সামান্য হাসে। ক্যাথি বার্ড সবাইকে 'উইশ' করে মিষ্টি হেসে বিদায় নেয়।

ঘটনাগুলো যেন স্বপ্নের মত লাগে রাজীবের। বিশ্বেস করাও বুঝি কঠিন। আরও কঠিন সেসব কথা সুতপাকে ঠিক ঠিক বুঝিয়ে লেখা। রাজীব আস্তে আস্তে বুক পকেটে হাত রাখে। সুতপার চিঠিখানার উত্তাপ পায় হাতের তালুতে। মনে মনে সুতপার চিঠির জবাব তৈরি করতে থাকে রাজীব। আর সুতপার কাছে এমন ঘটনা ব্যাখ্যা করার কথা মনে হলেই তার মনে পড়ে যায় প্রিয় কবিতার পংক্তিগুলি : সূর্য উঠছে, সূর্য উঠছে, সূর্য উঠছে, বান্ধবি/ শোণিত-সিক্ত জননী গর্ভ ছিন্ন জেগেছে সূর্য/সুস্থ সুবাহু, সুন্দর শিশু তোমার আমার, বান্ধবী তোমার দেহের আরতি জ্বালানো এ শিশু আমার সূর্য।।

সুতপাকে আনা যায় না, বাঁকুড়ার কোনও কলেজে? সুতপা কাছে থাকলে, রাজীবের দৃঢ় বিশ্বাস, অনেক কঠিন কাজও সহজ হয়ে যাবে ওর কাছে। সুতপাকে একেবারে পাশটিতে পাওয়া যায় না, এমন সূর্য-শিকারের দিনে!

আজকের দিনে একটু ফুরফুরে, একটু চাপ মুক্ত, থাকতে চাইছে রাজীব। বড়ই ধকল গেছে বিগত ছ'টি মাস, বড়ই উৎকণ্ঠায় কেটেছে। কিন্তু ফুরফুরে হতে পাচ্ছে না কিছুতেই। সাফল্যের পরিতৃপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে এক ধরনের গুরুভার যেন চেপে বসেছে মগজে। রঙলালের কথাগুলো কিছুতেই ভুলতে পারছে না রাজীব : মাস্টারজি, এ দেশে লাচ দেখিয়ে পেট ভরে না, বরং লাচতে লাচতে পেট বিলকুল খালি হয়ে যায়। রঙলালের মুখখানা মনে পড়ছে রাজীবের। এবার বোধ করি ওকে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে, নাচের মত নাচ হলে, পেট ভরে। বোঝাতেই হবে এটা, না বুঝিয়ে কোনও উপায় নেই রাজীবের। এখন তার আর পিছু হটবার উপায় নেই কোনও।

মায়ের মুখখানা মনে পড়ছে এই মুহূর্তে, জীবনের প্রতিটি সঙ্কটকালে মনে পড়েছে অতীতে। এই আধো অন্ধকার ট্রেনের কামরায় মুখখানি কত উজ্জ্বল, ভাস্বর। আসলে, অন্ধকার রাতেই মায়ের মুখখানি বেশি করে ভাসে। শান্তিপুরের বাড়িতে রয়েছেন তিনি, দাদার সংসারে। বউদি একটু মুখরা, মাকে মাঝে মাঝেই কষ্ট দিয়ে ফেলে। মায়ের দৃঢ় বিশ্বাস, তার আদরের ছোট খোকার বউ তাকে কষ্ট দেবে না। সেই কারণে, কালে-ভদ্রে শান্তিপুরের বাড়িতে গেলেই ইদানিং মায়ের দুচোখ কারণে- অকারণে ছলছলিয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে এক দুর্বোধ্য করুণ চোখে তাকিয়ে থাকেন তিনি রাজীবের দিকে। নিজেকে তখন বড় অসহায় লাগে, বড় অপরাধী। বেশ কিছুদিন ধরে মন হয়ে উঠেছিল অস্থির, মায়ের জন্য। সুতপাকে বিয়ে করে মাকে কাছে নিয়ে এসে, কোলকাতায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে..., তখনি তো বাঁকুড়া কলেজে চলে আসতে হল। তাছাড়া, সুতপাও প্রস্তুত ছিল না। তার বাবা রিটেয়ার করেছেন, মা দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী, দুটি ভাইই বেকার। রাজীব সুস্পষ্টভাবেই বলেছিল, এর সঙ্গে বিয়ের তো কোনও সম্পর্ক নেই, কারণ, বিয়ের পরও তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার দায়িত্ব পালন করতে পারবে। কেউ বাধা দেবে না তোমায়।

সুতপা রাজি নয়। এ ব্যাপারে তার স্পষ্ট বক্তব্য : তোমরা ছেলেরা বিয়ের আগে যতটা উদার, বিয়ের পর ততটাই ফিউডাল। বিয়ের মালা শুকোতে না শুকোতেই বাপের সংসারে টাকা দেবার জন্য খোঁটা দেবে। অথচ বুঝতেই পারছ, অন্তত একটা ভাই চাকরি না পেলে, আমার টাকা দেওয়া বন্ধ করবার কোনও উপায় নেই। মধ্য কোলকাতার একটি স্কুলে পড়াত সুতপা। মাস দুয়েক হল চাকরি পেয়েছে বহরমপুর কলেজে। ওখান থেকেই গাঢ় অভিমানে চিঠি লিখেছে। জবাব দিতে হবে সুতপাকে। নিয়ে আসতে হবে কাছটিতে। মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে হবে, শেষ বেলার ম্লান, মধুর হাসি। হাসি ফোটাতে হবে গজাশিমুলের মানুষগুলোর মুখেও। বোকা বানাতে হবে রঙলালকে।

রঙলালকে একেবারে বোকা বানিয়ে না দেওয়া অবধি রাজীবের মনের এই অস্থিরতা কিছুতেই থামবে না।

লাচনের হাট ছেইড়ে, চল্যে যাব লাচনহাটি

রঙী আর সরেস্বতী পাশাপাশি বসেছে। কৌশল্যা একটু শান্ত শিষ্ট, মুখচোরা, সে বসেছে তফাতে। ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে বেচারি। আর, তের-চোদ্দ বছরের রঙী, কুয়োর ব্যাঙ সুমদ্দুরে এসে, তার মুখে খই ফুটছে অবিরাম। ওদের সীটের তলায় রঙচটা একাধিক তোরঙ্গ। তার মধ্যে দলের পোশাক-আশাক, ঘাঘরা, পরচুলা, ঝুটো গয়না, ঘুঙুর, আর রঙ মাখবার

সরঞ্জাম। তা বাদে রয়েছে হারমোনিয়াম, কর্নেট, ফ্লুট বাঁশি, খত্তাল আরও হরেক চিজ। মাথার ওপর কাঠের বাক্সে ধুম্‌সা, মাদল, চাঙু, কাঠের ঘোড়া, বলদ, তীর-ধনুক, মুখোশ, ‑ ডাঁই করে রাখা। কামরার অন্য যাত্রীরা ভুলভুল করে তাকিয়ে থাকে। কে গ' তুমরা ? কুত্থেকে এলে ? কুথাকে যাবে বটে ? আমরা বটে গজাশিমুল গাওন পার্টি, গিছল্যম কইল্‌ক্যাতায়, সরকারি মেলায় লাচ দেখাতে। লাচ-গান হল, মেডেল পেল্যম, টাকা পেল্যম, বাবুরা খোব নাম কল্লেক, এবার ঘরে ফিরবার পালা। বলতে বলতে যেন নিজেদের বুকেই অবিশ্বাস জমে। সত্যিই এসব? নেহাৎ স্বপন-টপন লয় তো! বাঁকুড়ার ঘোর জঙ্গলের মধ্যিখানে কোন্ এক অজাগাঁ গজাশিমূল, সেই গাঁয়ের গুটিকয় বসু-শবর জাতের ছেলে মেয়ে কিনা খোদ কলকাতার মেলায় লাচ-গান দেখিয়ে মেডেল নিয়ে ঘরে ফিরছে। এও কি সম্ভব! রঙীদের মুখোমুখি বসেছে দলের গাইয়ে বদন কোটাল, দলের ওঝা গুণিন-দাদু, আর শ্যামসোন্দর। বদন কোটাল আর গুণিন-দাদু এ-ওর গায়ে লেপটে গিয়ে ঘুমিয়ে কাদা। শুধু শ্যামসোন্দরের চোখে ঘুম নেই।

পুরুল্যার ছৌ-নাচের দলটিও ফিরছে এই গাড়িতে। কয়েকটা বগি আগে রয়েছে ওরা। শ্যামসোন্দর ঐ দলের শিল্পী। রাজ্য মেলাতেই আলাপ পরিচয় হয়েছিল দু'দলের শিল্পীদের।

একটু আগে গাড়ি থেমেছিল কোন্ একটা ইস্টিশনে। শ্যামসোন্দর পায়ে পায়ে উঠে এসেছিল রঙীদের কামরায়। এর ওর সঙ্গে গল্প-গাছা করতে এমনই মশগুল ছিল সে, গাড়ি যে ছেড়ে দিচ্ছে সেটা খেয়ালই নেই তার। ফলে, নামতে পারল না বেচারা। বদন কোটালই ওর উরুতে চাপ্পড় মেরে বলেছে, আরে স্যাঙাত, তুমার কামরা ত এ গাড়ির সঙ্গেই যাব্যেক। চুপটি কইর্যো বুইস্যে থাক, পরের ইস্টিশনে নেইম্যে যাবে। শ্যামসোন্দরকে পাশটিতে থাপনা করেই অতল ঘুমের রাজ্যে চলে গেছে বদন কোটাল। শ্যামসোন্দর আর ঘুমোতে পারছে না কিছুতেই।

ছেলেটাকে ক'দিন ধরেই রাজ্যমেলায় দেখেছে রঙী। কোঁকড়ানো চুল, একমাথা। ভাসা ভাসা চোখ। সারা মুখে শিশুর সরলতা। আর, খালি হাসে। দেখাদেখি চোখাচোখি হলেই হাসে। কথা বলে কম, শুধু প্রতি কথায় দু'ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেবিয়ে আসে ফিনকি দিয়ে হাসি। অকস্মাৎ গাড়িটা ছেড়ে দেওয়াতে শ্যামসোন্দর নামতে পারে নি, সবাই এটা ধরে নিলেও, রঙীর যেন কথাটা বিশ্বেস হতে চায় না কিছুতেই। ভাবতে গিয়ে কানের লতি শিরশির করে ওঠে রঙীর। এক সময় শ্যামসোন্দর শুধোয়, তুমরা রাত্তির ব্যালায় কি খাবে বটে ?

হায় বাপ, এ আবার কেমন প্রশ্ন! রঙী সেটা জানবে কি করে ? রঙীর চোখে বিজুলী চমকায়, কী খাব্যেক, নাই খাবেক, সিট্যা ঠিক কইর্‌বেক মাস্টারদা, ঠিক কইর্‌বেক দলের ম্যানেজার সুঁচাদ ভক্তো। উয়ারাই ত মাথা। আসলে এসব শ্যামসোন্দরের বাহানা ; কথা বলবার ফিকির, রঙীর বুঝতে কষ্ট হয় না। মেয়েরা বোঝে। রঙী অর্থপূর্ণ চোখে তাকায় সরেস্বতীর দিকে। চোখের কোণে ঝিলিক মারে হাসি। মুখ টিপে টিপে হাসছিল সরেস্বতীও। বলে, বল্, জবাব দে, কী খাবি রাইতের বেলায়।

আসলে, বিনপুর থানার লাচনহাটি গাঁ, সেখান থেকে রঙীকে দেখতে এসেছিল হপ্তাটাক আগে। ছেলেটি তাগড়া জোয়ান। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মুখে পুরুষালি হাসি। পছন্দ হয়েছে রঙীকে। লোক মারফত সে খবরটি পাঠিয়েছে ছেলে। এসব তো জানে না শ্যামসোন্দর।

সে জানবেই বা কী করে ! ভাবতে গিয়ে রঙীর ঠোঁটের কোণে ঝিলিক মারে হাসি । কিন্তু রাজীব মাস্টার জানে সেটা । সেই নিয়ে মাস্টারদা বুঝি ঈষৎ চিন্তিত । সেদিন একহাট লোকের সামনে বলে উঠল, তুই তো চললি লাচনহাটি, এদিকে লাচনের হাটে গিয়ে আমাদের কী দশা হবে ভেবেছিস ? ভীষণ লজ্জা পেয়ে রঙী পালাতে চায় সুমুখ থেকে । সুচাঁদ ভক্তা বলে ওঠে. যাবি নাই রঙী, গাঁয়ের নামটি লাচনহাটি, লাচুনি মেয়াদ্যার হাট সিখ্যেনে । রঙী সুচাঁদকে পারলে, মারে ।

এ দেশের বারো আনা মানুষেরই ঘুম ভেঙে যায় খিদেয়

খড়কপুর ইস্টিশনে গাড়ি থামতেই ধীর পায়ে নেমে গেল শ্যামসোন্দর । এমন মধ্যরাত ।

এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াবে গাড়ি, জল নেবে, ইঞ্জিন বদলাবে । ঘুম ভেঙে যায় কামরার যাত্রীদের । উঠে বসে চোখ রগড়ায় ওরা । কেউ কেউ ঘুম ঘুম চোখে নেমে পড়ে প্ল্যাটফর্মে ।

সুচাঁদ ভক্তা দলের ম্যানেজার । সব ঝক্কি তার । টাকা-পয়সাও তারই হেফাজতে । রাজীবের সঙ্গে আলোচনা করে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ে সে । জান্‌লা দিয়ে কামরার ভেতরে হাঁক পাড়ে, খাবে-দাবে তো তুমরা । নাম্‌ছ নাই ক্যানে ?

সে কথায় হৈ হৈ করে ওঠে সবাই । যারা নামে নি তখনও, হুড়মুড়িয়ে নামে ।

ঠেলাগাড়িতে আঁচ লাগানো । পুরি ভাজা চলছে । গরম তেলে ফুলকো পুরিগুলো নাচতে থাকে । হিংয়ের চড়া গন্ধ ভেসে আসে নাকে । কড়াইখানাকে গোল করে ঘিরে ধরে ফুটন্ত তেলের মধ্যে গোলাকার পুরির নৃত্য দেখতে থাকে মানুষগুলো । পাশেই এনামেলের ডেকচিতে ঝোল-ঝোল তরকারি । হুতহুতিয়ে ধোঁয়া উঠছে ডেকচি থেকে । সুচাঁদ এগিয়ে গিয়ে দরদস্তুর শুরু করে । শালপাতার ঠোঙায় ভরা খাবারগুলো ধরিয়ে দেয় হাতে হাতে। চারখানা করে পুরি, সঙ্গে তরকারি । একটা করে বোঁদের লাড্ডু । পরম তৃপ্তিতে খেতে থাকে সবাই । কথায় কথায় খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ।

গাড়ি থামবার সঙ্গে সঙ্গেই প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়েছিল বাউলটি । সে এখন মাঝ-প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে নেচে নেচে গান ধরেছে :

> সময় হইল্যাক, যাই ফিরে যাই, ভবের খেলা শেষ ।
> (এতদিন) ছিল্যম যেন পিঁজরাতে পাখি—
> (যেন) গুয়াল-ঘরে ছাগল-মেষ
> ভবের খেলা শেষ... ।

গোল করে ওকে ঘিরে ধরেছে মানুষজন, খেতে খেতে গান শুনছে আর বাহবা দিচ্ছে। বাউল ধরে :

> খাইল্যম-দাইল্যম, বিয়া কল্ল্যম
> ঝলক-ঝালক বসন পইর‍্যাল্যম
> বছর-বছর ছা' বিয়াল্যম্, ভরাঁই দিল্যম ভারত-দেশ
> ভবের খেলা শেষ... ।

গান শেষ করে থামে বাউল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, মুখে মৃদু হাসি । চারপাশের জনতা সোল্লাসে সাবাস জানাচ্ছে, কিন্তু তাতে ওব সামান্যতম ভাব পরিবর্তন ঘটে না ।

সুচাঁদ এগিয়ে গিয়ে ওর হাতেও ধরিয়ে দেয় একখানা খাবারের ঠোঙা । 'জয় গুরু' বলেই পরম তৃপ্তিতে খেতে থাকে মানুষটি, সুচাঁদের দিকে ফিরেও তাকায় না ।

'আরে গুনিন-দাদু যে খাইল্যাক্ নাই ।' কে যেন বলে ওঠে সহসা ।

'উ এখন গ্যাঁজার লিশায় লিশ্চেতন ।'

'আরে ডাক হে উয়াকে । বুড়া মানুষ, রাইতভর উপাস থাইক্‌বেক নাকি ?'

'অ গুনিন-দাদু, উঠ, খেইয়েঁ লাও ।'

দলের সঙ্গে একজন গুনিনও এসেছে । রাজীবের ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু দশরথ ভক্তা সাবেক কালের লোক । বলে, উই দূরদেশে গিয়ে আসর সাজাবে তুমরা, গুনিন না হইলে চলে ? আসর বন্ধ কইর্‌বেক কে ? মন্তর পইড়ে আসর বন্ধ না কইর্‌লে, যদি কুনো বিভ্রাট ঘটায় উ দেশের কুনো গু-খাবা-বিদ্যা-জানা লোক ! সব ক'টার মুহে রক্ত উঠব্যেক নাই ?'

ঠেলা খেয়ে, উঠে বসল গুনিন । লাল চোখে দেখতে লাগল চারপাশে । সরেস্বতী ওর হাতে বসিয়ে দিল একটা ঠোঙা । ঠোঙাখানি হাতে ধরেই বসে রইল সে । নড়লও না, চড়লও না ।

প্ল্যাটফর্মে সুচাঁদ ভক্তা তাড়া লাগায় সবাইকে, জলদি জলদি খেইয়েঁ লে সব । পেট পুরে জল খা । কাল সকাল ব্যালায় বাঁকুড়ায় নামল্যে ফের খাবা দাবা । তার আগে লয়।

পুরুল্যার ছৌ-লাচের দল ভিড় করেছে পাশাপাশি আর এক ঠেলাগাড়ির চারপাশে । দূর থেকে শ্যামসোন্দরকে দেখতে পাচ্ছিল রঙী । দেখতে দেখতে ওর লালচে ঠোঁট অল্প ফাটতে থাকে । চকিতে মনে পড়ে যায় লাচনহাটির তাগড়া জোয়ানটির মুখ । কিশোরী-বুকখানি উথাল-পাথাল ।

সরেস্বতীর চোখ এড়ায় না ব্যাপারটা । সে ঠোঁট টিপে হাসে । ফিসফিসিয়ে বলে, 'কি রে, ছগ্‌রাকে পসন্দ তুয়ার ?'

রঙী ডাগর চোখে তাকায় সরেস্বতীর দিকে, অকস্মাৎ খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ।

সরেস্বতী বলে, 'দু'টা লিয়ে কইর্‌বি কি ? লাচনহাটির্‌টা দিয়ে দে আমাকে ।' রঙী সহসা বেজায় ক্ষেপে যায় । সজোরে চিমটি কাটে সরেস্বতীর পিঠে ।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে প্ল্যাটফর্মের টেপাকলে জল খায় ওরা । রঘুনাথ কোটালকে সরলপানা পেয়ে ওকে দিয়ে কল টিপিয়ে নেয় সবাই । একে একে কামরায় উঠে পড়ে রঙী-সরেস্বতীরা । পানওয়ালাকে খুঁজতে থাকে কেউ কেউ, চারপাশে চোখ চারায়, এগিয়ে যায় দু'চার কদম । সুচাঁদ ভক্তা হিসেব-নিকেশ করে দর-দাম মিটিয়ে দেয় ।

বাইরে তখনও খাওয়া দাওয়া সারছে পুরুল্যার ছৌ-লাচের দল । এইমাত্র শেষ পুরিখানি উদরস্থ করে, এখন পরম তৃপ্তিতে আঙুলগুলো চাটছে শ্যামসোন্দর । জানলা দিয়ে দৃশ্যখানা দেখতে দেখতে এক সময় খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে রঙী ।

'কি হল্যাক ?' পাশ থেকে শুধোয় সরেস্বতী । রঙীর হাসি আর থামতে চায় না কিছুতেই । ওকে সজোরে ঠেলা মারে সরেস্বতী, 'অ্যাই রঙী, কি হল্যাক তুয়ার ?'

রঙী আঙুল তুলে শ্যামসোন্দরকে দেখায়, 'ক্যামন হ্যাংলার মতন হাত চাইট্‌ছে, ভাল।'

সরেস্বতী এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রঙীর মুখের দিকে। এ ক'দিনে রঙীর মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। মুখচোরা লাজুক মেয়েটি সহসা প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে।

প্ল্যাটফর্মের এককোণে দাঁড়িয়ে এক ভাঁড় চা খেয়ে নিচ্ছিল রাজীব। সুচাঁদ একটা পান খেয়ে ফিরে এল। দাঁড়াল রাজীবের পাশটিতে। সামান্য গম্ভীর লাগছিল রাজীবকে।

'আমি কি ভাবছিলাম জানিস সুচাঁদ,' ভাঁড়ের চা-টুকু শেষ করে রাজীব বলে, 'দলে মেয়েদের সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার।'

'তুমি কি সর্বক্ষণ খালি দলের কথাই ভাইব্‌ছ ? অন্য কুনো ভাবনা আসে না মনে ?' সুচাঁদ মৃদু হাসে, পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে এগিয়ে দেয় রাজীবের দিকে, 'লাও, ধর।'

'তোকে না আমি বলেছি, দলের এজমালির ফাণ্ড থেকে আমার জন্য একটা পয়সাও খরচ করবি না।' রাজীব যারপরনাই বিরক্ত, উত্তপ্তও বটে, 'অনেক টাকা হয়েছে তোদের, তাই না ?'

সুচাঁদ বুঝি অতখানি ভাবে নি, সামান্য ভয় পায় সে রাজীবের রুদ্ররূপ দেখে।

গলা নামিয়ে বলে, 'ঠিক আছে, আর হব্যেক নাই। এবারের মতন লাও ক্যানে।'

আস্তে আস্তে হাতখানা বাড়ায় রাজীব, প্যাকেটখানা ধরে, 'তোদের এই অ্যাতো পরিশ্রমের টাকায় সিগারেট খাব আমি ! তোরা আমাকে ভাবিস কি !' ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসে রাজীব। মোলায়েম গলায় বলে, 'আমার জন্য তোদের একটি পয়সাও খরচ করতে হবে না, একটি পয়সাও না। তোরা নিজেরা শক্ত হয়ে দাঁড়া দেখি নিজের পায়ে। শুধু রঙলালকে নয়, আমি সারা দুনিয়াকে দেখাতে চাই ব্যাপারটা। চল্‌, কামরার দিকে যাই, গাড়ি ছাড়বার সময় হল।'

ওরা এগোতে থাকে কামরার দিকে। এমন দম আটকানো অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে সুচাঁদ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

শিকল-খুলা পক্ষী আবার পিঁজরাতে সেঁধায়

বাঁকুড়ায় যখন গাড়ি পৌঁছুলো, তখন ডালে-পালায় বেলা। সবাই জেগে উঠেছে খানিক আগে। তখন গাড়ি ভেদুয়াশোলের কাছাকাছি। সেই থেকে শুরু হয়েছে হুড়োহুড়ি, মালপত্তর গুছিয়ে গাছিয়ে দরজার পাশে জড়ো করা। কামরাময় দাপাদাপি জুড়েছে সুচাঁদরা। ঘুম কাতুরেরা চোখ বুঁজে বিরক্তিতে গাল পাড়ছে সুচাঁদদের। সুচাঁদ হাসে। বলে, উঠ্‌ শালা, বাঁকুড়া ইস্টিশনে সবার ঘাড়ে চাপাই দুবো বোঝা। সোজা বয়ে লিয়ে যেইত্যে হব্যেক তামলিবাঁধ। ঘুমটা তখন টুইট্যে যাব্যেক তুয়াদ্যার। সত্যি, কেবল বাঁকুড়াতে পৌঁছুলেই তো হল না, তারপরেই তো আসল দিগদারি। ঝিলিমিলি বাসের মাথায় সব মাল-ঝাল চাপাতে হবে, রানীবাঁধে সেগুলো নামাতে হবে, সেই বোঝা জনে জনে মাথায় নিয়ে দিনভর হাঁটবে। পাহাড় ডুংরী, খুলিয়া-খোবর ধরে পায়ে পায়ে এগোতে হবে গজাশিমূলের দিকে। গাঁয়ে পৌঁছুতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

হাসতে হাসতে সুচাঁদ বলে, 'লিদাবি কি রে ? দিনভর হাঁটত্যে হাঁটত্যে কোমরের কষি খুইলে যাব্যেক।'

সে কথায় ঘুম কাতুরে ছোকরাগুলোর মুখে গালাগালের মাত্রা বেড়ে যায়।

ট্রেনটা বাঁকুড়া ইস্টিশনে এসে দাঁড়ায়। তড়িঘড়ি হাত লাগিয়ে মাল নামাতে থাকে সবাই। রাজীব আর সুচাঁদ তদারকি করতে থাকে। যে সব যাত্রী এখান থেকে উঠবে তারা ভীড় করেছে দরজার মুখে। ওঠার জন্য ঠেলাঠেলি জুড়েছে। মানুষগুলোর চোখে মুখে চাপা অস্থিরতা, রাত উজাগরের ক্লান্তি, বিরক্তি...। এই গাড়িটার বাঁকুড়াতে পৌঁছানোর কথা ছিল শেষ রাতে। সেই সুবাদে আশায় আশায় প্ল্যাটফর্মে বসে রাত কাটিয়েছে গাঁ-গঞ্জের যাত্রীরা। অল্প আওয়াজে চমকে চোখ খুলেছে। ঐ বুঝি গাড়ি এল! পর মুহূর্তে এলিয়ে পড়েছে পাশের যাত্রীর ঘাড়ের ওপর। নাহ, এ মোদ্যার গাড়ি লয়। ইট্যা মালগাড়ি। ধুশ্ শালা!

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে সমানে গজগজ করে চলেছে এক থুত্থুরে বুড়ো। সর গো তুয়ারা, উঠতে দে। কখন আইবার কথা, কখন পৌঁছাল্যাক গাড়ি। রেইতভর উজাগর! বুড়োর কাঁধে একখানা পুটলির ঝোলা, আর হাতে একখানা খেজুরপাতার তালাই। বার্ধক্যের দরুণ হাত-পা সর্বক্ষণ তিরতিরিয়ে কাঁপছে। জিভখানা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে মুখময়। বুড়ো অবিরাম বকে চলেছে, বলে চলেছে নিজের পরিচয়, গন্তব্যস্থল, ভ্রমণের উদ্দেশ্য, আরও হাবি-জাবি অনেক কথা। নিজের থেকেই বলে চলেছে এসব : বাড়ি ওর দ্বারকেশ্বরের ওপারে আড়াল-বাঁশি গাঁয়ে। চলেছে মেয়ের-মেয়ে-লাতুনের বিয়ে উপলক্ষে আদ্রার কাছাকছি কোনও গাঁয়ে। লাত-জামাইকে উপহার দেবার জন্য নিয়ে চলেছে খেজুর পাতার চাটাইখানি। কিন্তু ভারি চিন্তায় পড়েছে বুড়ো। সন্ধ্যের আগে পৌঁছুবে তো আদ্রায়? চলার যা ছিরি এটার! এ তো ভারি ভাবনার কথা!

'ত, অতই যখন জরুরী, একদিন আগেই রওনা দিলে নাই ক্যানে, দাদু?'

'কি কইর‍্যে রওনা দিব রে চাঁদু? শালা ভুতুম দাস তালাইটা ডিলিভারি দিতেই দেরি কল্ল্যাক যে। শালা অধম, টাকা লিল্যাক ষোল আনা— ।'

কান্‌চা মল্লিক ফক্কড় ছোকরা, মুচকি হেসে বলে, 'টুকচান্ সবুর ধর দাদু, রেলগাড়ি তুমাকে না লিয়ে যাবেক নাই।'

'আর দ্যাখ,' পাশ থেকে ফুট কাটে মাদল মল্লিক, 'অমন সোন্দর তালাই দেইখলে লাতুন তুমার গলায় না দিয়ে দেয় মালাটা।'

রুষ্ট চোখে তাকায় বুড়ো। খেজুর পাতায় তালাইখানা বগলে জাপটে ধরে ঠেলাঠেলি জুড়ে দেয়।

সহসা গাড়ির ভেতর গান ধরে বাউলটি :

ঢের খেলা খেলছিস যাদু, ইবার ফিরে আয়,
উ যেন শিকল-খুলা পক্ষী আবার পিঁজরাতে সেঁধায়
ইবার ফিরে আয়— ।

গানের কলিগুলি গুমরে ওঠে রেলের কামরায় কামরায়। সকালের ভিজে ভারি হাওয়ায় সুরেলা গলাখানি ছড়িয়ে পড়ে ইস্টিশনের আনাচে কানাচে। চলে যেতে যেতেও ফিরে চায় কেউ কেউ, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, দু'দণ্ড শোনে, গাড়ির জানলার খোপে খোপে ভিড় জমে যায়। গাইতে থাকে বাউল :

(ওরে) নাম দিয়েছিস পদ্মবন, তায় পদ্ম ফুটে না
রাত পুহালেও দিন আইসে না, সূয্যি উঠে না

অমন মোদের ফাটা কপাল, চুন লেইপ্যে বুজানো দায়
ইবার ফিরে আয় ।।

উল্লাসে ফেটে পড়ে চারপাশের জমায়েত । তালাই বগলে জাপটে সহসা উদাস হয়ে 'যায় থুত্থুড়ে বুড়োটি ।

ট্রেনের বাঁশি বেজে ওঠে, একসময় ছেড়ে দেয় । গান থামিয়ে হাসে বাউলটি । হাত নেড়ে বিদায় জানায় সুচাঁদদের । চড়া গলায় ধরে গানের পরের কলিটি । কিন্তু চলন্ত ট্রেনের আওয়াজে সে কলি আর সুচাঁদদের কান অবধি পৌঁছায় না । একসময় রেলগাড়িটি প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যায়। জানলা দিয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানায় পুরুল্যার ছৌ-নাচের দল । যাও হে, ফের দেখা হব্যেক কুনো সরকারি মেলায় কিংবা কুনো গাওনের আসরে । যেমনটি দেখা হইল্যাক কইল্‌কাতার মেলায় । আমরা ত একোই পথের পথিক ।

রাজীব লক্ষ্য করে, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা সবাইয়ের মুখে এক ধরনের চাপা বিষাদ। ক্লান্তি নয়, স্পষ্টতই বিষাদ । যেন কোনও আত্মীয়-বিয়োগ ঘটেছে এই মাত্তর । যেন মূল্যবান কিছু হারিয়ে ফেলেছে ওরা, যা, ওদের দৃঢ় বিশ্বাস, আর কোনদিনও ফিরে পাবে না । আসলে, আনন্দের হাটখানি ভেঙে গেল, তাই এত বিষাদ ।

'কি রে, খারাপ লাগছে ?' পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বদন কোটালকে শুধোয় রাজীব ।

জবাবে ম্লান হাসে বদন, 'উই যে গাইল্যাক বাউল, যেন শিকলখুলা পক্ষী আবার পিঁজরাতে সেঁধায়— ।'

সত্যি, রাজীবও কষ্ট পায় মনে মনে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে বন্দী, বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে যারা যুগ যুগ ধরে, তারা কি কোনদিন স্বপ্নেও ভেবেছিল, রেলগাড়িতে চড়ে তারা চলে যাবে দেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতির পীঠভূমি কোলকাতায় ! এত গাড়ি-ঘোড়া-আলো, পেটভরা সুখাদ্য, নরম বিছানা, মেডেল, জয়ধ্বনি, সঙ্গে নগদ টাকা, এত বিচিত্র মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ, জঙ্গলের কঠোর শ্রমসাধ্য জীবন থেকে কয়েকটা দিন শিকল খুলে পালিয়ে থাকবার অনুভূতি । এদের জীবনে এসব যে কেবল স্বপ্নেই ঘটে । সত্যি, গজাশিমুলের মানুষগুলোর কাছে এ এক স্বপ্নের ভ্রমণ । স্বপ্নের ভ্রমণ শেষ হয়ে গেলে কার না বুকে বিষাদ জমে ! কার না কান্না ঠেলে আসে ভেতর থেকে, অজান্তে না ভিজে যায় বুক ।

২. নায়ক-নায়িকা-ভিলেন সংবাদ

রানীবাঁধ বাজারে মুক্তেশের চায়ের দোকানে রঙলালকে দেখে রাজীবের মসৃণ কপালে ভাঁজ পড়ল। একটা বিরুদ্ধ হাওয়া বইতে লাগল অন্দরে ।

পাশে দাঁড়িয়েছিল মিস ক্যাথি বার্ড ।'ইস্ট-ওয়েস্ট ফোক ফাউণ্ডেশন'-এর পূর্ব-ভারতীয় শাখার ডিরেক্টর এবং 'দ্য ফোক' পত্রিকার সর্বভারতীয় করেসপণ্ডেন্ট । লালচে ফর্সা মুখ । নীল চোখ । মাথায় ঝাঁকড়া সোনালী চুল । চোখে রুপোলী ফ্রেমের রিমলেস চশমা । কারণে-অকারণে হাসছিল । ঘসা নীল রঙের জীন্‌স্ পরেছে । গাঢ় বাদামী রঙের বুশ শার্ট । গলায় সোনালী চেনে 'ক্রুশ' ঝুলছে । আর ঝুলছে দামী ক্যামেরা । ছোট্ট টেপ রেকর্ডার । মাঝারি

আকারের সাইড-ব্যাগ পাশটিতে নামানো ।

রঙলালকে দেখে রাজীবের মানসিক প্রতিক্রিয়াটা বোঝবার সাধ্যি ছিল না মিস্ বার্ড-এর। সে সর্বদাই নিজের আনন্দে মশগুল ।•হাল্কা পালকটির মতো উড়ে বেড়াচ্ছে সারাক্ষণ। এটা দেখছে, ওটা দেখছে । নীল চোখের মণি সর্বদাই গাঢ় হয়ে আছে কৌতুকে । খুব গভীর আর সূক্ষ্ম কিছু খুঁটিয়ে নজর করবার মতো মানসিক গঠন নয় এই চঞ্চলা বিদেশিনীর ।

রঙলাল রাজীবকে দেখে দাঁত গিজুড়ে হাসল । মিসিদানা ঘসা কালো দাঁত । আতাবীজের মতো । ডান হাত কপালে তুলে স্যালুট করবার ভঙ্গি করল রঙলাল । বলল, 'নমস্তে মাস্টারজি । ইত্না রোদে কাঁহাসে ? ইস গা' যে বিলকুল ভিজে গেছে ঘামে !'

মিথ্যে নয় । রাজীব প্রায় দরদরিয়ে ঘামছিল । আষাঢ়ের আকাশে মেঘ না থাকলে রোদ্দুরের ঝাঁঝ দ্বিগুণ হয় । এখন মধ্য গগনে সূর্য । পুড়িয়ে দিচ্ছে বিশ্ব-চরাচর । গাছের একটি পাতাও বুঝি নড়ে না ।

সকাল থেকে মিস বার্ড-এর সঙ্গে চরকির মতো ঘুরছে । এনার্জি বটে ! রাজীব তাজ্জব বনে যায় । রাজ্যমেলা থেকে ফিরে দু'হপ্তাও কাটে নি, লম্বা চিঠি, হাজার প্রশ্ন, পরামর্শ, আর কি আকুলি-বিকুলি ! বললে তক্ষুনি ছুটে আসে । রাজীবের ব্যস্ততা ছিল । দলও কয়েকটা শো' করে এল । ফিরে এসে ধীরে সুস্থে চিঠি লিখেছিল মিস বার্ডকে । চিঠি পাওয়া মাত্রই ব্যাগ-বোঁচকাসহ হাজির । আর পৌঁছানো মাত্রই শুরু করেছে ঘোড়দৌড় । একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করেছে ক্যাথি বার্ড । তাই চড়ে সারা জেলা চষে বেড়াচ্ছে আজ ক'দিন । আজ সকালে গিয়েছিল পাঁচমুড়া । ওখানকার সমস্ত কুমোরশাল ঘুরেছে । বিশ্ববিখ্যাত টেরাকোটার কাজগুলো দেখেছে । দেখেছে, আর পটাপট সাটার টিপেছে ক্যামেরার । সকাল থেকে প্রায় তিন রীল ফিল্ম কাবার । ইন্টারভিউ নিয়েছে প্রায় ডজন খানেক কুমোরের, ছেলেমানুষী প্রশ্নে তাদের অস্থির করে তুলেছে । দু'খানা ক্যাসেট ইতিমধ্যেই ভরে গেছে, তাতেও পুরোপুরি মন ভরে নি, প্রবীণ মৃৎশিল্পী মদন কুম্ভকারের ঘন্টা-টাক ইন্টারভিউ নিয়েও আফশোস করছে, ইস্, আরো খানিক নিলে ভালো হত । ওর পিছু পিছু এক নাগাড়ে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় হেদিয়ে পড়েছে রাজীব । কিন্তু মেয়েটার যেন শ্রান্তি ক্লান্তি নেই, অফুরন্ত উৎসাহ, সব কিছুতেই জমাট কৌতূহল । যা শোনে, তাই চটাপট নোট করে নেয়, আর কথায় কথায় খিলখিল হেসে গড়িয়ে পড়ে । মুখে বল ওঠে, 'হাও নাইস ! হাও ইনটারেস্টিং ! ফ্যানটা-স্টিক !'

রঙলালকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে চাইল রাজীব, মুখ ফিরিয়ে নিল উল্টোদিকে । কিন্তু রঙলাল যেন নাছোড়বান্দা, সামনেটিতে এসে মিটিমিটি হাসতে থাকে, যেন রাজীবের কত জান-পহচান পেয়ারের আদমি । রাজীব বোঝে, এ সব হল, মিস্ বার্ড-এর নজর কাড়বার ধান্দা । সাদা চামড়ার বিদেশী মেয়ে, তার ওপর আকাট যুবতী, রঙলালের মতো লোকের জিভে জল তো ঝরবেই । ক্যাথি বার্ড খুব ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজীবের পাশে । রঙলাল চোখ ছোট করে তাকাল ওর দিকে । রাজীবের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'দোস্ত ?'

সে কথায় খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ক্যাথি বার্ড । দু'পা এগিয়ে এসে বলে, 'ইয়াহ্, ডোস্ট, ডোস্ট ।'

রাজীবের সর্বাঙ্গ টিকিয়ার মত জ্বলছিল । লোকটা এ তল্লাটে মাস দুই-তিন ছিল না। কবে ফিরল, কে জানে ! রাজীব জানে, রঙলাল গাঁয়ে ঢোকা মাত্রই কিছু তরতাজা জোয়ান

মেয়ে-মদ্দ রাতারাতি উধাও হয়ে যাবে গাঁ থেকে। যাবেই। রঙলাল হল তাজা মালের ব্যাপারী। মাল যাচাই করার সময় যে পাকা জহুরী। পুরুষদের বেলায় পঁয়ত্রিশ আর মেয়েদের বেলায় পঁচিশ ছাড়ালেই ওর মুখে গাঢ় মেঘ জমে। মেজাজ যায় খিঁচড়ে।

ঝাঁঝাল গলায় বলে, 'তু' লোগ কিস্ লিয়ে যাবি বে ? হাঁপানী আর বাত-বুখারের শো দিখাতে ?' মেয়েদের বলে, 'আগর ছাতির চিজ দোনো আচ্ছা থাকত তো ওই দিখায়ে দো-পাইসা কামাতিস। উও ভি তো হ্যায় নেহি।'

আজ রঙলালের পরনে সবুজ চেক-কাটা লুঙ্গি, গায়ে নীল ফতুয়া, পায়ে ভারি নাগরা। রাজীবের মনে আছে, ছেলেবেলায় গরু-ব্যাপারীরা এমনি পোশাক পরে ওদের গাঁয়ে ঢুকত, গরু-বাছুর দেখে-শুনে কিনত, দু'হাতে জাপটে ধরে গরুর দাঁত পরখ করত, লেজ মোচড়াত, দর-দাম করত... । রঙলালকে দেখামাত্রই রাজীবের মনে প্রত্যেক বারই ভেসে ওঠে শৈশবের ঐ দৃশ্যটা।

রাজীব এই মুহূর্তে দৃশ্যখানা ভাবছে, রঙলালের সঙ্গে মেলাচ্ছে, আর মুক্তেশের চায়ের দোকানে গনগনে আঁচের ওপর বসানো জলভরা কেটলির মত ভেতরে ভেতরে ফুটছে,— ফুটছে আর ফুঁসছে। রঙলাল খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে ঢুকেছে মুক্তেশের চায়ের দোকানে। ওখান থেকে তার গলার চটুল আওয়াজ ভেসে আসছে। উচ্চগ্রামে কথা বলছে রঙলাল, মাঝে মাঝে, কি কারণে, সম্ভবত অকারণে শেয়ালের মত খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসছে।

শুনতে শুনতে কপালের শিরা শক্ত হয়ে ওঠে রাজীবের। দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'স্কাউন্ড্রাল !'

ক্যাথি বার্ড বুঝি কিছু একটা আন্দাজ করছিল। তার নীল নয়নে ফেনিয়ে ওঠে কৌতূহল। বলে, 'কে ও ?'

রাজীবের দু'চোখ ঘৃণায় ছোট হয়ে আসে। বলে, 'লোকটা নাম্বার-ওয়ান শয়তান। এই এলাকার এক ভিলেন।'

ভিলেন ! ক্যাথি বার্ড বুঝি রহস্যের গন্ধ পায়। নীল চোখে চকিত দ্যুতি। চোখ টিপে বলে, 'ফাইন। আর নায়কটি কে ? নিশ্চয়ই তুমি ?' বলতে বলতে ওর চোখেমুখে রহস্যটা গাঢ় হয়, 'আর, নায়িকা ?'

রাজীব জানে, ক্যাথি বার্ড যে দেশের মেয়ে, সেখানে নায়ক-নায়িকা আর ভিলেন এক সুতোয় বাঁধা থাকে। কিছুতেই ওদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

রাজীব ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'ও একজন আড়কাঠি।'

'আড়কাঠি' শব্দটা খুব আদুরে গলায় উচ্চারণ করবার চেষ্টা করে ক্যাথি বার্ড, জিভের ডগায় শব্দটাকে নিয়ে বার কয়েক আলতো নাচায়। বলে, 'মানে কি ?'

রাজীব প্রাঞ্জল করে বোঝায়, 'ও একজন কুখ্যাত দাস-ব্যবসায়ী।'

দাস ব্যবসায়ী ! চমকে ওঠে মিস বার্ড, টেপ-রেকর্ডারটা সঙ্গে সঙ্গে চালু করে দেয়, 'ইউ মিন, স্লেভ-হাণ্টার ? বল, বল, ব্যাপারটা বেশ বিতাং করে বল। কিন্তু এখনও ইণ্ডিয়াতে স্লেভ-হাণ্টিং চলে ? আমাদের দেশে তো ওসব কবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

রাজীব তেতো হাসে। বলে, 'ঠিক যে ফর্মে ভাবছ, ঐ ফর্মে হয়ত চলছে না, অষ্টাদশ

শতাব্দীতে তোমরা জঙ্গলে ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে যে স্টাইলে স্লেভ-হাণ্টিং করেছ, ঠিক সেই পদ্ধতিতে এখানে অবশ্য দাস-শিকার হয় না এখন। পদ্ধতি তোমরাও বদলেছ, আমরাও বদলেছি ।'

মিস বার্ড টেপ-রেকর্ডারের ভল্যুমটা সামান্য অ্যাডজাস্ট করে নেয় ।

ডিপুঘরের বাজনা

ধামসা, মাদল আর ঝাঁঝগুলো অবিরাম বাজে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়িখানির মধ্যে । ডুংরি-টুংরী আর জঙ্গলঘেরা বাড়িখানি লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন । স্থানীয় লোকে বলে, ডিপুঘর । ঐ ডিপুঘরের কোন্ অন্ধকার কন্দর থেকে একটি বারের জন্য বুঝি ভেসে এসেছিল মেয়েলি আর্তনাদ । পরক্ষণেই ধামসা, মাদল আর ঝাঁঝের বিকট আওয়াজে ঢাকা পড়ে গেছে সে আওয়াজ ।

ডহর মাণ্ডির মনে ধন্দ জাগে, আর্তনাদটা সত্যিই শুনল তো, নাকি অস্থির মনের বিভ্রম ? মূল দরজার সামনে বসে রয়েছে যমদূতের মত একজোড়া হিন্দুস্থানী । ইয়া গালপাট্টা মুখ জুড়ে, হাতে পাকা লাঠি, ডাল-কুত্তার মতো হিংস্র চোখ । বেজে চলেছে বিকট বাদ্য, অন্তহীন । চারপাশে ছোট ছোট পাহাড়ী ডুংরি, ঘন জঙ্গল, সরু নির্জন উঁচালী-নীচালী পথ, ছোট ছোট পাহাড়ী নালা-খুলিয়া, — কেমন অশরীরী নির্জনতা সমস্ত এলাকা জুড়ে । তার মধ্যে বেজে চলে ঐ অকরুণ বিকট বাদ্য, শুনতে শুনতে বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে ।

যমদূত দুটো কুতকুতে চোখে দেখছিল ডহর মাণ্ডিকে । তাদের দু'চোখে সন্দেহ আর আশঙ্কাজনিত বাড়তি হিংস্রতা । বাঘের গলায় গর্জে ওঠে একজন, 'অ্যাই, কোন্ হ্যায় তু ? কেয়া মাংতা ?'

এই যমদূতগুলোর কীর্তিকলাপ পুরো রাইপুর থানার মানুষ জানে । এরা যে কত হিংস্র আর হৃদয়হীন হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব । রাইপুর থানার বিরুড়ি গ্রামকে কেন্দ্র করে চার পাশের দশ-বিশ খানা গ্রামের গরীব, হতদরিদ্র আদিবাসী এবং নিম্ন বর্ণের মানুষ এই হায়েনাগুলোর উন্মত্ত নখদন্তের নিরন্তর শিকার । এরা কে ? না, এরা হল, ডিপুঘরের সিপাহি । কন্দর্প সরকারের ডিপুঘর এটা । এ এলাকার লোক নয় কন্দর্প সরকার । বীরভূমের দিক থেকে কোন্ কালে এসেছিল । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগ নিয়ে নীলামে ডেকে সম্পূর্ণ পিড়াঁরা মৌজার দখল নিয়েছিল সে । সঙ্গে এসেছিল এক জোড়া সুন্দরী মেয়ে । সর্বদা সেজেগুজে পটের বিবিটি হয়ে থাকত ওরা, গা ভরতি সোনার গহনা ঝলমল করত । কিছুদিন বাদেই এই ডিপুঘরটি বানাল কন্দর্প সরকার । তারপর থেকে চলছে তার নিরঙ্কুশ শিকার ।

নিয়মিত লেঠেল বাহিনী রয়েছে কন্দর্প সরকারের । রয়েছে ডজন খানেক হিন্দুস্থানী সিপাহি । লম্বা-চওড়া চেহারা, দো-মণী বস্তার তুল্য বপু, জ্বলন্ত ভাঁটার মতো এক জোড়া চোখ, বিশাল গোঁফ আর গালপাট্টা ... । হাতে পাকা তেল-মাখানো লাঠি । কোন্ মুল্লুকের মানুষ ওরা, ভগমানকে মালুম । দেহাতী ভাষায় কথা বলে, যা এ এলাকার মানুষের পক্ষে পুরোপুরি বোঝা দুষ্কর । হত-দরিদ্র আদিবাসিদের পাড়ায় পাড়ায় এরা বীরদর্পে, নাগরায় মচমচানি আওয়াজ তুলে, টহল দেয় যখন তখন । দূর থেকে দেখা মাত্রই পথ চলতি মানুষজন যেদিকে দু'চোখ যায় দৌড় মারে । পাহাড়-ডুংরীর চুড়োয়, গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচায় ।

ঝুপ ঝুপ করে বন্ধ হয়ে যায় তাবৎ ঝোপড়ির আগড় । বউড়ি-ঝিউড়ি, শিশু-অবোধের দল ঝোপড়ির মধ্যে কাঁপতে থাকে শুকনো বাঁশ পাতার মতো । কান এড়ে শুনতে থাকে নাগরার সম্মিলিত মচমচ আওয়াজ । পাকা লাঠির ঠক্-ঠক্ শব্দ সোজা এসে বুকের পাঁজরায় ঘা মারে । কে যায় ? না, কন্দর্প সরকারের ডিপুঘরের সিপাহি । ওরা মার্চ করতে করতে চলে যায়, এক সময় ওদের নাগরার মচমচ আওয়াজ মিলিয়ে যায় দূরে । কেবল, পাথুরে জমিতে লাঠি ঠোকার আওয়াজ অনেক দূর অবধি শোনা যায়, একঘেয়ে, মনে হয়, চিড়ে কোটা চলছে বুঝি পাশের কোনও গাঁয়ে ।

ওরা নির্জন জঙ্গলে, পাহাড়-ডুংরী ঘেরা রাস্তার খাঁজে-ভাঁজে লুকিয়ে থাকে শিকার ধরবার জন্য । নিঃসঙ্গ, নিরস্ত্র মেয়ে-পুরুষ একলা কিংবা দল বেঁধে ঐ সব নির্জন পথে আনাগোনা করে জীবিকার টানে, গরু চরায় জঙ্গলে, কাঠপালা, ফল-পাকুড়, কন্দমূল সংগ্রহ করে । ওরা সুযোগ মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে আচম্বিতে । হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে, সোজা এনে ডিপুঘরে তোলে । এলাকার সব মানুষই জানে, একটিবার ডিপুঘরে ঢুকেছে যে মানুষ, সে হতভাগ্যের আর ঘরে ফিরে আসার সুযোগ ঘটবে না এ জীবনে । দিন কয়েক ডিপুঘরের অন্ধকার কুঠুরিতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকবে, তারপর কোনও এক গভীর রাত্রিতে, পর্দা ঢাকা কাড়া-গাড়িতে বোঝাই করে ওদের চালান করে দেওয়া হবে পুরুল্যা শহরের দিকে । কাঁড়া-গাড়িটি ঘিরে থাকবে এই সব যমদূতের দল । পুরুল্যা শহর এই এলাকার আড়কাঠিদের বিশাল ঘাঁটি । চার পাশের গাঁ-গঞ্জ থেকে শয়ে শয়ে আদিবাসি, নিম্নবর্ণের মানুষকে ধরে এনে জড়ো করা হয় এখানে । এখান থেকেই ওদের তুলে দেওয়া হয় রেলগাড়িতে, আসাম মুল্লুকের উদ্দেশ্যে । চিরকালের জন্য চলে যায় ওরা, আর কখনও জন্মভূমির মুখ দেখতে পায়না ।

যমদূতগুলোর গর্জন শুনে ডহর মাণ্ডির ভিরমি খাওয়ার কথা । পরিস্থিতি অন্য হলে এতক্ষণে প্রাণের আশা ছেড়ে দৌড় মারত সে । কিন্তু তার জীবনের সাথীটি যে বন্দী রয়েছে ডিপুঘরের মধ্যে, ওকে এই হায়েনাগুলোর খপ্পরে ফেলে রেখে সে পালায় কি করে ? কাজেই, ডহর দু'হাত জড়ো করে বলে, 'হুজুর, আমি মধুপুরের ডহর মাণ্ডি হুজুর । আমার বউটাকে এইন্যে ডিপুঘরে আটক কইর‍্যেঁ রেইখেছেন আপনারা । উয়াকে ছেইড়ে দ্যান হুজুর, উয়ার কচি বাচ্চা আছে ঘরে ।'

'তেরা আউরৎ ? ইঁহা ?' হো-হো করে হেসে ওঠে দু'জনেই । তুই দেখেছিস ওকে আনা হয়েছে .?

'দেখি নাই হুজুর, তেবে এই পথেই উ যাচ্ছিল বাপের ঘর । মাঝপথে আপনারা উয়ার উপর চড়াও হইছ্যা – অন্য লোক দেইখেছে হুজুর । ছেইড়ে দ্যান উয়াকে ।' বলতে বলতে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে ডহর মাণ্ডি ।

'স্বপন দেখত্যা হ্যায় ক্যা ?' যমদূতেরা যেন মজা পেয়েছে ওর কথায়, একা একা এই নির্জন জঙ্গল-রাস্তা দিয়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছিল কেন যুবতী আউরৎ ?

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে ডহর মাণ্ডি । একটু বাদে মৃদু গলায় বলে, 'উয়ার উপর সন্দেহ করে, বড় লাথি-লাথি করে । কথায় কথায় মারে । পেট পুরে খেইতে দেয় না ।'

তো, তুই কেন সহ্য করিস ? কিছু বলিস নে কেন ?

মুহূর্তকাল গুম মেরে থাকে ডহর মাণ্ডি, মাথাটা আরও নেমে যায় মাটির দিকে । বলে, 'আমার কথা উয়ারা শুনে না । আমার মা-টি বড় খাণ্ডার ।'

শুনে চুপ করে থাকে যমদূতের দল । পরম নিশ্চিন্তে খইনি ডলতে থাকে ।

একটু বাদে বলে, তোর বউ তোদের জ্বালায় অস্থির হয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে । উ আর নেহি লোটেগী ।

'ও নয়া আদমি ঢুঁড়তে গেছে ।' সঙ্গে সঙ্গে পোঁ ধরে অন্যজন, 'তুই আর ওর আশায় থাকিস না । ফিরে গিয়ে আর একটা সাদী কর্ ।'

হ্যা-হ্যা করে হাসতে থাকে যমদূতের দল । বলে, যা, যা, জলদি কেটে পড় । আমাদের মালিক তোকে দেখতে পেলে তোর গর্দান যাবে । তিনি এখন পুজোয় বসেছেন । শুনছিস না, পুজোর বাদ্যি বাজছে ।

এক মুহূর্তের তরে বুঝি থেমেছিল বিকট বাদ্যিটা । আচমকা বউকে চিৎকার করে ডাক পাড়ে ডহর মাণ্ডি, 'রাধী রে- ।'

'বাঁচাও- ।' ডিপুঘর থেকে ভেসে আসে রাধীর কান্না-ভেজা চিৎকার । পরক্ষণেই ফের শুরু হয়ে যায় বাদ্যি, হারিয়ে যায় রাধীর গলা বিকট বাদ্যির অরণ্যে ।

পাহারাদারগুলো বুঝি প্রমাদ গোনে । লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসে ওরা । এলোপাথাড়ি পেটাতে থাকে ডহর মাণ্ডিকে । প্রাণের ভয়ে গাঁয়ের দিকে দৌড় লাগায় ডহর মাণ্ডি । মাঝখানে বার-দুই জ্ঞান হারায় ।

বউকে আর ফিরে পায় নি ডহর মাণ্ডি । ডিপুঘর থেকে কোন্ অচেনা জগতে হারিয়ে গেছে সে জন্মের মত ।

'বেশিদিন নয়- ।' রাজীব বলে, 'এই শতাব্দীর তিন-চার দশক অবধি সারা দেশ জুড়ে চলেছে এই পদ্ধতিতে মনুষ্য-শিকার । তখন এই রাঢ়-বঙ্গে আর বিহার-মুলুকে ছিল এরকম শয়ে শয়ে ডিপুঘর, হাজারে হাজারে আড়কাঠি । তারা লাখে লাখে মানুষকে ধরে ধরে চালান করেছে চা-বাগিচায় । তাদের মধ্যে শতকরা নব্বুই ভাগই আর ফেরেনি । এখন অবশ্য দিন-কাল বদলেছে অনেকখানি, আড়কাঠিরাও বদলে ফেলেছে তাদের কর্মপদ্ধতি ।

ক্যাথি বার্ড অবাক চোখে দেখতে থাকে রঙলালকে ।

দশরথ ভক্তার স্মৃতিচারণ

রাজীব জানে, আজ অনেক বছর আগে রঙলাল ঢুকেছে গজাশিমুল গাঁয়ে । গজাশিমুলের দশরথ ভক্তার মুখ থেকে সবকিছু বিতাং করে শুনেছে রাজীব । সে সব বহুৎদিন আগের বিত্তাং । গজাশিমুলের নাম তখন ক'জনাই বা জানত ! তখন দ্বারকেশ্বরের পুল বাঁধা হয়নি । গোরাবাড়িতে হয়নি চার-ক্রোশ লম্বা ড্যাম । হাতিরামপুরের পাশ দিয়ে তখন অমন কিতাবে-ছাপা-ফটোর মতোন ক্যাঁদেল বয়ে যেতো না । তখন গজাশিমুল গাঁয়ে পৌঁছানোই এক দুর্গম ব্যাপার । রানীবাঁধ দিয়ে ঢুকলে সোজা দক্ষিণে বন-জঙ্গল, খুলিয়া-খোঁদল, ডিহি-ডুংরী ধরে হাঁটলে একে একে পড়বে কাটি আম, মৌলা, জামবেড়িয়া, মিঠাআমের জঙ্গল । পাহাড়ীয়া সে পথ, উঁচালী-নীচালী, দুর্গম । বামে রয়ে যাবে মহাদেবসিনান আর খাতমের জঙ্গল । মিঠা আমের জঙ্গল ছাড়িয়ে শুরু হয়েছে ভুলাগেড়িয়া আর কুচিবুড়ির জঙ্গল । সেটা গিয়ে মেশেছে

ছ্যাঁদাপাথরের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে। সেই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে নাকি স্বদেশীবাবুদের বন্দুকের কারখানা ছিল। ছ্যাঁদাপাথর থেকে একটা জংলা শুঁড়িপথ বেঁকে গিয়েছে পশ্চিমে। বাঘমুড়ি, মইষমুড়া পেরিয়ে সে পথ ক্রমশ হারিয়ে গ্যাছে বাঁকুড়া আর মেদিনীপুরের সীমান্ত এলাকায়। সেখানে শুধু জঙ্গল, ডুংরী, পাহাড়। সেই পথ ধরে ঘণ্টা দু-তিন নাগাড়ে হাঁটলে জঙ্গলের মধ্যেই গজাশিমুল গাঁ। দূর থেকে দেখা যাবে, ডুংরীর কোলে ছায়া ছায়া আলো-আঁধারি পরিবেশে, পোয়াল-ছাতুর মতো গোল গোল পাতার ঝুপড়ি। গুটি কয় ছাগল-মুরগী চরছে উঠোনে, আশে পাশে। তাদের সঙ্গে ঘুরঘুর হেঁটে বেড়াচ্ছে ন্যাংটো বাচ্চারা। গায়ে কাদা-বালি। মাথার লাল চুলে অনাদরের বিনুনি। নাক দিয়ে অবিরাম সিগ্‌নি ঝরছে। ঝরে ঝরে ঘা' হয়েছে নাকের তলায়। ভদ্দরলোক দেখে ততক্ষণে গাঁয়ের পুরুষ মানুষেরা সব জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছে। মেয়েরা ঝুপড়ির অন্ধকার কোণে। ভদ্দরলোককে ভারি ভয় গজাশিমুলের মানুষ। 'কাঁকড়া' বলে ডাকে।

নিজেদের কথা বলতে ভারি ভালোবাসে দশরথ ভক্তা। বলে, মোরা আইস্ত্রো লধবাও লয়, শবর লয়। মোরা হল্যম বসু-শববের জাত। মোরা সবাকার চেঁইয়ে উচ্চ বন্যো। মোদের জাত আছে বিহারের তামজোড়ে। সিখ্যেনে সুবর্ণরেখা লদী। লদীর ধারে ঘন জঙ্গল। অসংখ্য ডুংরী-পাহাড়। উয়ারা থাকে পাহাড়ের গুহায়। আমরা আইস্ত্রো আসলে এক পাহাড়িয়া জাত বটি।

ত', কোনও এককালে ভুঁইহার-জমিদারদের তাড়া খেয়ে এদের কোন পূর্বপুরুষ এসে ঠাঁই গেড়েছিল গজাশিমুল গাঁয়ে। ওরাই বেড়ে বেড়ে ডালে-পালায় এখন বত্রিশঘর।

দশরথ ভক্তা বলে, তখন তো ই গাঁর নাম গজাশিমুল নাই ছিল আইস্ত্রা। গাঁওটাই ছিল নাই। বিস্তর শিমুল গাছ ছিল বলে মোর ঠাকুদ্দার ঠাকুদ্দা নাকি গাঁ'টার নাম দিয়েছিল গজাশিমুল। বলে, জঙ্গলের মানুষ মোরা। চাষ-বাস নাই জানি মোরা বাপের জম্মে। জঙ্গলই মোদ্যার বাপ-মা। সখা-স্যাঙাত। দিনভর জঙ্গলে শিকার মারি। গুঁড়চ্যা-সাট্‌না ধরি। মৌচাক ভাঙি। ফলপাকড় পাড়ি। কন্দ-মূল খুঁড়ি। উইসব মোদ্যের আহার। জংগলে অগাধ শালগাছ। শাল কাঠের 'ঈশ্‌' বানাই, গরুর গাড়ির ধুরি, খাটিয়ার পায়া, —এইসব বিকিকিনি করি লোকালয়ে। পুণ্যাপানির অঘোর রায় জঙ্গলের ঠিকাদার, এ তল্লাটের গাছ কেটে কেটে সাফ করছে এন্তার, নীলামের গাছ যত, চোরাই গাছ তার চতুর্গুণ। টেরাকে চড়ে সেই কাঠ চলে যায় কত দূর-দূরান্তরে ...। অঘোর রায়ের হুকুমে গাছ কাটি আমরা জঙ্গলে। মজুরি দেয় হাতে তুলে নাম মাত্র। বললে, বলে, চোরাই কাজ কচ্ছু আবার বেশি দাম চাচ্ছু। পুলিশ জানলে হুড়কা সেঁধাবেক তুয়াদ্যের। সুতরাং লা কাড়ি না আমরা। যা পাই ওই ঢের। ঐ দিয়ে চাল-আটা কিনি। মভিহারও। রেড়ির তেলে লম্ফ জ্বালি। জঙ্গল যেদিন দয়া করেন, সেদিন পেটে খাই। যেদিন মুখ ফেরান, ঝোরার পানিতে পেট পুরিয়ে শুয়ে থাকি যেখ্যেনে সিখ্যেনে, গাছের ছায়ায়, খুলিয়ার গভ্‌ভরে, দিন কেইট্যে যায়, রাইত্‌ কেইটে যায় ..., পেটের খিদা জ্বলে, নিভে, ফের জ্বলে। মোরা বন্‌-মা'র পাশ গিয়ে আব্দার ধরি, মা-গো, পরান যায়। বাঁচাও। বন-মা সাড়া দেন। শিকার মিলে। ফল-পাকুড় মিলে। পেড়ে-ধরে খাই। গজাশিমুলের জঙ্গলটা পশ্চিমে এগিয়েছে ক্রমশ গভীর হয়ে। মিশেছে বেলপাহাড়ীর জঙ্গলের সঙ্গে। লালজল পাহাড়, দলমা পাহাড় আর চাণ্ডিলকে পাশাপাশি রেখে

সে জঙ্গল ওড়িসার বারিপাদা, কেয়োনঝোরের জঙ্গলের সঙ্গে মিশে গেছে ।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে বড়ই মজা । মাঝে মধ্যে দু'একটা ছোট ছোট দল জঙ্গলে জঙ্গলে চলে যায় বহুত বহুত দূর । দু'দশ দিন এক নাগাড়ে হাঁটে । ক্ষিদে পেলে গাছের ফল পাকুড় খায় । পিয়াস পেলে ঝোরার মিঠা পানি । গাছের মাথায় চড়ে রাত্তিরে ঘুমোয় । এইভাবে চলে যায় কোথা থেকে কোথা । একমাস দু'মাস বাদে ফের ফিরে আসে ঘরে ।

দলমা পাহাড় আর চাণ্ডিলের জঙ্গলে বুনোহাতিদের চিরস্থায়ী আস্তানা । পাকা ধানের মরশুমে দু'চারটে গণেশ ঠাকুরের দল এসে ঢুকে পড়ে গজাশিমুলের জঙ্গলে । জঙ্গলে জঙ্গলে তারা চলে যায় রানীবাঁধ অবধি । ক্ষেতের ফসল খায়, মাড়ায় । মানুষের ঘরদোর ভাঙে । দু'দশজনকে ঘায়েল করে । সময় হলে আবার ফিরে যায় ওদের পাহাড়ের আস্তানায় । সে সময়টা গজাশিমুলের পোয়াল-ছাতুগুলোর তলায় মানুষগুলো জীবন হাতে নিয়ে বসে থাকে রাত ভর । বাবা গণেশ দেবতাকে ডাকতে থাকে আর্তকণ্ঠে । দেবতার কৃপা হলে বাঁচে, নইলে মরে । এই ছিল আইজ্ঞা মোদের বসু-শবরদের জীবন । তখন তক্ক রঙলাল নাই জানতো গজাশিমুল গাঁয়ের নিশানা ।

এল মানুষ-ধরার দল

রঙলাল এসেছিল । তখন সে ছিল আকাট ছোকরা । চাঁচা শালের খুঁটির মতো শরীর ছিল তার । তেমনি ছিল ঘসাই তামার মতোন অঙ্গের বর্ণ ।

'সঙ্গে এইনেছিল বিলাতি ।'

'ফলের মদ ?'

'লয় আইজ্ঞা । মহুলেরই মদ । তেবে বিলাতি । তো, মোরা হল্যাম্ চদুর দল । বাপের জম্মেও বিলাতি খাই নাই । ধইরে গ্যালেক লিশা ।'

দশরথ ভক্তা হাসে । উচ্ছ্বাসের, আনন্দের হাসি নয় । আত্মগ্লানির হাসি । মরতে থাকা মানুষের অক্ষম বিষাদের হাসি ।

বিহারের আরা জেলার কোথায় যেন রঙলালের বাড়ি । একদিন তালাশ্ করে গজাশিমুল গাঁয়ে ঢুকেছিল । ঢুকেই পাইকারি হারে বিলাতি আর পয়সা বিলোতে লাগল । দু'তিন দিন রইল গাঁয়ে । জঙ্গলে সেঁধিয়েছিল যারা, তারা একে একে বিলাতির গন্ধে ফিরে এল । মদ খেল, পয়সা নিল, চাল-আটা কিনল, মতিহার কিনল, শিকার মারল, ভোজ হল । দিন তিনেক বাদে একদিন সব্বাইকে দুখ্ দিয়ে চলে গেল রঙলাল ।

একেবারেই চলে গেল না । মাসটাক বাদে ফের ফিরে এল । সঙ্গে আরো বেশি বিলাতি । হৈ-হুল্লোড় করে রইল ক'দিন । গল্পগাছায় বলতে লাগল এক রঙিন দেশের কহানী । সে দেশে পাহাড়ের কোলে কোলে জঙ্গল । জঙ্গলের ছায়ায় সবুজ ঢেউ খেলানো বাগিচা । বারো মাস সবুজ ।

শুনে আচানক মানে মুরুব্বিরা, বারোমাস সবুজ ?

'হাঁ । বারোমাস সবুজ ।' কপালে দু'চোখ তুলে রঙলাল বলে, সে হল চা-বাগিচার দেশ । সেখানে কুম্পানীর মকান্ আছে । হাট-বাজার আছে । বিমার-বুখারে ডগ্‌দর । হপ্তায় হপ্তায় কুম্পানীর রেশন । চাল-গম-আটা-ময়দা-কেরোচিন । সেখানে অঢেল সুখ । বৈভব । সেখানে একবার গেলে, আর ফিরে আসতে দিল্ চায় না ।

হাঁ করে সে সব কথা শুনতে থাকে গজাশিমুলের মানুষ । চোখের পাতনি পড়ে না । এক অলৌকিক স্বপ্নের রাজ্যে ভাসতে থাকে মন । এও বটে জঙ্গলের দেশ, পাহাড়ের দেশ, কিন্তু জঙ্গলের বাইরে সব রুখা-শুখা । পোড়া পোড়া টাঁড়-টিকর জমিন, উঁচালী-নীচালী, মাকড়া পাথরের ডিহি, লাল কল্লাচ মাটি । মাটি তো লয়, যেন নোয়া । এখানে খাটালি নেই, বাটালি নেই, পেটের ভাত নাই, পরনের ছৈতা নাই, এখানে জঙ্গলই যেন ইহকাল-পরকাল । রাখলে রাখে, মারলে মারে । জঙ্গলের সামগ্রী যা সংগ্রহ করে, নিয়ে যায় পাশাপাশি গাঁয়ের বাবুদের বাখুলে । বাবুরাও সুযোগ মতো চুষছে । যা মন চায়, তাই হাত তুলে দেয় । খিদার জ্বালায় মানুষ দলে দলে পালিয়ে যায় গাঁ ছেড়ে, পুবের দিকে খাটতে । মাটি কাটার কাজ । সেদিকে নাকি মজুরী বেশি । মজুরীর সঙ্গে খাদ্যও দেয় । রঙলালের কথাগুলো তাই বিশ্বাস হয় । আছে, গজাশিমুলের বাইরে কাজ-কাম, দানা-পানি আছে । তবে রঙলাল যতটা বলছে, তাতে ঐ পাহাড়ী এলাকাটা প্রায় স্বর্গের তুল্য ।

নতুন দেশের গল্প শুনতে শুনতে দিন কাটে, মাস কাটে । রঙলাল আসে, যায় ... ।

একদিন কথাটা পাড়ল রঙলাল । বিশাস্ না হয়, জনা কয় চল তোমরা । না পোষালে ফিরে আসবে । কথাবার্তা পাকা হয় । দরদাম ঠিক হয় । দাদন-পাতি সাঙ্গ হয় । রঙলালের লাল খাতায় একে একে টিকসই দেয় গজাশিমুলের মানুষ ।

পয়লা খেপে জনা-চারেক জোয়ান আর গিদ্ধারি শবরের বিধবা বউটা রঙলালের সঙ্গে রওনা দিল অচিন দেশের উদ্দেশ্যে । তিনমাস বাদে তারা টাকা পাঠাল, রঙলালের হাতে । আপন জনের জন্য জামা-কাপড় । মিহিগলায় শোনাল রঙলাল, ভারি সুখে আছে সবাই । মজাসে রয়েছে । খুব শিগ্‌গির ঘরে ফেরার ইচ্ছে নেই ।

নগদ টাকা হাতে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় গজাশিমুলের মানুষ । লাল খাতায় টিপ দেবার ধুম পড়ে যায় । জনে জনে দাদন বিলি করে রঙলাল । লাল খাতার বত্রিশটি পাতায় বেঁধে ফেলে পুরো গাঁ'টাকে । দশরথ ভক্তার মেয়ে সুবাসী গেছে দ্বিতীয় কি তৃতীয় দলে ।

সেই থেকে গজাশিমুল গাঁয়ে রঙলালের আনাগোনা । অবাধ গতি । অখণ্ড আধিপত্য । আজ অবধি এই গাঁয়ের মেয়ে-মদ্দ মিলিয়ে প্রায় শতাধিক মানুষ গেছে রঙলালের সঙ্গে আসামের চা-বাগিচার কাজে । আরো বহু লোক দিন গুনছে । আগাম দাদনপতি নিয়ে বসে রয়েছে ওরা ।

রঙলাল গান বাঁধে, ওরা সবাই গায়

এখনো নিয়মিত গাঁয়ে আসে রঙলাল । ধীরে সুস্থে বারান্দার খুঁটায় ঠেস দিয়ে বসে । তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া খায় । পাথর-কুঁয়ার ঠাণ্ডি-পানিতে হাত-পা ধোয় । মিষ্টি তালের-রস ধরে দেয় গজাশিমুলের মানুষ । রঙলাল তারিয়ে তারিয়ে চুমুক মারে । খবর পেয়ে ছুটে আসে সারা গাঁ' । বাচ্চা-বুড়া, মেয়া-মদ্দ । এক্কেবারে ভেঙে পড়ে রঙলালের চারপাশে । উৎসুক চোখে দাঁড়িয়ে থাকে নিজের মানুষজনের খবরের আশায় । সারা গাঁ যেন চাতক পাখি । রঙলাল ধীরে সুস্থে খানপিনা সারে । তারপর নীল ফতুয়ার পকেট থেকে বের করে টুকরো টুকরো খত্ । এগিয়ে দেয় এর-ওর দিকে । তখন ডাক পড়ে সুচাঁদ ভক্তার । সুচাঁদই এ গাঁয়ের একমাত্র পড়ালিখা-জানা ছগ্‌রা । দশরথ ভক্তার ব্যাটা । পুরুল্যার চিরুড়ির ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল সে । খরচ দিত গারমেট্ । সে ছগ্‌রা পড়ালিখা

কিছো শিখে এসেছে বটে। তো, সুচাঁদ আসে। ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে প্রত্যেকটি খত্ সে পড়ে শোনায় একে একে। ভালো আছে সবাই। সুখে আছে। চুটিয়ে আয় উপায় করছে। কোনও দুখ্ নেই তাদের জীবনে। শুনে তাজ্জব বনে যায় গজাশিমুলের মানুষ।

'উয়ারা কি কইরে খত্ লিখল্যাক্ গ' ?'

'বা-রে !' রঙলাল যেন আকাশ থেকে পড়ে, 'ওদের পঢ়া-লিখা শিখাচ্ছে যে ! কুম্পানীর মাস্টার হ্যায় না ? পঢ়ালিখা, খিলাধুলা, লাচাগানা, আরো বহুৎ কুছ।'

সব খত্ পড়া হয়ে গেলেও যেন আশ মেটে না ওদের। রঙলালের পাশটি ছাড়ে না। রাঁধে না। খায় না। সিনানে যায় না। শুধু বসে বসে দিনভর নিজের মানুষের সুখের বাখান্ শোনে। সংসারের সবকাজ বেভ্ভুল হয়ে যায়। উই পাহাড়িয়া দেশে, ঢেউ খেলানো সবুজ বাগিচার মধ্যে কুথায় আছে উয়ারা ? কি খায় ? কুথায় লিদায় ? সুফলের গলার খরখরে কাশটা কেমন আছে এখন ? মংলীর উই আধ-কপালী যন্ত্রণাটা আর আছে ? রঙলাল লম্বা করে মাথা নাড়ে। কি করে থাকবে ? উধার কুম্পানীকা ডগ্দর হ্যায় না। উ ফি' রোববার সব্বাইকে দেখে যে ! তবুও যেন তৃপ্তি হয় না এদের। হাজার শুধিয়েও প্রশ্ন যেন ফুরোয় না। রঙলাল তিলমাত্র বিরক্ত হয় না। ধৈর্য হারায় না সে। হাসি মুখে, পরম মমতায় সবাইয়ের সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে যায়।

এক সময় নীল ফতুয়ার পকেট থেকে একটা বিবর্ণ খাম বের করে রঙলাল। ভেতর থেকে টেনে বের করে খানকয় ফটো। গজাশিমুলের তাবত মানুষ একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ ফটোগুলোর ওপর। রঙচটা অস্পষ্ট সব ছবি। কাউকে ঠিক ঠিক চেনা যায় না। তবে মালুম হয়, কারা যেন নাচছে। মাদল বাজাচ্ছে। চারপাশে অনেক মানুষের জমায়েত। রঙলালই বুঝিয়ে দেয় সবাইকে। হুই দ্যাখ্, মংলী, দশরথের বেটি সুবাসী, ওই যে চাপি আর নিশি। এটা হল সুফল। এটা গণেশের ব্যাটা লছমন। আঙুল দিয়ে মানুষগুলোকে শনাক্ত করে দেয় রঙলাল। মুখগুলোকে ঠিক চেনা যায় না। কাউকে বেশি রোগা মনে হয়। কাউকে মোটা। কাউকে বেশ ঢ্যাঙা লাগছে। তবে রঙলালের শনাক্তের গুণে বিশ্বাস হয়, উয়ারাই বটে। ইস, কেমন লাচছে, গাইছে ! আহা রে ! কোন সুখের রাজ্যে রয়েছে তাদের একান্ত আপনার মানুষগুলি !

দুখের কারণ শুধু একটাই। একটি বারের তরে জনমভূমিতে আসে না ওরা। সব মানুষই তার জনমভূমিতে বারেকের তরেও ফিরে আসে।

ফিরে আসবে ? রঙলাল যেন ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়। ওখানকার অত আমোদ-আহ্লাদ ছোড়কে কিসের টানে আসবে এই রুখা-ভুখা, টাঁড়-পাহাড় আর জঙ্গলের দেশে ? কী খাবে এখানে ? কেঁদুফল আর চুরকা-আলু এখন আর ওরা দাঁতে কাটতে ভি পারবে না। এই পাতায় ছাওয়া স্যাঁতস্যাঁতে আঁধার ঘরে ওদের বুখার হয়ে যাবে। তাছাড়া, আসাটাও কি সোজা কথা নাকি ? পায়দলে আধা দিন। তারপর টেরাকে পুরাদিন। রেলগাড়িমে দো'দিন-দো'রাত। শুধু ঘর পৌঁছাতেই চার রোজ। আসা-যাওয়ার ভাড়া কত ? রাস্তার খোরাকি ? দু'মাসের মাহিনা চলে যাবে।

সেটা অবশ্য ঠিকই। তবুও, আপনার জনকে একটিবার দেখতে তো সাধ হয় মাইনষের।

প্রিয়জনদের কথা ভাবতে ভাবতে এই ভাবে গড়িয়ে যায় সকাল, দুপুর, বিকেল। ধীরে ধীরে আঁধার ঘনিয়ে আসে গজাশিমুলের পোয়াল-ছাতুগুলোর তলায় তলায়। অন্ধকার উঠোনে

বসে এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরে কম বয়েসী ছেলেমেয়ের দল :

দ্যাশে-ঘরে নাই কাম
চল্ বাবুয়া যাই আসাম
চা-বাগানের দ্যাশে চল যাই— ।
(এই) শুখা-হাজা দ্যাশে কুনো সুখ নাই —
চা-বাগিচার দ্যাশে কুনো দুখ নাই —

রঙলাল তখন একপ্রস্থ আফিম চড়িয়েছে মৌজ করে । নেশায় চুর হয়ে সে বসে থাকে দশরথ ভক্তার ঘরের দাওয়ায় । চোখ দুটো বোজা । গানের তালে তালে মাথা দোলায় আর মিচিক মিচিক হাসে । এ যেন তারই কোনও বাঁধা গান, যেন তারই দেওয়া সুর, তাল, —গাইছে গজাশিমুলের মানুষগুলো ।

রঙলাল তারপরও গজাশিমুল গাঁয়ে দু-চার দিন থাকে । খায়-দায় । আরাম করে । অবশেষে শুরু হয়, এ কিস্তিতে যারা যাবে, তাদের লিস্টি বানানোর কাজ । এ সময়টা রঙলাল ইস্পাতের মতো কঠিন । কষ্টি-পাথর দিয়ে ঘসেঘসে মাল পরখ করে সে । লাল খাতায় নাম তোলে । নামের পাশে অঙ্ক চড়ায় । পুরোনো দাদন কাটান্-ছাড়ান্ দেয় । তারপর হয় নতুন দাদন । সে বড় জটিল অঙ্ক । লাল খাতার বত্রিশটি পাতায় হিজিবিজি বিজাতীয় অঙ্কগুলো জীয়ন্ত পোকার মতো নড়ে চড়ে বেড়ায় । ছোট হয় । বড় হয় । জায়গা পালটায় ঘনঘন।

শেষ-মেষ যাদের নাম লিস্টিতে ওঠে, তারা তৈরী হতে থাকে । ক্ষার দিয়ে কাপড়-চোপড় কাচে । সাজো-মাটি দিয়ে মাথা ঘসে নেয় । মাকড়া-পাথরের টুকরো দিয়ে মরা চাম ঘসে ঘসে ঝকঝকে করে তোলে পা । প্রিয় ফলপাকুড়টি খেয়ে নেয় আশ মিটিয়ে । জঙ্গলে নিজের প্রিয়তম জায়গাটিতে গিয়ে বারবার বসে । প্রাণের মানুষের সঙ্গে প্রাণের কথাগুলো সেরে নেয় । বড়াম পূজার থানে গিয়ে বিড়বিড় করে জীবনের গোপনতম আকাঙ্ক্ষাটি জানিয়ে আসে । দেখতে দেখতে দিনক্ষণ এগিয়ে আসে । একদিন ঝুঁঝকা পহরে রঙলালের সঙ্গে গাঁ ছাড়ে সবাই । আধো-আঁধারে পেছনে ঘুমিয়ে থাকে আজন্মের ডাঙা-ডিহি-ডুংরী । গাছ-গাছালী । পাখি-পাখাল । গাঁ ।

প্রথমে জংগলের শুঁড়ি পথে পথে রানীবাঁধ বাজার । সেখান থেকে বাসে চড়ে বাঁকুড়া ইস্টিশন । তারপর রেল গাড়িতে চড়ে হাওড়া । সেখানে গঙ্গায় সিনান । রাতে ইস্টিশনের পাকা চাতালে ঘুম । পরের দিন গাড়ি বদল । দু'দিন, দু'রাত গাড়িতেই । তারপর কুম্পানীর ট্রাক । সবশেষে পায়দল ।

শুনতে শুনতে মাথা ঝিম ঝিম করে । সে তা'লে কুন্ দেশ আইজ্ঞা ? সে বোধ লেয় এ ভূ-ভারতে লয় । বাপরে বাপ ! অমন দেশেও মাইনসে যায় ! মুখে বলে বটে, কিন্তু দাদন বিলির সময় হাঁকুপাঁকু করে । যে ব্যাটা-বেটি উপযুক্ত হবে দু'বছর বাদে, তার তরেও আজ থেকে আগাম চায় ।

এক অন্ধ সাহেবের গল্প

সব শুনে নীল-নয়না একেবারে থ' হয়ে যায় । চোখ বড় বড় করে বলে, 'বল কি ! এখনও এভাবে লেবার জোগাড় করে এক্সপোর্ট করে এরা ? কই, আমাকে কেউ এ কথা বলে নি তো কোনোদিন !'

রাজীব ক্যাথি বার্ডের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে তাকায় । বলে, 'তোমরা টেপ, ক্যামেরা ঝুলিয়ে আস, ঘোর, পয়সার শ্রাদ্ধ কর, কিন্তু কী দ্যাখ, তা তোমারাই জান । তোমাদের দেখে ভারি দুঃখু হয় আমার ।'

'কেন ?' ক্যাথি বার্ড-এর ভুরুতে ইষৎ ভাঁজ পড়ে ।

'কারণ, তোমরা অত যন্ত্রপাতি বয়ে বেড়াও, কেবল চোখদুটোকেই রেখে আস ঘরে ।'

'অ্যাই ! অ্যাটাক করছ কিন্তু !' ক্যাথি বার্ড চোখ পাকিয়ে বলে ।

রাজীব হাসে । বলে, 'একটা গল্প বলি শোন । এক সাহেব এসেছে ইণ্ডিয়ার প্রেমে পড়ে । ইণ্ডিয়ার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরবে । ঘুরে ঘুরে দেখবে গ্রামের মানুষ, তার প্রাচীন জীবন-স্রোত । ভারতের আত্মাকে ছোঁবে সে, এই তার অভিলাষ । পাক্কা তিন বছর সে ঘুরল, দেখল, বহুত কিছু লিখে ভরিয়ে ফেলল একাধিক নোট বইয়ের পাতা । ইচ্ছে, দেশে ফিরে, গিয়ে এক সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখবে ।

বিদায়ের কালে সে একটি গরীব চাষী পরিবারে রাত কাটানোর ইচ্ছে প্রকাশ করল । সাহেবের এ দেশীয় বন্ধুরা তো এক পায়ে খাড়া । চটজলদি বন্দোবস্ত করে ফেলল ওরা ।

সারা সন্ধ্যে গল্পগুজব হল । সেদিন ছিল পূর্ণিমা । জ্যোৎস্না প্লাবিত উঠোন চাটাই পেতে বসেছে সবাই । বুনো ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে কোত্থেকে । প্রায় নেশা ধরে যায় ।

দেখতে দেখতে নৈশ ভোজের সময় এল । সাহেব বলল, এখানে বসেই খাই । এই দুর্লভ প্রকৃতি-মায়ের কোলে বসে । তাই হল । হাতে হাতে খাবার ধরিয়ে দিল গেল মেয়েরা । একটি করে লাল গমের মোটা ঢাউস রুটি । রুটির ঠিক মধ্যিখানে একটুখানি শাকের তরকারি । তারপর কি হল জান ? সাহেব পরম উৎসাহে শাকটুকু চেটেপুটে খেয়ে রুটিখানাকে টান মেরে ছুঁড়ে দিল দূরে । ঢকঢক করে জল খেয়ে বলল, 'খুব ভালো লাগল খেতে । নাইস । তবে তোমাদের দেশে চাষীরাতো খুবই অল্প খায় ।'

'যাহ্ । যত্তো সব বাজে কথা !' রেগে টং হয় ক্যাথি বার্ড, 'এসব অ্যাসপারশন্ । সাহেব রুটিখানাকে পেপার-প্লেট ভাবল বলতে চাও ? রাবিশ ! তোমরা আমাদের নামে এইসব যা-তা রটাচ্ছ, তাই না ?'

'রটাচ্ছি না ।' রাজীব আপসের ভঙ্গিতে হাসে, 'এটা হয়তো বানানো গল্প হতে পারে । কিন্তু তোমাদের অনেকেরই ব্যাপার-স্যাপার খানিকটা ঐ রকমই । কোনকিছুর ভীষণ গভীরে ঢুকতে চাও না তোমরা । পারও না ।'

রাজীবের কথাগুলো বোধ করি ক্যাথিকে অল্পস্বল্প ছুঁলো । নীলচোখ আকাশে ভাসিয়ে ঈষৎ বিষণ্ন গলায় বললে, 'কেন পারিনে বলতো ?'

রাজীব বেশ কিছুক্ষণ ভাবে । তারপর মৃদু গলায় বলে, 'কি জানি । বোধ করি ভীষণ সুখে আছ । তাই ।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে দুজনে । পরিবেশটা হঠাৎ ভারি হয়ে ওঠে । কেবল, দূরে বামনাসিনি মন্দিরের চুড়োয়, ত্রিশূলখানা রুপোলী শিখা বিস্তার করে জ্বলতে থাকে সূর্যের আলোয় ।

৩. রঙলালের পিচকারি

এক সময় নীরবতা ভাঙল ক্যাথি বার্ড । বলল, 'তোমার ড্রাইভারের তো দেখা নেই । আমাদের খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে না কি ?'

একটা কাক পাশের তে-ঠেঙা নিমগাছটায় বসে কর্কশ গলায় ডেকে চলেছে তখন থেকে । কানে ভারি অসহ্য ঠেকছিল রাজীবের । দূরে বামনাসিনী ডুংরীর মাথায় মন্দিরের চুড়োয় লাগানো ত্রিশূল আরও চকচক করছে রোদ্দুরে । ক্যাথির কথায় এদিক ওদিক চোখ চারিয়ে ড্রাইভারকে খুঁজতে থাকে রাজীব ।

গজাশিমূল অবধি ট্যাক্সি যাবে না । ওরা তাই ঝিলিমিলি অবধি গিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দেবে । সামান্য দম নিয়ে হাঁটতে থাকবে গজাশিমুলের উদ্দেশ্যে । সন্ধ্যার আগে পুণ্যাপানি গাঁয়ে পৌঁছুতেই হবে ওদের । অঘোর রায়ের বাড়িতে রাত্রিবাস । কাল সকালে রওনা দিয়ে গজাশিমুলে পৌঁছুবে এগারোটা নাগাদ । যদি আরও একটুখানি এগিয়ে, পৌঁছুতে পারে পচাপানি গাঁয়ে, তো রাত্তির কাটাবে সিংহবাবুদের গড়ে । গজাশিমুলের মানুষজন অবশ্যি জঙ্গল আর ডুংরী-পথ ধরে সোজা রানীবাঁধে এসে ওঠে । ওতে হাঁটতে হয় বেশি । পীচরাস্তা ধরে ঝিলিমিলি অবধি এগোয় গেলে হাঁটা-রাস্তা কিছু কম পড়বে, তবে সে পথও কম দুর্গম নয়। পথের দূরত্ব আর দুর্গমতা নিয়ে রাজীবের মনে এক ধরনের দুর্ভবনা কাজ করে চলেছে । সেই কারণেই শুধিয়েছিল একটু আগেই, তুমি অতখানি পথ হাঁটতে পারবে তো, মিস বার্ড ?

'তোমরা মেয়েদের বড় আণ্ডার-এস্টিমেট কর ।' ক্যাথি চোখ পাকিয়ে বলেছিল, 'তাছাড়া ভুলে যেও না রাজীব তোমাদের ইণ্ডিয়ান গুড্ডি-গার্লদের থেকে আমাদের একটু বেসিক তফাত রয়েছে । আমি এই বয়েসে খান-তিনেক ট্রেকিং করে ফেলেছি । ডেজার্ট-ক্যাম্পও বার-দুই । তাছাড়া ফি-বছর বনে-জঙ্গলে নেচার স্টাডির ক্যাম্প তো — ।'

'ব্যস, ব্যস- ।' রাজীব মাঝপথে থামিয়ে দেয় ক্যাথিকে, 'ভেরি সরি । তোমাকে আণ্ডার-এস্টিমেট করে প্রায় ক্রিমিন্যাল অফেন্স করে ফেলেছি । নিজগুণে ক্ষমা করে দাও, দেবি !'

'সে না হয় করা গেল, কিন্তু এক্ষুনি রওনা না দিলে পৌঁছুতে দেরী হয়ে যাবে না ? এখান থেকে ঝিলমিলি মাইল — পনেরো তো বললে, নাকি আরও বেশি ?' ক্যাথি বার্ড ঈষৎ উদ্বিগ্ন, 'কোথায় গেল, তোমার ড্রাইভার ?'

মুক্তেশের চায়ের দোকানের সামনে একটা ছোট্ট গর্ত, রাজীবদের থেকে হাত-পাঁচ-সাত তফাতে । খদ্দেরদের আঁচানো এবং দোকানের কাপ-প্লেট-বাসন-ধোওয়া জল ঐ গর্তে গিয়ে পড়ে । এখন, এই প্রখর গ্রীষ্মে, জল পড়লেই চুষে নিচ্ছে রুখা মাটি । প্রায় বার আনা ফাঁকা, কেবল তলায়, চার আনা আন্দাজ এলাকায় জমে রয়েছে জল । ঐ জলের মধ্যে একটা ঘিয়ে-ভাজা নেড়ি-কুকুর শরীর ডুবিয়ে শুয়ে রয়েছে অনেকক্ষণ । প্রচণ্ড গ্রীষ্মের ছোবল সহ্য করতে না পেরেই এমন ব্যবস্থা নিয়েছে বেচারা । শুয়ে শুয়ে ভুলভুল করে তাকাচ্ছে চারপাশে, আধখানা দৃষ্টি কিন্তু দোকানের দিকে । দোকানের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া চলছে, আর খদ্দেরদের খাওয়া-দাওয়া মানেই ও বিচারির উচ্ছিষ্ট লাভ ।

শালপাতার বিশাল বিশাল ঠোঙাতে চপ দিয়ে মুড়ি মেখে গোগ্রাসে গিলছে গেঁয়ো

খদ্দেরের দল। ওরা এসেছে হাট করতে, শাক-সবজি বেচতে। খাওয়া-দাওয়া সেরে রওনা দেবে গাঁয়ের দিকে। বাসে যারা ফিরবে, তাদের হাতে অঢেল সময়, বাস আসতে দেরি আছে, তারা খেতে খেতে খোশগল্পে মেতেছে।

সহসা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল কুকুরটা, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজীব চিৎকার করে উঠল, 'মিস বার্ড পালাও- ।' বলেই এক ঝটকায় ওকে ঠেলে দিল গাড়ির দিকে। কুকুরটা ততক্ষণে ক্যাথি বার্ডের দিকে মুখ করে সারা শরীর কুঁকড়ে ফেলেছে, শিকারের দিকে ঝাঁপ দেবার আগে মুহূর্তে জানোয়ার যেমন কুঁজো করে ফেলে শরীরকে ।

'মাই গড্ ! উইল ইট এ্যাটাক্ মি ?' বলতে বলতে এক ঝটকায় গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে ক্যাথি বার্ড, তার মুখ থেকে তাবৎ রক্ত কে যেন শুষে নিয়েছে নিমেষের মধ্যে। বিস্ফারিত দু'টি চোখ, ভয়ার্ত, 'ওহ্, গড্ !'

ঠিক সেই মুহূর্তে সর্বাঙ্গ গা ঝাড়ল কুকুরটি, দৌড় দিল বেড়ার দিকে। কারণ, এইমাত্র কয়েকটা দোমড়ান-মোচড়ান শাল পাতার ঠোঙা এসে পড়ল বেড়ার ধারে ।

সামান্য কাঁধ ঝাঁকাল রাজীব, চোখ রাখল ক্যাথির চোখের উপর, পরমুহূর্তে হো হো কার হেসে উঠল দুজনেই ।

'ইস্, এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল না !' ক্যাথি যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে ।

'যাহ্' রাজীবের চোখে যেন তীব্র অবিশ্বাস, 'কি সাধ্য এই শীর্ণ সারমেয়র যে তোমাদের ভয় পাইয়ে দেয় ! ট্রেকিং আর ডেজার্ট-ক্যাম্প করা মেয়ে তুমি !'

'প্যাঁক দিচ্ছ ?' ক্যাথি বার্ডের দু'চোখে কপট রোষ, 'তুমি এমন অ্যালর্মিং গলায় চেঁচিয়ে উঠলে আচমকা, যেন বাঘ পড়েছে ।'

'বা-রে ! ওর গায়ে কতখানি জল আর কাদা লেপটে ছিল, দ্যাখ নি ? পাঁচ হাতের মধ্যে ঐ শরীরখানি ঝাঁকালে তোমার পোষাক-আশাক আর চোখ-মুখ কাদায় ভরে যেত না ?'

ক্যাথি-বার্ড ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছে, রাজীব বলল, 'একটু চা খাওয়া যাক। টি আফটার ফিয়ার অ্যাণ্ড একসাইটমেণ্ট ।' বলতে বলতে সে ঢুকে পড়ল মুক্তেশের চায়ের দোকানে ।

মনটা এতক্ষণ বেশ খুশি খুশি ছিল রাজীবের, দোকানের মধ্যে ঢোকামাত্তরই সেটা আচমকা উধাও হয়ে গেল। দেখল, দোকানের মধ্যে ড্রাইভারটি গ্যাঁট হয়ে বসে পাউরুটি-ঘুগনি খাচ্ছে মজাসে। খেতে খেতে রঙলালের বক্তৃতা শুনছে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। এক কাপ চা খেয়ে নিলে ভালই লাগত। কিন্তু রঙলালকে দেখেই মনটা তেতো হয়ে গেল রাজীবের। চা খাওয়া মাথায় উঠল। ড্রাইভারকে এক প্রস্থ তাড়া লাগিয়ে সে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

বটতলায় খানিক চুপচাপ দাঁড়ানোর পর ধীরে ধীরে রাগের পারদটা নেমে যেতে লাগল। রাজীব ভেবে দেখে, রঙলালের ওপর অতখানি রেগে থাকার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। ক'বছরে রঙলালের অটুট সাম্রাজ্যের ভিত অনেকখানিই ধসিয়ে দেওয়া গেছে। রঙলাল আর গজাশিমুলের মানুষকে লাল খাতা দেখিয়ে আগের মত যাদু করতে পারে না। গত তিন বছর গুটি দশেকের বেশি মেয়ে-মদ্দকে রঙলাল নিয়ে যেতে পারে নি আসাম-মুলুকে। কারণ, রাজীব আর সুচাঁদ মিলে তাদের নতুন পথ দেখিয়েছে। গজাশিমুলের মানুষ এখন

অনেক স্বচ্ছ চোখে দুনিয়াকে দেখে । রাজীব জানে, সামনে সেলাম ঠুকলেও রঙলাল এখন ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে । যে কোনও মুহূর্তে মারতে পারে মোক্ষম ছোবল । ইদানিং রাজীবকে দেখলেই রঙলাল সবগুলো দাঁত বের করে হাসে, বিনয়ে গদগদ হয় । রঙলালের ঐ আপাত-নিরীহ হাসিখানা দেখলে ভারি ভয় জাগে মনে । রাজীব তো রঙলালকে হাড়েহাড়ে চেনে। সে নিশ্চিত জানে, ঐ নিরীহ হাসির তলায় লুকিয়ে শুয়ে রয়েছে এক শঙ্খচূড় সাপ ।

একটু বাদেই ট্যাক্সিওয়ালা বেরিয়ে এল চায়ের দোকান থেকে । পিছু পিছু রঙলালও। কাছে এসে, 'হাই মাস্টারজী, বিলাতি জেনানাকে লিয়ে জঙ্গলে ঢুকছেন এই অবেলায় ? পথে কত ডর, বাঘ-বরা, সাপখোপ ।'

দাঁতে দাঁত চেপে রাজীব বহুকষ্টে সামলায় নিজেকে । ক্যাথিকে নিয়ে উঠে পড়ে ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সি চলতে শুরু করে ।

পেছন থেকে রঙলালের চড়া হাসি ফোয়ারার মত ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে । পিচকারির মতো আছড়ে পড়ে রাজীবের পিঠে ।

শেয়ালের হাসি হাসতে হাসতে রঙলাল বলে, 'মাস্টারজী কো বহুত গুসসা হো গয়ীল বা ।'

গজাশিমুল গাঁয়ে সোনার সন্ধান

'সুনীলই আমাকে দিয়েছিল গজাশিমুল গাঁয়ের সন্ধান ।' রাজীব এভাবেই শুরু করে, বাঁকুড়া কলেজে অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে আমি তখন এই এলাকার লোকসংস্কৃতি নিয়ে কাজকর্ম শুরু করেছি । ঐ নিয়ে পাগল । কোথাও নতুন কিছুর সন্ধান পেলেই তৎক্ষণাৎ ছুটে যাই । টুসুগান, ভাদুগান শুনি রাতভর । খাতরা থানায় পোড়কুলের মেলা বসে কংসাবতীর চরে, টুসু গানের মেলা । হাজার হাজার মানুষ পায়ে হেঁটে যায় । চলে যাই সেখানে । বিষ্টুপুরে হোলিগানের আসরে বসে রাত্রি উজাগর করি ।

'সুনীল কে ?' 'শুধোয় ক্যাথি বার্ড ।'

'সুনীল ছিল বাঁকুড়া কলেজে আমার ছাত্র ।'

'সুনীল জানল কি করে গজাশিমুলের সন্ধান ?'

'ওর বাড়ি রানীবাঁধ বাজারে । তাছাড়া, সুচাঁদ ভক্তার সঙ্গে চিরুড়ি ইস্কুলে পড়ত সে । তো, সুনীলের মুখে খবরটি শুনে একদিন চলে গেলাম ওকে সঙ্গে নিয়ে । বন জঙ্গল, খাল-খুলিয়া, পাহাড়-ডুংরী পেরিয়ে, পৌঁছুলাম গজাশিমুল গাঁয়ে ।'

ভদ্দর লোকদের ওরা বলে 'কাঁকড়া' । তো, সুনীলের সঙ্গে আচমকা এক 'কাঁকাড়া'কে দেখে তো গাঁ-ছেড়ে দৌড় মারল জোয়ান মদ্দরা, ঢুকল সব গহীন জঙ্গলে, খুলিয়ার গভ্ভরে। মেয়েরা ঘরের কোণে সেধাঁয় । বহু হাঁক-ডাক করার পর, বহু সাহস জোগানোর পর দু'চারজন বেরিয়ে এল ঝোঁপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে । তাদের চোখে অচেনা ভয় । মেয়েরা উঁকিঝুঁকি মারে ঘরের কোণ থেকে । সুনীলই পরিচয় দেয় আমার । শুনে অল্প স্বল্প আশ্বস্ত হয় গজাশিমুলের মানুষ । পুলিশ-টুলিশ লয় । ঠিকাদারও লয় । লোকটা মাস্টার । ছাত্তর পড়ায়। ধীরে ধীরে চারপাশে মাঝারি গোছের ভীড় জমে । ডাক পড়ে দশরথ ভক্তার । ডাক পড়ে ঝাড়েশ্বর কোটাল, কান্ত মল্লিকের । এরা সব গাঁয়ের প্রাচীন ব্যক্তি । ডাক পড়ে

সুচাঁদ ভক্তারও । সে হল গাঁয়ের একমাত্র পড়া-লেখা-জানা 'ছগ্‌রা' ।

ওদের সঙ্গে ভাব জমাতে থাকি । ওদের ভয় ভাঙবার চেষ্টা করি প্রাণপনে । ভয় কি মোদের যায় মশয় ? এতদিনে দশরথ ভক্তা কবুল করে সেটা । বলে, তুমাকে মোরা যতই শুধাই, কি উদ্দেশ্যে আগমন, তুমি ততই জবাব দাও, কুনো কারণ নাই, শুধু-মুদু আঁইছি । ইট্যা একটা ভয় পাবার মত কথা লয় ? শুধু-মুদু কোউ বিশ ক্রোশ জঙ্গল ফুঁড়ে এই অজানা গাঁয়ে আইসে আইজ্ঞা ?

যা হোক, অনেকক্ষণ বাদে, জলটল খেয়ে আমি ধীরে ধীরে খোলসা করি মনের বাসনাটা ।

বলি, 'তোমাদের নাচ-গান আমি দেখতে চাই ।'

হাই বাপ ! সে ফের কি দেখবেন গো ? সে কি ভদ্দরজনের দেখবার তুল্য চিজ আইজ্ঞা ?

ভয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে গজাশিমুলের মানুষ । কি উদ্দেশ্যে আগমন, কে জানে! লাচ-গান দেখবার ছলে বসু-শবরদের পাছায় কুন হুঁড়কাটি সেঁধাবার মতলব, তা ভগমানকে মালুম । নানাজাতের অনাগত আশঙ্কা ভীড় করে ওদের মনে । কোথা থেকে কি যে হয়ে যায় ! এই গরীব জীবনে, শুকনা ডাঙায় দু'মানুষ জল ।

অবশেষে কঠিন গলায় দশরথ ভক্তা বলে, উ লাচ-গানের কথা ছাড়ান্ দ্যান্ আইজ্ঞা । আসল কথাটা খোলসা করুন । বড্ড ডর লাগছে ।

করুণ গলায় বলি, বিশ্বেস কর, তোমাদের নিজস্ব নাচ-গানগুলো দেখা ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্যই নেই আমার ।

সুনীলও অনেক করে বোঝাল । কিন্তু ওরা আগের মতোই অবুঝ । বলে উ' গুলান ফের দেখাবার মত চিজ আইজ্ঞা ? উ'সব আমাদ্যার ভোখ ভুলবার লছনা । খাদ্য বিহনে ছেইলা-ছগরার দল কাহিল হইয়েঁ পড়ে, দু'দণ্ড লাচ-গান ধাপুড়-ধুপুড় করে ভোখ ভুলে থাকা । তার বেশি কিছো লয় ।

প্রথম বারে বিরস বদনে ফিরে এসেছিলাম । তা বলে হাল ছাড়িনি, হেরে যাইনি । বারবার গেছি, উঠোন চেপে বসেছি, বাচ্চাদের কোলে-কাঁখে নিয়েছি । রানীবাঁধ বাজার থেকে লজেন্স-বিস্কুট নিয়ে গিয়ে বিলিয়েছি বাচ্চাদের মধ্যে । মা-মাসী পাতিয়েছি বয়স্কা মেয়েদের সঙ্গে । সুচাঁদ, ওদের মধ্যে অল্প লেখাপড়া জানে, পুরুলিয়া জেলার চিরুড়ি ইস্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিল ও, এখন একুশ-বাইশ বছরের যুবক । দিনের পর দিন পাখি-পড়ান পড়িয়েছি ওকেও । ধীরে ধীরে বরফটা গলেছে । এক সময় দরজাটুকু আলতো ফাঁক করেছে গজাশিমুলের মানুষ । দেখবেক বইল্‌ছে ত দেখাঁই দাও না হে । খেইয়েঁ তো আর লিবেক্ নাই গানগুলান । মারা-ধরাও নাই করবেক । ত, শুনাই দাও ।

ফাগুন মাসে চতুর্দিকে বসন্তের হাওয়া । ঘরে ঘরে 'মায়ের দয়া' হয় । এ সময় মা-শীতলাকে তুষ্ট করবার জন্য সাধ্যমত চাঁদা-ভ্যাদা দিয়ে ভক্তি ভরে পূজো করে শীতলা দেবীর । সেই উপলক্ষে তিন রাত নাচ-গানের মাধ্যমে 'লিশি-উজাগর' করে ওরা । পূজার সঙ্গে 'লিশি-উজাগর' করলে মা নাকি আরও সদয় হন । ডাক পেয়েই চলে গেলাম । তিনি রাতই ছিলাম । তিনরাতে তিনটে পালাগান করেছিল ওরা । সাধারণভাবে পালাগান বললে তুমি ব্যাপারটার কিছুই বুঝবে না । সবদিক থেকে সে এক অন্য বস্তু, একেবারেই স্বতন্ত্র ।

প্রথম রাতে ছিল শীতলা-বন্দনা । বিচিত্র সুরে গান, বন্য তালে বাজনা, নিজেরাই শীতলা

সেজেছে, সেজেছে বাহন গর্দভ, এমন কি রোগ-জীবাণুও সেজেছে কেউ কেউ। নাচ-গানের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছে রোগ-জীবাণুর শক্তি আর ব্যাপকতা, তাদের ক্রোধ, ভয়াবহতা..., দেখলে গা শির শির করে। এমন মৌলিক প্রাণবন্ত অভিনয়, না দেখলে বিশ্বেস করা কঠিন।

দ্বিতীয় রাতে ছিল 'শিকার-লাচ'। অরণ্যের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এক আদিম গোষ্ঠী তাদের এক বিশেষ শিকার-উৎসবে চলেছে। এমনিতেই জঙ্গলে শিকার করা তাদের দৈনন্দিন জীবিকার পর্যায়ে পড়ে। আলাদা উদ্দীপনা রয়েছে সে শিকারে। আনুষ্ঠানিক শিকার-যাত্রায় সে উদ্দীপনা শতগুণ বেড়ে যায়। জীবিকা পরিণত হয় উৎসবে। তখন আনন্দে কলরবে মেতে ওঠে শিকারজীবী মানুষ। নাচে, গায়...। ঘর থেকে বেরোবার সময় প্রিয়জনেরা ফরমায়েশ করে, 'সব চেয়ে বড় সাট্‌নাটি (গোসাপ) আমার তরে এনো।'

আদিম মানুষের শিকার-পর্ব নিয়ে প্রায় চার ঘণ্টার এক নৃত্য-নাট্য। লম্ফে-ঝম্ফে, শৌর্যে-বীর্যে, অভিনব!

'চাঙ লাচ' হল তৃতীয় রাতে। এক বিশেষ ধরনের গানের সঙ্গে সমবেত নাচ। সঙ্গে বাজনা বলতে কেবল চাং আর মাদোল। শুনতে শুনতে আর দেখতে দেখতে বিস্ময়ে থ' হয়ে গিয়েছি আমি। ঈষৎ গ্রাম্যতা আর স্থূলতা থাকলেও এ একেবারে নতুন জিনিস। এর ভাষা স্বতন্ত্র, সুর মৌলিক, নাচগুলোর আঙ্গিকও একেবারেই অচেনা। সব মিলিয়ে এর আবেদন ভাষায় প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। আমি কেমন বোবার মতো বসে থাকি। এমন গান বাঁধল কে? কে দিল অমন অপার্থিব সুর? কোথায় শিখল অমন প্রাণ মাতাল করা নাচ? যতই ভাবি, ততই যেন বিস্ময়ের অতলে তলিয়ে যেতে থাকি। 'চাং' আর মাদলের একটানা বোল রক্তে রক্তে কেমন নেশা ধরিয়ে দেয়। আমার কথায় লজ্জা পায় গজাশিমুলের মানুষ। বলে, 'এ মোদ্যার বাপ চুদ্দো পুরুষের ধারা আইজ্ঞা। উঁয়ারাই বানাইছিল সব কিছো। মৃত্যুকালে দিয়ে গিছেন মোদ্যার।'

শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যাই। সরলপানা মানুষগুলো জানে না, কি ঐশ্বর্য নিয়ে বসে রয়েছে ওরা!

সুনীল ফিসফিস করে বলেছিল, 'এদের আরও অনেক নাচ-গান আছে স্যর। ওদের বিহা গীত, পরবের গান আর আষাঢ়িয়া শুনলে ভুলতে পারবেন নাই।'

শুধিয়েছিলাম, 'কোনও বড় আসরে গেয়েছ কখনও?'

বড় আসর? গজাশিমুলের মানুষগুলো এবার ভীষণ লজ্জা পায়। বড় আসর কুথাকে পাব আইজ্ঞা? ইসব গাঁওলী-লাচ, কে খর্‌চা দিয়ে জুড়াবেক? বাবুরা সব যাত্রা-বাইস্কোপ দেখেন। হরেক ফুর্তি-ফার্তা করেন। টাকা উড়ান্। উঁয়ারা আইজ্ঞা কুন্ দুখে ইসব ছোট-লোকী চিজ পইসা দিয়ে দেখবেন? ইসব মোরা লিজেরাই গাই, লিজেরাই শুনি।

আবেশে ভোঁ হয়ে যেতে যেতে বলি, 'এবার বাবুদেরও শোনাতে হবে এসব।'

শুনে ওরা লজ্জায়, ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে যায়।

দশরথ ভক্তার বিলাপ

এ মাস্টারটা আড়ক্ষ্যাপ্যা! বলে কিনা তুয়াদার দলকে আমি বাঁকুড়া শহরে লিয়ে যাব। আমরা বলি, হাই বাপ, সে যে বহুত ধুর গ। উ বলে, বেশি ধুর লয়। সিখ্যেনে ফি'বছর সরকারী মেলা বসে। গাঁ-গঞ্জের হারিয়ে যাওয়া ফুরিয়ে আসা লাচ-গানের সিখ্যেনে ভারি কদর। ভালো

হলে, তারা মেডেল দেয়, টাকা দেয় ।

মাস্টারের কথা শুনে চোখের পাত্‌নিও বুঝি ফেলতে ভুলে যাই মোরা । ছগরা বলে কিনা, বসু-শবরের ছা'যাবেক শহরে লাচ করতে ! কুনোদিন অমন কথা শুনেছে কেউ ? বসু-শবরের ছা' তুমি ? তাইলে তুমি জঙ্গলে যাও । ফল-পাকুড় খোঁজ । মৌচাক ভাঙ । কন্দমূল খুঁড়ে বার কর । শিকার মার । জঙ্গলে কত ফল-ফুলারি, ভ্যাঁচ-কেঁদু, ভেলাই-ভুঁড়ুর, কাঁটা-আলু, চুরকা-আলু, পান-আলু, রাখাল-কুদরী, বন-কাঁকড়ো— সে সব খুঁজে পেতে আন । জঙ্গলে কত শিকার, ছোট শিকার (খরগোশ), গুঁড়চ্যা, মালো, খটাশ, বন-মুরগী, তিতির, কোয়েল, গুঁড়ুর । তা বাদে আছে ঢ্যামনা সাপ, সাট্‌না (গোসাপ),— সে সব মার । ঢ্যামনা সাপের ছালের বহুত দাম হে । আর সাট্‌না দেখলে বসু-শবরের বাচ্চার জিভে যে জল আসে, সিট্যা আর কে না জানে ! সাটনার ছাল ছাড়িয়ে পুড়িয়ে নাও । চামড়াটা বেচে দাও রানীবাঁধ বাজারে কিংবা ফুলকুসমার হাটে । গাছে গাছে ঠেলুর (বানর) দল বসে বসে মুখ ভ্যাঙাচ্ছে, তীর কিংবা গুলতি ছুঁড়ে মারো । ঠেলু মারা অবশ্যি সোজা কথা লয় । অনেক লোক লাগে । ঘা খেইয়ে ঠেলু ছুটবেক গাছে গাছে । তুমরা ছুটবে তলায় তলায় । সুযোগ মত তীর চালাবে, পাথর-রডা ছুঁড়ে মারবে নিশানা করে । এক সময় ঠেলুর-পো কাহিল হয়ে মু'থুবড়ে পড়বেক মাটিতে । তারপর সবাই মিলে লাঠিপেটা করে শেষ করে দাও ওকে । ছাল ছাড়িয়ে নাও । মাংসটা তৃপ্তি করে খাও। চামড়াটা দিয়ে 'চাং' ছেয়ে নাও । জঙ্গলের মধ্যে অচিনকালের হাজা-মজা বাঁধ । ঠাণ্ডা থলথলে পুরোনো পাঁক । তার তলায় কালো কুচকুচে কটু (কচ্ছপ)-র দল বাস করে । ডুব দিয়ে, পাঁক হাল্‌টে, ধর সে সব । জঙ্গলের বাইরে ধানের ক্ষেত । মাঘ-ফাল্গুনে আলে আলে কত ধেড়ে ইঁদুরের গর্ত । পাকা ধানের টানে ওরা বাসা বাঁধে আলের ধারে ধারে । বড় বড় 'ভোঁসল' বানায় । আলের তলায় সুড়ুং বানায় । অসংখ্য সুড়ুং । সে এক গোলকধাঁধার রাজ্যি । তার মধ্যে ঠেসে থাকে মাঠ থেকে চুরি করা ধান । এসব গর্ত বসু-শবর ছাড়া কার নজরে পড়ে হে ? যাও, গোলকধাঁধার সব গর্তের মুখ খড় দিয়ে বন্ধ করে দাও । খোলা রাখো শুধু একটি মাত্তর ভোঁসলের মুখ । ঐ ভোঁসলের মুখে লাড়া খড় ঢুকিয়ে, লাগিয়ে দাও আগুন । লাঠি বাগিয়ে খাড়া থাক ভোঁসলের মুখের দিকে ঠায় তাকিয়ে । চোখের পাত্‌নি পড়বেক্ নাই । খানিকবাদে মুখ দেখাবেক গণেশের বাহনরা । ধোঁয়ায় ততক্ষণে দম আট্‌কে আসছে উদের । বাঁচবার তরে বেরিয়ে আসবে একের পর এক । তুমিও বাইরে লাঠি লিয়ে তিয়ার । ঘা' মার মাথা নিশানা করে । আলের ধারে লুটিয়ে পড়বেক্ এক তাল কাদার মত । ধান খেয়ে খেয়ে কি তাদের বপু ! পাঁচ-সাতটা হলেই ভোজ জমে যাবে আলের ধারেই । লাড়া খড়ের আগুনে ওগুলোকে ঝলসে নাও আস্ত । ছাল-ছাড়িয়ে গপাগপ খাও। জষ্টি-আষাঢ়ে ধানের ক্ষেতে কচি কচি চারা । তার টানে দল বেঁধে আসে 'ছোট শিকার'-এর পাল । লম্বা কান উঁচিয়ে চরে বেড়ায় । ওদের মেটে রঙের শরীরগুলো তখন ওঠা নামা করে সবুজ ক্ষেতের মধ্যে । যাওয়া আসার পথে ফাঁদ পাত । দু'দশটা পড়বেই। তবে পথটা চেনা চাই ঠিক ঠিক । তা, তুমি বসু-শবরের পুত্তুর, 'ছোট-শিকারের' আনাগোনার পথ চিনতে লারবে তো বৃথাই তোমার শবর-জনম্ । তুমি তা'লে শহরে যাও, লগরে যাও, মাথার চুল ছেঁটে, বাবু সেজে, 'কাঁক্‌ড়া'দের মতো ছ্যাঁচড়ামি করে বেড়াও । মৃগয়াবৃত্তি তোমরা তরে লয় ।

মৃগয়াবৃত্তির বাইরেও কত কাজ রয়েছে বসু-শবরের তরে । জঙ্গলে হরেক জাতের

কাঠ । হত্তুকি, বহেড়া, কঁচড়ার বীজ । সে সব কুড়াও । কাঠ দিয়ে লাঙ্গলের ঈশ বানাও। সে সব লিয়ে যাও ঝিলিমিলি, রানীবাঁধ, বাঁশপাহাড়ীর হাটে । যাও গেরস্তদের দোরে দোরে। অঘোর রায়ের হয়ে চোরাই গাছ কাট, চেরাই কর রাইতের আঁধারে, তুলে দাও টেরাকে, নামমাত্র দাম লিয়ে ঘরে যাও ।

তা নয়, বসু-শবরের ছা' চললেক্ লাচবার লেগে, শহরে । আরে বাপ্, বাঁকুড়া কি যে সে শহর ! আমি কি আর দেখি নাই ? কত ঘর-বাড়ি, দোকান-পশার, আলো-বাতি । দিনরাত বাস-টেরাক্ হঁকুরে ছুটে যায় । কত 'কাঁক্ড়া' গিজগিজ করছে সিখ্যেনে । তুয়ারা অমন থানে গিয়ে কি করবি ? শুধুমুদু বসু-শবর জাতের মু' পুড়ানোই সার হব্যেক্ । তুয়াদের লৈতা-ছৈতা পরা উদ্‌ম গা' দেখে 'কাঁক্ড়া'র দল সব হেসে কাহিল হবেক ।

এসব কথা ছা-ছগ্‌রাদের যদি বা বোঝানো যায়, উই ক্ষ্যাপা মাস্টারকে বোঝায়, কার সাধ্যি ? শুধুই বলে, সিট্যা আমি বুঝবো । তুমরা কেবল যেমনটি পালাগান গাও, তেমনি গাইবে । বাকি ভাবনা আমার । ছেলা-ছগরাদের চোখও চকচক করছে শহরে যাবার লেগে। বুঝতে কি আর লারি মুই ? যা মনে লেয় কর তুমরা । কিচ্ছোটি জানি নাই মুই । সুচাঁদ জানে । মাস্টার জানে । মোর পাশ কিছো নাই আর । হে আগুনবরণ, এ ক্ষ্যাপা মাস্টারের পাল্লায় পড়ে শেষ অবধি এই বসু-শবর জাতের কপালে কত দুঃখই না আছে ।

মিস বার্ড মন দিয়ে শুনছিল রাজীবের মুখ দিয়ে দশরথ ভক্তার জবানবন্দী । সহসা ঘ্যাঁচ শব্দে দাঁড়িয়ে গেল ট্যাক্সি । মিস্ বার্ড শুধোল, 'কি হল ?'

ড্রাইভার জবাব দিল, 'ঝিলিমিলি পৌঁছে গেছি ।'

দেশ জুড়ে খরা হইল্যাক, দারুণ খাটারশাল, হে—
রাঢ়ের মানুষ চল্যেছে নাবাল

এখন আষাঢ় মাস । দিন কয়েক আগে দু'এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে । রাঢ়ের আকাশে মেঘটা দইয়ের মত জমছে । আবার ছানা কেটে যাচ্ছে । মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প কাপড়-ভেজানো ঝিরঝিরানি । রাঢ়ের মানুষ বলে, 'গুঁড়িঝাড়া' ।

খবর এসেছে, পুবে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়েছে এ ক'দিনে । তা ত হবেই । যে নাই জানে বার-তিথি, আষাঢ় মাসের সাত তারিখে অম্বুবাচী । এ শাস্ত্রের বচন । রাঢ়ের মানুষ জানে, ঐ দিন ধরিত্রী ঋতুমতী হন । কাঁচাদুধসহ পাকা আম খেয়ে চাষীরা হাল বলদ নিয়ে রওনা দেয় মাঠে ।

মাস্টার আঙুল তুলে দেখায়, 'ঐ দ্যাখ ।'

ঝিলিমিলি বাজারে রাজীব আর ক্যাথি বার্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে । গজাশিমুলের দিকে রওনা দেবে ওরা । অল্প তফাতে বিশাল আশথ গাছের তলায় আদিবাসী মানুষের জমায়েত । বসে-দাঁড়িয়ে ক্ষণ গুনছে ওরা । কেউ কেউ তালাই পেতে শুয়ে পড়েছে মাটিতে । পাশে রয়েছে ক্যাঁথা-বালিশ, বোঁচকা-বুঁচকি, কাচ্চা-বাচ্চা, হাঁস-মুরগী । পুরো সংসারখানা ঘাড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে এরা । বাঁশের বাঁশি নিয়েছে এক রসিক ছোকরা । অতো তাড়াহুড়োতেও ভোলে নি । অল্প তফাতে বসে তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছে সে । দূরে বসে, কান খাড়া করে শুনছে কিশোরী-যুবতীর দল । মুখ টিপে হাসছে ।

রাজীব বলে, 'দ্যাখ, কেমন পুরো সংসার চলে যাচ্ছে ঘরবাড়ি ছেড়ে ।'

তাইতো। ক্যাথি বার্ড-এর নীল চোখে সমুদ্রের ফেনার মত কৌতূহল। কোথায় চলেছে এরা ? এনি ফেস্টিভ্যাল ?

'ঠিক তাই।' রাজীব একটুক্ষণ থেমে বলে, 'নাবালে চলেছে রাঢ়ের মানুষ।'

আশথতলার জমায়েত ভুলভুল করে দেখছিল ক্যাথি বার্ড-কে। তাদের চোখেমুখে সীমাহীন বিস্ময় আর কৌতূহল। ক্যাথি বার্ড-এর পোশাক-আশাক, গায়ের রঙ, মাথার চুল, দাঁড়ানোর এবং কথা বলবার ধরন দেখে ওরা হেসে বাঁচে না। মেয়েরা হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে।

'উহ!' ক্যাথি বার্ড যেন পুলকে শিহরিত হয়, 'এমন কি করে হাসে বলতো এরা ? এমন সর্বাঙ্গ নিংড়ে হাসি ? ওদের কি সত্যিই কোনও দুঃখ নেই ?'

'ওদের জীবন-ধারণ প্রণালীটা একটুখানি শুনবে নাকি ?' রাজীব মুচকি হেসে বলে।

'শুনবো। কিন্তু তার আগে, দাঁড়াও— ।' বলতে বলতে এগিয়ে গেল ক্যাথি বার্ড। ক্যামেরা বাগিয়ে পটাপট ছবি তুলল গোটা কয়েক। বাঁশিওয়ালা ছোকরার কাছে গিয়ে চালিয়ে দিল টেপ। ফটোও তুলল।

মূল জমায়েত থেকে খানিক তফাতে চার-পাঁচজনের একটি দল ভুয়াশ গাছের তলায় বসে উচ্চনাদে গান ধরেছে :

দ্যাশ জুইড়্যে খরা হইল্যাক,
দারুণ খাটারশাল হে—,
রাঢ়ের মানুষ চল্যেছে নাবাল।
শুখা-হাজা দেশে মরে, ঘরের ছা-ছাওয়াল হে—,
রাঢ়ের মানুষ চল্যেছে নাবাল— ।

ক্যাথি বার্ড ছুটে যায় ওদিকে। ঝলক ঝলক ফোটো তোলে, টেপ-রেকর্ডারে ধরে নেয় গানের কলিগুলো।

(উখ্যেনে) আগাশ ভত্তি বিষ্টি আছে
ফোটোয় আঁকা ক্যাঁদেল আছে
ফিরার ব্যালায় ধইর‌্ল্যাক পুলুশ,
ছিনাই লিল্যাক বামাল হে—,
রাঢ়ের মানুষ, চল্যেছে নাবাল— ।

ক্যাথি বার্ডের আনন্দে উপচে পড়া মুখখানা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিল রাজীব। বলল, 'ওদের লাইফটা শুনবে না ?'

'ওহ্ শিয়োর!' ক্যাথি বার্ডের যেন সহসা মনে পড়ে গেল। বলল, 'বলো, বলো, শুনি।'

এই রুখা-ভুখা মাটির দেশে কাজ কাম নেই। ক্ষেত-জমিনের বারো আনাই টাঁড়-টিকর, ডাঙা। দো-ফসলা তো দূরের কথা, এ ফসলাও সব বছর হয়না। এক, আকাশ পাল্‌লে হয়, লচেত লয়। কাজ-কাম নেই বটে, তবে রাঢ়ের মানুষের সংখ্যাটা কম নয়। গরীব মানুষ দিনভর খাটালির পর এক-মুখীন আনন্দে ডুবতে গিয়ে, মানুষের সংখ্যাটা অজান্তে বাড়িয়ে ফেলে। আর এই রাঢ়ভূম আর জঙ্গলমহলে গরীব মানুষ— ভূমিহীন ভিটাহীন—এদের সংখ্যাই

বারো আনা। এখানে কাজ কম, লোক বেশি। কাজ বিহনে, খাদ্য বিহনে রাঢ়ের এই বারো আনা মানুষ তিনমাসের বেশি পেটপুরে খেতে পায় না। বাকি ন'মাস তাদের চলে অর্ধাহার, অনাহার, অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ, এবং রোগের প্রকোপে পড়ে মরণ।

দেশে থাকলে সাক্ষাৎ মৃত্যু, তাই চাষের সময় আর ফসল কাটবার সময় রাঢ়ের বহু মানুষ চলে যায় পুবের দিকে খাটতে। বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া... । ওদিকটা নাবাল অর্থাৎ নিচু জায়গা। ক্ষেতে জল জমে এবং থাকে। চাষবাসও হয় পুরোদমে। কাজ মেলে তাই পশ্চিমা মজুরদের।

রাঢ়ের মানুষ নাবালে গেল খেতে পায়। থাকবার জায়গা পায়। মজুরীটাও পায় তুলনায় বেশি। পুরো ব্যাপারটা ক্যাথি বার্ড-এর কাছে প্রাঞ্জল করতে থাকে রাজীব।

ক্যাথি বার্ড গোগ্রাসে গিলছিল। শুধোল, 'এরা কি পুরো ফ্যামিলীই চলে যাচ্ছে ?'

'কোনও সংসারে সব্বাই। কোনও সংসারে দু'একজন বুড়ো-থুড়ো রোগী-টোগী রইল।'

'এরা আর ফিরবে না ?'

'ফিরবে। ভাদ্রর শেষে। আবার চলে যাবে অঘ্রাণে। ফিরবে মাঘের শেষে।'

'এরা তো এক ধরনের বোহেমিয়ান।' চোখ বড় বড় করে তাকায় ক্যাথি বার্ড, 'নো-ম্যাডিক !'

'তা বোধ হয় নয়। কারণ, যেখানেই যাক্, যত দূরেই যাক্, ঘরের মায়া, ভিটের মায়া এদের প্রবল।

'কিন্তু ভিটেতে এরা থাকতে পারছে কই ?'

'তা ঠিক। কাজের ধান্দায় পুরো সংসার চার-পাঁচ মাস রইল ভিন্‌দেশে। ফিরে এসে সে দেখবে কি ? তার চালের খড়গুলো, হয় পড়শীতে টেনে নিয়ে গেছে, নয়তো গরুতে টেনে খেয়েছে। আগুনার বেড়াটি পুরোপুরি লোপাট। যাবার আগে উঠোনে কিংবা পেঁচ-প্যাঁদাড়ে যে টুকটাক কাঠকুটো, গেরস্থলী সামগ্রী ছিল, বহু মেহনতের সেই সামগ্রীগুলো বেমালুম হাওয়া। ভেবে দ্যাখো, গাঁ-গঞ্জের মানুষ হয়েও কিন্তু জীবনেও নিজের ভিটের এক টুকরো আনাজ দাঁতে কাটতে পারে না এরা।'

'কেন ? ফলালেই পারে অল্পস্বল্প।'

'কখন ফলাবে ? কী করেই বা ফলাবে ? ভিটে ছেড়ে দীর্ঘদিন বাইরে থাকবার দরুন, সীমানার বেড়া-টেড়া সব লোপাট। তাও যদি উৎসাহী মানুষ কোনও গতিকে দু'চারটে বেগুন-লঙ্কার চারা লাগায় তো ফল ধরবার আগেই তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে ভিনদেশের উদ্দেশ্যে। ফিরে এসে দেখবে, ঐ সব গাছের চিহ্নমাত্র নেই। সংসারী মানুষ হয়েও তাই ওরা জীবনে গেরস্থালীর স্বাদ পায় না একদিনের তরেও। যাযাবর ছাড়া এরা আর কি হবে বলো ?'

'তবে ফেস্টিভ্যালে চলেছে বললে যে ?'

'ফেস্টিভ্যাল্ ছাড়া আর কী ?' রাজীব তেতো হাসে, 'পেট পুরে চাট্টি খাবে, ঐ টানেই না সমাজ-সংসার তুচ্ছ করে চলেছে এরা। ওদের কাছে খেতে পাওয়াটাই উৎসব-বিশেষ।'

'আশ্চর্য !' ক্যাথি বার্ড বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকে আশথতলার দিকে। বিড়

বিড় করে বলে, 'ইণ্ডিয়ার মতো একটি সভ্য দেশে...

'যাগ্‌গে !' রাজীব হাসে, 'এটা যে একটা সভ্য দেশ, সেটা একজন পশ্চিমী যুবতীর মুখ থেকে শুনে ধন্য হলাম।'

'কেন ?' ক্যাথি বার্ড চোখ পাকিয়ে তাকায়, 'পশ্চিমের মানুষেরা কি তোমাদের অসভ্য ভাবে নাকি ?'

'তাইতো জানি। ইণ্ডিয়াতে সাপ-ভূত-ডাইনি আর ভিখিরি ছাড়া আর কেউ বাস করে না, এটা দুনিয়াময় রটাবার জন্য অনেক ডলার খরচ কর তোমরা।'

'অ্যাই— !' মিস বার্ড ক্ষেপে যায়, 'তুমি কিন্তু আবার ঝগড়া করতে চাইছো।'

রাজীব হেসে ফেলে।

'দ্য ফোক্' পত্রিকার কভার

সহসা কীট্-ব্যাগখানা খুলে ফেলে ক্যাথি বার্ড। বের করে এক কৌটো চকোলেট। এগিয়ে যায় আশথ্‌তলার দিকে। দু'একটি বাচ্চার মুঠোর মধ্যে চকোলেট গুঁজে দিতেই চারপাশে সোরগোল ওঠে। রাজ্যের বাচ্চা ছুটে এসে ভীড় করে দাঁড়ায়। ক্যাথি বার্ড-এর চারপাশে রোগা-ময়লা হাতগুলো বাড়িয়ে দিয়ে কিলবিল করতে থাকে। মিস বার্ড-এর উল্লাস তখন দেখবার মত। দু'হাতে চকোলেট নিয়ে ছুঁড়ে দিতে থাকে চারপাশে। খিলখিলিয়ে হাসতে থাকে ঝর্ণার মত। যেন এক ভারি মজার খেলা খেলছে সে। রাজীব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল দৃশ্যটা। দেখতে দেখতে মনে পড়ল, কোলকাতার আদিগঙ্গার ঘাটে পূণ্য ক্রয়েচ্ছু ধনীদের খুচরো পয়সার হরিলুটের দৃশ্য। গোটা কয়েক খুচরো পয়সার লোভে এক হাঁটু জলে আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে বিশ-পঞ্চাশটি লোক। কেউ বা দু'একটা পাচ্ছে। কেউ শুধু পিছল সিঁড়িতে আছাড়ই খেয়ে চলেছে বারবার।

একখানা বাস এসে থামে। ঠাস বোঝাই। ছাদের মাথায় গাদাগাদি লোকজন। বোঁচকা-বুঁচকি, ছাগল-মুরগীতে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। তার মধ্যেও বাসের ছাদে বসে প্রাণের পুলকে বাঁশিতে মিষ্টি সুর তুলেছে এক ছোকরা। ক্যাথি বার্ড বাচ্চা মেয়ের মত খিলখিলিয়ে হাসতে থাকে। বলে, 'তোমাদের দেশের সব্বাই কি বর্ন-মিউজিসিয়ান ?'

আশথ্‌তলার মানুষগুলো তাদের সংসার গুটিয়ে ফেলেছে নিমেষের মধ্যে। তৎপর হয়ে উঠেছে তারা। বাসের দরজায় বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে ঠেলাঠেলি জুড়েছে সবাই। কলরব তুলেছে জোরসে। ভেতরে দু'জন মানুষের ঢোকবার ঠাঁই আছে কিনা সন্দেহ। সেই বাসে উঠতে চায় কিনা বিশজন মানুষ লটবহরসহ !

খানিকক্ষণ বাসে-মানুষে হাতাহাতি লড়াই চলে। বাদানুবাদ-গালিগালাজ। ভীড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলিতে কাপড়-চোপড় খুলে যায় কারুর।

ক্যাথি বার্ড নিপুণ হাতে শাটার টিপ্‌তে থাকে সারাক্ষণ।

খানিকবাদে ছেড়ে দেয় বাস। ঠেলাঠেলি-ধ্বস্তাধবস্তিতে বিধ্বস্ত মানুষগুলো ফের ফিরে আসে আশথ গাছের তলায়। ফের নতুন করে সংসার পাতে।

ক্যাথি বার্ড শুধোয়, 'এরা কি পরের বাসের জন্য ওয়েট্ করবে এই নেচার-বিল্ট ওয়েটিং শেড্-এর তলায় ?'

রাজীব বলে, 'অপেক্ষা তো করবেই। করতেই হবে। তবে ঠিক পরের বাসের জন্যই নয়। যতক্ষণ না বাসের সঙ্গে এই হাতাহাতি লড়াইতে জিততে পারবে, ততক্ষণ—ততদিন চলবে এই গাছের তলায় এদের নিরঙ্কুশ প্রতীক্ষা।'

পথের ধারে সংসারগুলো আবার থিতু হয়ে বসে। আবার চাটাইয়ের ওপর গাদাগাদি বিছানাপত্তর বাসন-কোসন, ছাগল-মুরগী এবং মানুষ। চাটাইয়ের সামনে এক উলঙ্গ বাচ্চার সঙ্গে একটি পাতিহাঁস এক এনামেলের থালা থেকে খাবার খুঁটে খাচ্ছে। দেখেই ক্যামেরা বাগিয়ে ধরল মিস্ বার্ড। পুরো সংসারটাকে পেছনে নিয়ে বাচ্চা ও হাঁসের ছবিখানা পলকের মধ্যে ধরে নিল ক্যামেরায়। উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, 'এবারের 'দ্য ফোক' পত্রিকার কভারখানাই হবে এই ছবিখানা দিয়ে। দারুণ হবে, না? দারুণ!'

৪. রাজীব মাস্টারের সার্কেস-দল

রানীবাঁধ বাজারে আজ মহা কলরোল।

সবাই মুখ ফিরিয়ে তাকায়, দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে যায়। ইয়ারা কারা হে? কুথা যাচ্ছে অত সাজগোজ কর্যে? অতো বাদ্যি-বাজনা, চাং-মাদলই বা কিসের লেগ্যে? ইয়ারা বটে গজাশিমুল পার্টি। চলেছে বাঁকুড়া। সিখ্যেনে কি এক মেলা বসেছে। ইয়ারা উই মেলায় পালাগান গাইবেক। তাই বল, ইট্যাই তবে রাজীব-মাস্টারের সার্কেস-দল। রঙলাল বলছিল বটে ক'দিন আগে।

শুনে দাঁত বের করে হাসে কেউ কেউ। ঠাট্টা-ইলচিতে ভেঙে পড়ে। ইয়ারাতো জঙ্গলে সাট্‌না আর ঠেলু মেরে খায়। সে হল বাঁকুড়া শহর। সিখ্যেনে পাকার ঘরে বায়েস্কোপ হয় রোজ। বিশাল মাঠে তাঁবু টাঙিয়ে রাতভর জলসার আসর বসে। কোলকাতা-বুম্বাই থেকে নামকরা 'আটিস্' আনা হয় লাখ টাকা দিয়ে। এই চামচিকার দল কি পালাগান গাইবেক সিখ্যেনে?

শুনে, সুচাঁদ ভক্তার দল এক সঙ্গে সিঁটিয়ে যায় লজ্জায়। মুখ ঝুলিয়ে রাখে মাটির দিকে। মাস্টারের উপর রাগ হয় বেজায়। ওই হল যত নষ্টের গোড়া। ভাজুং-ভুজুং দিয়ে রাজি করাল মুরুব্বীদের। নিজের পাকিটের পয়সা খরচ করে বাঁকুড়া থেকে কিনে আনল পোশাক-পাতি, রঙচঙ, পরচুলা, ঘুঙুর, আরও কত কি। খাতড়া বাজার থেকে সারিয়ে আনল চাং আর মাদল। হাজার টাকা খুয়ার করল নিজেই। পাকা ছ'মাস আনাগোনা করে মহড়া দিল। শেষ পনেরো দিন তো এঁটুলির মত পড়ে রইল গজাশিমুল গাঁয়ে। এলিয়ে পড়া মানুষগুলোকে তাড়া দিয়ে জাগাল। লাচগানগুলোকে ঘসামাজা করল, এখানে-ওখানে জুড়ল, কাটল, কী যে করল, তা ওই মাস্টারই জানে। দলের সবাইতো খালি হুকুম তামিল করে গেছে, চোখ-বাঁধা বলদের মত ঘুরে গেছে ঘানিতে। এখন ঠেলা সামলাও! এই রানীবাঁধ বাজারেই মানুষের ঠাট্টা-ইলচিগুলান শুন এই ছোট্ট বাজারেই যদি এমন ধারা কথা শুনতে হয়, তবে বাঁকুড়া শহরে নেমে পড়া মাত্তর কী হবেক্ হে?

এখন মনে হচ্ছে, এই পাগলা মাস্টারের কথায় লাচাটা লেহ্য হয় নাই। যার কাম তারে

সাজে। লাচ-গান, বাদ্যি, উসব কি জঙ্গলের শিকার-মারা আর পচাপানির সিংহবাবুদের বেগার-খাটা বসু-শবরদের কম্মো ? এসব চিজ হল বাবু-ভায়াদের তরে। মাস্টারটা বোধ লেয় বড়সড় একটা লোকহাসানি না করে ছাড়বেক নাই।

এসব ভাবনায় যোগ দেয় না রাজীব। সে এখন বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। তদারকি করছে সবকিছু। যন্ত্রপাতি বাক্স-প্যাঁটরা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছে। সুচাঁদকে এটা ওটা নানান্ পরামর্শ দিচ্ছে। ঘনঘন হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। বাঁকুড়ার বাস আসবার সময় হল।

ফাগুনের শেষ। বেলা বাড়ছে, রোদের তাত চড়ছে, রানীবাঁধের অল্প দূরে ডুংরীগুলো পুড়তে লেগেছে। বটগাছের চুড়োয় বসে গোটাকয়েক কাক তারস্বরে ডাকছে। দূরে দূরে জঙ্গলে, ডুংরীর কোলে, পলাশ গাছগুলো জ্বলছে। কুসুম গাছগুলোতে আগুন-রঙের কচিপাতা।

মুক্তেশের চায়ের দোকানের সামনে, বিশাল বটের তলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে পুরো দলটা। সাকুল্যে চোদ্দ জনের দল। সুচাঁদ ভক্তা, বদন কোটাল, কানচা মল্লিক ছাড়াও দলে ন'জন পুরুষ। মেয়ে দু'জন, সরেস্বতী আর কৌশল্যা। গুটিসুটি হয়ে বসেছে সবাই। পাশে সাজিয়ে রেখেছে পালাগানের সামগ্রী। চোখেমুখে ভয়, একটা অনাগত আশঙ্কায় কুঁকড়ে রয়েছে মন। বুকের মধ্যে কত রকমের সংশয় ভুট কাটে, যদি গাইতে না দেয় ? যদি বলে, শিকার-লাচ ফের একটা পালা হইলো ? উ চিজ এ বাঁকুড়া শহরে কোউ নাই শুনবেক। হটো দেখি সব। পথ দ্যাখ।

সুচাঁদই এক সময় ফিসফিসিয়ে শুধোয়, 'হঁ মাস্টার বাবু, উয়ারা মোদ্যার যেইত্যে বল্যেছে ত ?'

রাজীব ওর মাথায় সস্নেহ হাত রাখে। বলে, 'যেতে না বললে কেউ অত খরচা করে যায় ?'

'যেদি মোদ্যার গাইতে না দেয় ?'

রাজীব বলে, 'না দিলে বাঁকুড়া শহর দেখে ফিরে আসবি সব। খরচ তো তোদের নয়, আমার।'

'ইয়ারা সব হাসবেক যে।'

ওদের নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করছে যারা, তাদের দিকে এক ঝলক তাকায় রাজীব।

'ভালোই তো রে।' মৃদু হেসে বলে, 'মানুষের মুখে হাসি ফোটালে পুণ্যি হয়। মানুষ বড় কাঁদছে।'

কালেজ্‌কা মাস্টার হলো লাচদলের ম্যানজার ! কেয়া বাত !

'নমস্তে মাস্টারজি।'

পেছন থেকে রঙলালের গলা শুনে মুখ ফেরায় রাজীব। রঙলাল হাসছিল। বলে, 'ইতনা রোদে, এই লটবহর লিয়ে কাঁহা চললেন ? সাথে ইত্‌না চিড়িয়া !'

অসহ্য রাগে মাথায় রক্ত চড়ে যায় রাজীবের। রঙলাল যে সব কিছুই জানে, রাজীবের অজানা নয় সেটা। তবুও এই ন্যাকান্যাকা প্রশ্নে গা' জ্বলে যায় ওর। রাজীব সামলে নেয়।

তখনকার মত কোনক্রমে রাগটিকে গিলে ফেলে। একটা শুভ কাজে বেরিয়েছে। জীবনের একটা বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি সে। এ সময় কি তার মাথা গরম করা সাজে ? এ যে তার অগ্নি-পরীক্ষার মুহূর্ত। এখনই তো মাথা ঠাণ্ডা রাখবার সময় !

হাসতে হাসতে রাজীব জবাব দেয়, 'নাচতে চলেছে হে সবাই, গাইতে চলেছে। বাঁকুড়ায় গ্রামীণ-মেলা বসেছে, শোন নি ? সেই মেলায় পালাগান গাইবে এরা।'

'আরে, বাপ্‌রে বাপ !' রঙলাল যেন মজা পায়, 'এ'তো ভারি জব্বর বাত ! গজাশিমুলের বসু-শবর চলল সদরে লাচ দিখাতে !' থুক্ করে লাল পিক্ ফেলল রঙলাল, 'শুনেছিলাম বটে। মহড়া চলছে হররোজ। তো, সে ইস্ লিয়ে ?' রঙলাল তেরচা হাসে সরেস্বতী আর কৌশল্যার দিকে। খর দৃষ্টিতে তাকায় অন্যদের দিকেও, 'যারে, সব যা', লেচে গেয়ে ইনাম্ লিয়ে আয়। উই ইনামের রুপেয়া দিয়ে একটো তালুক কিনবি এই মুলুকে। আরামসে খাবি-দাবি, লাট-বেলাট কা মাফিক। মগর হাঁ—মেরা করজোটা মিটিয়ে দিবি পহ্‌লে। আরে, এ—কৌশল্যা, তেরা বাপ যে কাল ভি এসেছিল রুপেয়ার জন্যে। আজ তু পাখা মেলে উড়লি লাচ দিখ্‌লাতে ?'

বলতে বলতে রঙলালের চোখ-মুখ দিয়ে বিদ্রূপ যেন ফিলকি দিয়ে বেরোতে থাকে।

সুচাঁদ ভক্তারা পিটপিট করে তাকায়। রঙলালের এমন বল্গাহীন ঠাট্টা-বিদ্রূপ যেন আরও কুঁকড়ে যায়। কুঁকড়ে যে যায়, তার কারণ, রঙ-তামাশার মত শোনালেও কথাগুলো যে রঙলালের রঙ-তামাশা নয়, সে বিষয়ে কারুরই সন্দেহ নেই। ওরা বুঝতে পেরেছে, রঙলাল মনে মনে ফুঁসছে। ভেতরে তার ক্রোধ। শিকর্‌্যা পাখির চঞ্চু থেকে শিকার খসে পড়বার ক্রোধ !

আতাবীজের মত দাঁত বের করে হাসতে থাকে রঙলাল। হাসতে হাসতে রাজীবের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, 'মাস্টারজি, আপনি ছিলেন কালেজ্‌কা মাস্টার। কত লেড়কা-লেড়কীকে পঢ়া-লিখা শিখিয়ে আদমী বানাতেন। অব্ হলেন লাচদলের ম্যানজার। কেয়া বাত !' বলতে বলতে রঙলালের চোখে-মুখে জড়ো হয় দুনিয়ার তাবৎ বিদ্রূপ। বলে, 'এ দেশে লাচ দেখিয়ে পেট ভরে না মাস্টারজি। বরং লাচতে লাচতে পেট বিলকুল খালি হয়ে যায়।'

রাজীব মুখ ফিরিয়ে নেয় উল্টোদিকে। লোকটার সংস্পর্শে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। গা' গুলিয়ে ওঠে। তাছাড়া এই শুভযাত্রার মুহূর্তে কথা চালাচালি করে মনটা তেতো করতে ইচ্ছে করে না মোটেই। সময় একদিন আসবে, অবশ্যই আসবে, রঙলালকে উপযুক্ত জবাব দেওয়া যাবে ঐ দিন।

রাজীব পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকে উল্টোদিকে। সহসা একটু বেশি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে। একে ওকে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি জুড়ে দেয়। সুচাঁদ, যুষ্টির, ভাকু, কোথায় গেলে সব ? বাস আসবার সময় হল যে ! ডাকো সব্বাইকে। বদনটা কোথায় গেল আবার ? এইতো খানিক আগেই দাঁড়িয়েছিল পানের দোকানে। কোথায় যে যায় সব !

বামনাসিনি পাহাড়ের চুড়োর মন্দিরখানা দেখা যায়। দলের গুণিন গেছে ঐ মন্দিরে প্রাক-যাত্রা পুজো চড়াতে। সঙ্গে গেছে কাস্তো মল্লিকের ব্যাটা কানচা মল্লিক। ওরা কেন ফিরছে না এখনও ! এই সব করতে গিয়ে বাসটা না ফেল করে এরা !

এক সময় বাঁকুড়ার বাস এসে দাঁড়ায় । ঝরঝরে বাস, হাঁফাচ্ছে, পেটের পাইপ দিয়ে সাঁই সাঁই দম ছাড়ছে, লাল ধুলো উড়ে যায় । বাসে বেজায় ভীড়, ছাদেও ঠেসাঠেসি লোক, বোঁচকা-বুঁচকি, লটবহর । সুচাঁদের দল হাতাহাতি করে মালঝাল তুলে দিল ওপরে । নিজেরাও চড়ে বসল মাথায় । কেবল রাজীব আর মেয়েরা ঢুকল বাসের ভেতরে ।

অল্প তফাতে দাঁড়িয়ে সবকিছু চিল-নজরে লক্ষ্য করছিল রঙলাল । কাঠি দিয়ে কান খোঁচাচ্ছিল অলস হাতে । একটি চোখ ছোট হয়ে এসেছে কান খোঁচানোর আরামে । ঠোঁটের কোণে ঝুলছে সেই পরিচিত ভালোমানুষী হাসিটি ।

এক সময় কালো ধোঁওয়া উড়িয়ে ছেড়ে দিল বাস । হারিয়ে গেল মোড়ের মাথায় । বিকট আওয়াজ তুলে ছুটতে লাগল এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে । দু'পাশের ঝোপ-জঙ্গল-ডুংরী, দৌড়ুতে থাকে উল্টো দিকে ।

বাঁকের আড়ালে বাসখানা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া মাত্রই রঙলাল, ঠোঁটের কোণায় ঝুলতে থাকা হাসিটি সুরুত করে টেনে নিল মুখের মধ্যে, টিকটিকি যেমন আচমকা পোকা ধরে গিলে ফেলে ।

এবার লাঙ্গল মুড়া যাবেক্ বিলাত

দশরথ ভক্তা যতই শোনে, ততই অধীর হয়ে ওঠে । অধীর হয়ে ওঠে গজাশিমুলের তাবত মানুষ ।

বলে, 'হাঁ রে, বল্ বল্ । উয়ার পর কি হইল্যাক, বল্ ।'

সুচাঁদ ভক্তা খুশীর চোটে সবকিছু গুছিয়ে বলতে পারছিল না । বলে, 'তারপর, সইন্ঝা লাগাদ আমরা পৌঁছাল্যম বাঁকুড়া শহরে ।'

মালঝাল যন্তরপাতি ঘাড়ে-মাথায় চাপিয়ে পুরো দলটা রওনা দিল মেলার দিকে । কালেজের সুমুখে বিশাল মাঠ, তার মধ্যে মেলা ।

মেলায় ঢুকে তো সবাইয়ের ভিরমি খাবার জোগাড় । শয়ে শয়ে আলো-বাতি, দোকান-পশার । ঢুকবার মুখে বিশাল গেট । তাতে আলপনার লত্ । কতো সোন্দর সোন্দর মেয়া-মদ্দ দামী দামী পোশাক-আশাক, গহনাপাতি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেলাময় ।

ভাবি, হায় বাপ, অমন থানে মোদ্যারকে কে চিনবেক গো ? মোদের তো নৈতা-ছৈতা পরনে । ছিঁড়া-ফাটা জামা-গেঞ্জি গায় । ভিখারীর পারা বেশবাস । হায় বাপ !

দশ বিশটা মাইক্ হুঁকরাচ্ছিল সমানে । সব চোঙে এক কথা । এ এক আচানক ব্যাপার !

'তো, মাস্টারবাবুর পিছু পিছু ফেতি-কুত্তার মতোন হাঁটতে লাগল্যাম মোরা । প্রথমে আপিস ঘরে । সিখ্যেন থিক্যে সোজা সাজঘরে । সিখ্যেনে মোদ্যার্কে মুড়ি দিল্যাক্, চপ্ দিল্যাক্, দড়ি-বালতি দিল্যাক্ । খাবার-দাবার তো সাঙ্গ হল । মাস্টারবাবু বললোক, আজকার আসরে পয়লা গাইবেক পাত্রসায়েরের দল । গজাশিমুল তারপরে ।'

'তারপর ? তারপর ? হায় বাপ । [illegible] ক্যানে রে ?' অস্থির হয়ে ওঠে গজাশিমুলের মানুষ ।

'রাত তখন বোধ লেয় আড়াই পহর । মোদ্যার নাম যখন ডেকে দিল্যাক্ মাইকে, ছাতিটায়

যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে অবিরাম। ... মাস্টারবাবু বলে, ডর কিসের লেগে ? সাহসে বুক বেঁধে গাও দেখি সব। ভয়ে ভয়ে ত শুরু কল্লম লাচ, বদনা ধইর‍ল্যাক গান, মাদলে বোল তুল্ল্যাক ভাকু ভক্তা, আর চাঙে চাঁটি দিল্যাক কান্‌চা ... ।

গাওন যখন শেষ হইল্যাক, চারপাশ চড়াচড় হাততালিতে ভরাঁই দিল্যাক বাবুরা। সে হাততালি আর থামত্যে নাই চায়। টুকচান বাদে মাইকে বইল্‌ল্যাক, লাচে-গানে গজাশিমুল পার্টি সেরিয়া। উয়াদ্যার মেডেল দিবা হব্যেক।

শুনে হৈ-হৈ করে ওঠে গজাশিমুলের মানুষ। দশরথ ভক্তার ঘোলাটে চোখে মণি-মাণিক্য ঠিকরায়। ঢুলুনির ফাঁকে ফাঁকে চোখ খোলে কান্‌চা মল্লিকের বাপ, কাস্তো মল্লিক, ফোকলা পার্টি খুলে হাসে, শিশুর মত অবোধ হাসি. পরমুহূর্তেই ঢুলতে থাকে ফের।

সুচাঁদ বলে, 'আমাদ্যার ডাকল্যাক আপিস ঘরে, সিখ্যেনে কত নাম করল্যাক বাবুরা। মেডেল দিল্যাক, ট্যাকা দিল্যাক, ছাপা-কাগজ দিল্যাক, ঝলাক-ঝলাক ফটো খিঁচল্যাক, সক্কলের নাম-ধাম লিখে লিল্যাক ... । তারপর পেট পুরে মিঠাই খাবাল্যাক, ফের বিদায়কালে বলল্যাক, গজাশিমুল পার্টিকে কোইলক্যাতা পাঠান হব্যেক।'

'বল্ কি রে—!' দশরথ ভক্তার চোখে পাতনি পড়ে না, 'কোইলক্যাতা!'

'হুঁ। কোইলক্যাতা। বিশ্বাস না হয়, মাস্টারদাকে জিগাও।'

কোলকাতা যাবার কথায় হৈ-হৈ করে ওঠে ছগরার দল, আর তাতেই চটকা-ঘুমখানা ভেঙে যায় কাস্তো মল্লিকের। ভুল ভুল করে তাকিয়ে থাকে সে। শুনতে থাকে ছেইলা-ছগরাদের বায়না। সবাই দলের সঙ্গে কোলকাতা যেতে চায়, এমন কি বাঁকুড়া-ফেরত দলে যারা ছিল না, তারাও কোলকাতার নামে দু'পায়ে লাচতে লেগেছে।

কোলকাতাকে নিয়ে কাস্তো মল্লিকদের কৌতূহল আর সংশয়ের সীমা-পরিসীমা নেই। এ গাঁয়ের কেউ কস্মিনকালেও কোলকাতায় যায় নি। কিন্তু জনরব শুনে, — কোলকাতাকে নিয়ে হরেক মানুষের হরেক কাহিনী, বর্ণনা, —শুনতে শুনতে শহরটাকে নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে দারুণ ভয়, শঙ্কা তিল তিল জমাট বেঁধেছে আজীবনকাল।

কাস্তো মল্লিক বলে, 'খোব তো লাচছিস, যা একটিবার কোইল্‌ক্যাতায়, কি হাল হয় তুয়াদ্যার।' এককালে তুখোড় চাঙ-বাজিয়ে ছিল কাস্তো মল্লিক, চাঙের সঙ্গে গাইতও দুর্দান্ত। এখনও কথায় কথায় ঠোঁটের ফাঁকে গুণগুণিয়ে ওঠে দু'চারটে কলি।

ছগরাদের ফুর্তি দেখে ভুরু জোড়া কুঁচকে ওঠে কাস্তোর, ঠোঁট জোড়া নড়ে ওঠে সহসা, বেরিয়ে আসে দু'টি মাত্র গানের কলি :

কইল্‌ক্যাতা শহরে, গাড়ি চলে লহরে,
নীলমণি,—
(তুয়ার) খুইলে লিল্যাক দু'আনি— ।

ভাকু ভক্তার মেয়ে নীলমণিকে জড়িয়ে ধরে হাসতে থাকে কিশোরী মেয়ের দল, খুইলে লিব্যাক বে, যাবি নাই কোলক্যাতা।

পাশে বসে মিটিমিটি হাসছিল রাজীব। বলে, 'শুধু কি কোলকাতা, এবার গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘ কোথায় না যাবে ? দিল্লী যাবে, বোম্বে যাবে, ম্যাড্রাস যাবে, কপালে থাকলে জাহাজে চড়ে বিদেশে যাবে হে।'

এ মাস্টারটা কয় কি ! বিলাত যাবেক, এই গজাশিমুলের চ্যাংড়াগুলান !

কাস্তো মল্লিক ফের ঢুলছিল । বয়েসের গাছ পাথর নেই তার । শরীরের কোঁচকানো চামড়াগুলোকে শুকনো আমসির মত লাগে । আমসির গায়ে অসংখ্য আঁকি-বুঁকি, রেখা-জোকা, সাদা সাদা নুন জমেছে খাঁজে খাঁজে । ইদানিং আর বেশি বাক্যালাপ করে না কাস্তো মল্লিক । সারাক্ষণ গুম মেরে বসে থাকে । মাঝে-মাঝেই ঘুমিয়ে পড়ে । ধীরে ধীরে সব ইন্দ্রিয়ের দুয়োরে কুলুপ আঁটছে । অথচ আগে, যখন শরীরে সাড় ছিল, তখন কত কথাই না বলত । কত আজব আজব কথা । বসু-শবর সমাজের মধ্যে অমন মূল্যবান কথা কে ক'টা জানে ? আর কাস্তো মল্লিকের চাঙ-এর বাজনা যে শোনে নি, তার এই জীবনটাই বৃথা ।

বিলাত যাবার কথা শুনে কোঁচকানো চামড়ার ভাঁজ খুলে তাকায় কাস্তো মল্লিক ।

ঘড়ঘড়ে গলায় বলে, 'এ লাঙল-মুড়া কি কইরে যাব্যেক্ হে বিলাত ?'

দলের সব সামগ্রীর সঙ্গে একটি নকল লাঙ্গলও যায় । পালা গানে ওটা লাগে । কাস্তো মল্লিকের কথা শুনে হো হো করে হেসে ওঠে সবাই ।

কানাইশরজীউ এবং আগুন-বরণ বিত্তান্ত

হাসি থামিয়ে সুচাঁদ ভক্তার পিঠে হাত রাখে কাস্তো মল্লিক । বলে, 'অরে, হাসি-ঠাট্টার সময় লয় ইট্যা । জলদি কানাইশর পাহাড়ে যা । কানাইশরজীউকে পূজা লাগা, বর লে ।'

কাস্তো মল্লিকের কথায় যেন হুঁশ ফেরে সবাইয়ের । মুহূর্তে হুশ্ করে উধাও হয়ে যায় গজাশিমুলের সব কটি মন । চলে যায়, জঙ্গলের পর জঙ্গল পেরিয়ে, পাহাড়-ডুংরী ডিঙিয়ে, ঝরনা-নালা উজিয়ে, এক্কেবারে কানাইশর জীউর পাশটিতে । উহ্, কি দুর্গম সে পথ । পদে পদে পাথরের সঙ্গে ঠোক্কর । লতাপাতার সঙ্গে জড়াজড়ি । একটু অসতর্ক হলেই অঘটন ।

এইভাবে দু'দিন হাঁটলে পরে বেলপাহাড়ী । বেলবাহাড়ী ছাড়িয়ে আরো চলে যাও দক্ষিণে । সহসা সুমুখে রুপোর মত পাহাড় । একটা নয়, একজোড়া । আহা ! লয়ন জুইড়েঁ যায় গো ! এত দিনের পথ হাঁটবার ক্লান্তি ঘুচে যায় নিমেষে ! চোখের সামনে ভেসে ওঠে একজোড়া গলানো রুপোর বিশাল তাল !

পাহাড়ের গায়েই কেন্দাপাড়া গাঁ । সিখ্যানে মোদের জাত থাকে বটে পাঁচ-ছ ঘর । ঠিক মোদের জাত লয় । টুকটান্ লীচো । তা' তিন দিন, দু'রাত হাঁটালি করে তখন জীবন কাহিল । অত উচ্চো-লীচো দেখলে চলে না । উয়াদ্যারই উঠান জুড়ে থাবড়ে বসতে হবেক । টুকচান্ জল-টল খেয়ে জিরিয়ে লাও । পাশে ডুংরীর ধার ঘেঁসে ঝোরা । সেখানে সিনানটা সেরে লাও । তারপর ফের হাঁটতে শুরু কর । ঘড়ি-দু'তিন লাগাড়ে হাঁটলে পৌঁছাবে কানাইশর পাহাড়ে । সেখানেই বাবা কানাইশর জীউর অবস্থান ।

ভাবতে ভাবতে গজাশিমুলের মানুষের বুক রোমাঞ্চে কেঁপে ওঠে । সিঁন্দুরে চর্চিত তিনি শিলারূপী লীলাময় । কি তাঁর রূপ ! চারপাশে কত হাতি-ঘোড়ার স্তূপ !

কানাইশর জীউর কথায় দশরথ ভক্তার চোখমুখও ভয়ে-ভক্তিতে বিগলিত হয়ে উঠেছে । কেমন বোকা বোকা লাগছে ওকে । ভাবোদ্রেক হয়েছে প্রায় সবারই মধ্যে ।

পালাগানের প্রসঙ্গ থেকে সহসা কানাইশর জীউর প্রসঙ্গে চলে যায় গজাশিমুলের মানুষ । বাবা কানাইশরকে নিয়ে কত গাথা-গল্প, কিংবদন্তি ।

দেবতার মূর্তির তলায় বিষধর সাপ,
নিজস্ব অরণ্যে থাকে আগুন-বরণ এক বাঘ ?

কাস্তো মল্লিক বলে, 'তুয়ারা তো জানিস নাই, বাবা কানাইশর জীউর মহিমা । তুয়ারা আইজকার ছেইলা ।'

আষাঢ়ের তৃতীয় শনিবার, বছরের এই একটা দিন, খুব জমজমাট করে কানাইশর জীউর পুজো হয় । যে যার মানত শোধ করে । অসংখ্য শবর, খেড়িয়া, লোধা, বসু-শবর বহু দিগ্‌দারী সয়ে হাজির হয় কানাইশর জীউর থানে । বহু মানুষের মনস্কামনা পূরণ করেছেন তিনি । তাঁর অশেষ মহিমা ।

পাহাড়ের গুহায়, জঙ্গলে তাঁর অসংখ্য বাহন ঘুরে বেড়ায় । বাবার ভক্তদের তারা কিছু বলে না । কেবল পাপীদের ঘাড় মট্‌কে রক্ত খায় । বাবাও ভারি রসিক । ভক্তকে ভয় দেখানোর জন্য মাঝে মাঝে আচমকা জনহীন জঙ্গলে হাজির হন 'আগুনবরণ'-এর বেশে । তাঁকে ঐ বেশে দেখে পাপীরা দৌড় মারে এবং মরে । কেবল ভক্তরা গদগদ হয়ে লুটিয়ে পড়ে পায়ের তলায় । বেঁচে যায় ।

কাস্তো মল্লিক সেই আকাট যৌবনে, একবার বাবা 'আগুন বরণের' সামনে পড়েছিল । সারাজীবনব্যাপী অসংখ্য মানুষকে শুনিয়েছে সেই অভিজ্ঞতার কথা । কেঁদুয়া লয় । তিনি এক্কেরে জাত ব্যাঘ্র । জ্বলন্ত অগ্নির মত তাঁর বর্ণ । অবিশ্বাস্য বিশাল তাঁর অবয়ব । আগুনের পুচ্ছের মত রাজকীয় লাঙ্গুল ভূমিতে লুটোয় । তাঁর সুমুখে বেশিক্ষণ খাড়া থাকা যায় না । তাঁর চোখের পানে পলের অধিক তাকানো যায় না । তাঁর সুমুখে নিজেকে পোকামাকড় লাগে । ভক্তের জীবন কদাপি নেন না তিনি । শুধু ভক্তকে পরীক্ষা করেন ।

কাস্তো মল্লিক তাঁকে দেখেছিল প্রায় ষাট বছর আগে । সেই প্রথম । সেই শেষ । ষাট বচ্ছর আগে বটে, কিন্তু আজও তার মনে সেই অলৌকিক ছবিখানি সমানে উজ্জ্বল । মনে হয়, যেন এই কালকের ঘটনা ।

ঠিক হল, সামনের গুরুবারই যাওয়া হবে কানাইশরের থানে । গুরুবার ঝুঁঝকা পহরে রওনা । শুক্কুরবার গোটা দিন পথ চলা । শনিবার বিকেল নাগাদ পৌঁছে যাবে মোকামে । 'কে কে যাবেক দলে ?'

হৈ হৈ করে ওঠে ছেইলা-ছগরার দল । সব্বাই যেতে চায় । বাচ্চাদের উৎসাহ আরও বেশি ।

'আরে থাম্ রে ।' ধমক দেয় দশরথ ভক্তা, 'অতো লাচিস নাই । সিখ্যানে যাবা অত সোজা লয় । গায়ের রক্ত জল হইয়েঁ যাবেক । ভাবছিস, খোব মজা ?'

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর দল ঠিক হয় । মোট একুশ জনের দল । নবীন-প্রবীণ দুই আছে দলে । প্রবীণদের মধ্যে দশরথ ভক্তা, ঝাড়েশ্বর কোটাল, আরো জনাকয় । ছগ্‌রাদের মধ্যে রইল সুচাঁদ, কান্‌চা, মাদল আর বদন কোটাল ।

'মেয়েরা যাক দু'একজন ।' বলতে বলতে রাজীব আড়চোখ তাকায় কৌশল্যা আর সরেস্বতীর দিকে, 'আনন্দের দিনে ওরাই বা বাদ পড়ে কেন ?'

সে কথায় লম্বা করে জিভ কাটে কাস্তো মল্লিক । ইহ্ ! অমন পাপ কথা কোউ কয় ? জিভে পোক পইড়্‌বেক যে !

'কেন ? যাক্ না ওরা । ক্ষতিটা কি ?'

রাজীবের কথায় গুম মেরে যায় কাস্তো মল্লিক । মুখ দিয়ে বাক্যি সরে না তার ।

দশরথ ভক্তাই কথাটা ভাঙে । বলে, 'কানাইশর জীউর থানে মেয়েদের যাবা লিষিদ্ধ । যে যাবেক্, উয়ার বছর ঘুরবেক নাই । ওলাউঠায় মরবেক্, লচেৎ মরবেক আগুন-বরণের হাতে । উয়্যাদের সাথ কানাইশর জীউর ভেট হবেক অন্য দিনে, অন্য তিথিতে, অন্য এক থানে ।' কথাটা কিছুতেই ভেঙে বলে না দশরথ ভক্তা । রাজীব লক্ষ্য করে, এই প্রসঙ্গে সকলেই কেমন অস্বস্তি বোধ করছে । কথা বাড়ায় না সে । যাত্রার প্রস্তুতিপর্ব নিয়ে আলোচনা শুরু করে ।

ছেলে-ছোকরাদের অনেকেই এই প্রথম যাবে ঠাকুরের থানে । দশরথ ভক্তা তাদের শুনিয়ে বলে, 'চল্ । কানাইশরের মহিমা লিজের চোখে দেইখ্যে আসবি । ঠাকুরের মূর্তির তলায় বাস করে এক বিশালকায় সাপ । ঠাকুরের দেহ্লি (পূজারী) বিভূতি শবর কত বার দেখ্যেছে উয়াকে মোহগ্রস্ত অবস্থায় । শিলার তলায় উয়ার বসবাস । ঠাকুরের হুকুমে সে লড়ে চড়ে । শিলাটাকেও লড়াই দেয় ।' প্রায় লোভ দেখানোর ভঙ্গিতে দশরথ ভক্তা বলে, 'চল্ । কপালে থাকলে দেখতে পাবি উই দৃশ্য ।'

জল্পনায় কল্পনায় রাত বেড়ে যায় । এক সময় জমায়েত ভাঙে । যাবার বেলায় কাস্তো মল্লিক ফিস্‌ফিসিয়ে দশরথ ভক্তাকে বলে, 'বিভূতিকে একটিবার বইলবি তো রে, দশরথ । বাবা কানাইশরের সুমুখে যেন একটিবার খড়ি পেত্যে জেন্যে নেয়, আর কত্তো দিন এ পাপ শরীল বইতে হব্যেক্ । আর কত্তো দিন ?'

বলতে বলতে ম্লান হয়ে আসে কাস্তো মল্লিকের মুখ । ন্যুব্জ হয়ে আসে শরীর । চোখের কোণা চিকচিকিয়ে ওঠে ।

৫. রাজীব-মিস বার্ড ও একটি নাম-নেই-ঝরনার গল্প

'এইভাবে শুরু হল 'গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘের কাজকর্ম ।' রাজীব বলতে থাকে, 'খুব জলদি ছড়িয়ে পড়ল নাম । প্রাচীনের গন্ধ, আজও ভারি রোমাঞ্চকর । চারদিক থেকে নিমন্ত্রণ আসতে লাগল । 'জাতীয় সংস্কৃতি মেলায়' ডাক পেয়ে দিল্লী গেলাম । সেখানে আমাদের 'শিকার-নাচ' প্রথম হল । সে তো তুমি জানোই । তারপর আর গজাশিমুল সংস্কৃতি-সংঘকে পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি ।'

ক্যাথি বার্ড নিবিষ্ট মনে শুনছিল । বলে, 'কি দারুণ ইনটারেস্টিং ।'

ঘন জঙ্গল । মাঝখান দিয়ে শুঁড়ি পথ । ঢেউ খেলানো ভূঁই, উঁচু উঁচু ডুংরী, কখনও কাছে, কখনোও দূরে । মাঝে মাঝে আঁকা বাঁকা ঝোরা । জল বয়ে যাচ্ছে তিরতিরিয়ে, কখনও বা বিশাল উপল-খণ্ডের ওপর এক লাফে নেমেছে । ক্যাথি বার্ড বসেছিল একটা প্রকাণ্ড গোলাকার পাথরের ওপর । পা' দুখানি ডুবিয়ে দিয়েছিল ঝরনার জলে । জঙ্গলের ভেজা মাটিতে সোঁদা সোঁদা গন্ধ । কচিপাতায় ভরে গেছে চার পাশের সমস্ত গাছ । অচেনা লতার দল গাছ বেয়ে উঠেছে, পেঁচিয়ে ধরেছে গুঁড়ি ।

ক্যাথি বার্ড বলে, 'ইস, তোমরা কি ভাগ্যবান ! এমন আদিম জঙ্গল তোমাদের দখলে ।

জানো, আমাদের দেশে এমন জঙ্গল একটাও নেই ।'

'সে কি !' রাজীব অবাক হয়, 'আমেরিকায় জঙ্গল নেই বলতে চাও ?'

'থাকবে না কেন ? কিন্তু সে এমন নয় । আমাদের তাবৎ জঙ্গলে সভ্যতা ঢুকে পড়েছে বেলবট্‌স্ আর জীন্‌স্ পরে । এমন সোঁদা গন্ধ সেখানে পাবে না তুমি । এই ঝরনাটির নাম কি ?'

রাজীব হাসে । বলে, 'এই জঙ্গলে অমন অনেক ঝরনা আছে । নাম জানিনে । এদের কোনও নাম আছে বলেও শুনি নি ।'

'সে কি !' মিস বার্ড সোজা হয়ে বসে, 'অমন সুন্দর ঝরনার কোনও নাম নেই ?'

'এতে ঝরনার কোনও ক্ষতি হয় না ।'

'কিন্তু আমাদের ভয়ানক ক্ষতি হয় । আমরা তাকে সুন্দর নামে ডাকতে পারি নে ।' বলতে বলতে মুখখানা চকচকে হয়ে ওঠে ক্যাথি বার্ড-এর । বলে, 'এসো, দু'জনে মিলে এই ঝরনাটার একটা সুন্দর দেখে নাম দিই ।'

রাজীব এক দৃষ্টিতে দেখছিল ক্যাথিকে । পরনে জীন্‌সের চাপা প্যান্ট । গায়ে মোটা স্ট্রাইপের বুশ সার্ট । চোখে ঢাউস চশমা । সোনালী চুলের রাশ ঢেকে দিয়েছে অর্ধেকখানা পিঠ । মুখের ওপর কমলা রঙের রোদ্দুর পড়েছে বাঁ-দিক থেকে । সামনের দিকে কিঞ্চিৎ ঝুঁকে থাকবার দরুণ তার পীনোন্নত স্তন দুটি সামান্য নম্র । দু'চোখে রহস্যময় দৃষ্টি । ঠোঁট দুটি আশ্চর্য রকমের ভিজে । সোনালী চুল উড়ছিল হাওয়ায় । অকপটে ঝাপটা মারছিল রাজীবের গায়ে । রাজীব অস্বস্তি বোধ করে ।

ক্যাথি বার্ড আকুল হয়ে উঠেছে । ঝরনাটার একটা জুতসই নাম আঁতিপাতি খুঁজছে স্মৃতির ভাঁড়ারে ।

রাজীব ফের হাসে । বলে, 'তুমি যে দেশের মেয়ে, সে দেশে ঝরনার অবশ্যই একটা নাম থাকা চাই । কোন কিছুকে এক্কেবারে কংক্রিটাইজ না করলে তোমাদের শান্তি হয় না । সেই কারণে, কোনও জায়গায় পা দেবার অনেক আগেই তোমরা তার একটা নামকরণ করে ফেল । এমন কি আকাশের চাঁদও তোমাদের হাত থেকে রেহাই পায় নি ।' রাজীব একটুখানি থামে । তারপর মৃদুগলায় বলে, 'আসলে, এও তোমাদের জয় করবার কিংবা দখল নেবার এক পদ্ধতি বৈ কিছু নয় ।'

ক্যাথি বার্ড মনোযোগ দিয়ে শুনছিল রাজীবের কথা । চোখে মুখে রাগ জমছিল বুঝি । বেয়াদব সোনালী চুলগুলোকে শাসন করতে করতে বলে, 'আমাদের দেশটাকে তোমরা অত নিচু নজরে দ্যাখ কেন বল তো ?'

সে কথার জবাব দেয় না রাজীব । নরম গলায় বলে, 'ওঠ । চল । গজাশিমুল এখন অনেকখানি পথ ।'

অনিচ্ছা সহকারে উঠে দাঁড়ায় ক্যাথি বার্ড ।

বলে 'নামটা দেব না বলছ ?'

'থাকনা ।' রাজীব গাঢ় স্বরে বলে, 'বিনা নামে ডাকবার মত অন্তত গুটি কয়েক জিনিস থাক না এ দুনিয়ায় ।'

দুজনে ফের হাঁটতে শুরু করে ।

**পলিটিক্‌স-এর কিছু বুঝিনে, শুধু কালচার নিয়েই পড়ে আছি ;
হিরোশিমাটা কোথায় বলো তো ?**

এবড়ো-খেবড়ো সঙ্কীর্ণ পথ, ঘন ঘন চড়াই-উৎরাই, দু'ধারে বিশাল বিশাল পাথরের চাঙড় । পথের ওপর পাথরের ঢেলা ইতস্তত ছড়ান । একটুখানি অনমনস্ক হলেই হোঁচট খেতে হবে । ক্যাথি ঐ পাথর ছড়ান এবড়ো-খেবড়ো পথে কাঠবেড়ালীর মত লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছিল । চড়াই পথ বেয়ে যখন উঠছিল, তখন ওকে সুপুষ্ট লতার মত লাগছিল । উত্‌রাই পথে ঝরনার মত । পিঠের ওপর ঘন ঘন উথাল পাথাল হচ্ছিল ওর সোনালী চুলের রাশ । রাজীবের দৃষ্টি বার বার তুলির মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল ক্যাথির সর্বাঙ্গে ।

ভারি অবাক লাগে রাজীবের । কত উচ্ছল এই বিদেশিনী, কত স্বচ্ছন্দ ! কোন্ দূর দেশ থেকে এসেছে, এই দুরন্ত রূপ নিয়ে । একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে । চষে বেড়াচ্ছে মাঠ-ঘাট, পাহাড়-জঙ্গল, ভয়-ডর নেই, শ্রান্তি-ক্লান্তি নেই । কোত্থেকে পায় এত জীবনী-শক্তি, এত সাহস, তেজ, সরলতা ! মনে হয়, সংসারের কোনও মালিন্য বুঝি কোনও দিন ছোঁয় নি ওর মুখ । রাজীব সহসা অন্য জগতে চলে যায়, একেবারে হিরোশিমার কাছাকাছি, যেখানে প্রচণ্ডতম বিস্ফোরণে, বিষ-উত্তাপে জ্বলে গেছে ফসলসহ মাঠ, শুকিয়ে গেছে নদী, মানুষের শরীর থেকে খসে পড়ছে ত্বক, মাংস, মেদ, মজ্জা, আকাশ ঝরাচ্ছে বিষাক্ত কালো জল, আর হাওয়া যেন লক্ষ নাগিনীর নিঃশ্বাস ... । ভাবতে ভাবতে তার দৃষ্টিখানি স্থাপিত হয় ক্যাথি বার্ড-এর মুখে ।

আচম্বিতে মুখ ফেরায় ক্যাথি । নীল নয়নে দেখতে থাকে রাজীবকে । রাজীব স্তম্ভিত হয়ে যায়, এই জনহীন উদ্দাম প্রকৃতির মাঝখানে ওকে লাগছে এক অলৌকিক দেবীর মত ।

সাদা দাঁত ঝিকিয়ে ওঠে, ক্যাথি বলে, 'কী দেখছ, প্রফেসর ? অমন ড্যাবড্যাব করে গিলছ কেন আমায় ?'

রাজীব কোন ক্রমে নিজেকে সামলে নেয় । তদ্‌গত স্বরে বলে, 'দেখছি নে, গিলছিও নে, ভাবছি ।'

'কি ভাবছ ?' খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ক্যাথি । কনুই দিয়ে আলতো খোঁচা মারে রাজীবের পেটে ।

রাজীব সহসা কেমন উদাস হয়ে যায় । বলে, 'ভাবছি, তোমরা শেষ অবধি পারলে ?'

'কি ?' ভুরু কুঁচকে তাকায় ক্যাথি ।

'অগণিত তরতাজা মানুষের ওপর অবলীলাক্রমে ও দুটো ফেলে দিতে পারলে তোমরা ? হাতখানা একবারের তরেও কাঁপলো না ?'

ক্যাথি বার্ড-এর চোখমুখ যেন নিভে এল সহসা । ওর সঙ্গে আলাপ হবার পর রাজীব এই নিয়ে তিন বার হিরোশিমার প্রশ্ন তুলেছে ।

মৃদু গলায় বলল ক্যাথি বার্ড, 'সব সময় ঐ এক কথা শুধোও কেন, প্রফেসর ?'

'সব সময় তো শুধোই নে ।' রাজীবের গলা ভারি হয়ে আসে, 'যখনি তোমার চোখে মুখে দেখি সেই স্বর্গীয় হাসি, তখনি আমার মনে হয়, এমন পবিত্র হাসি যারা হাসে, তারা এমন পশুর মত আচরণ করে কী করে ?'

'পশু' শব্দটা বুঝি ক্যাথি বার্ডকে বিদ্ধ করে । গলায় অল্প ঝাঁঝ এনে বলে, 'আমি পলিটিকস করিনে প্রফেসর, পলিটিকসের কিছুই বুঝিনে । আমি শুধু কালচার নিয়ে পড়ে আছি ।'

'পলিটিকস আমিও করিনে ।' রাজীব অল্প উত্তেজিত হয়, 'কিন্তু তুমি জান না, হিরোশিমা-নাগাসাকির সে ঘা' এখনও শুকোয় নি । তোমাদের কয়েক সেকেণ্ডের বর্বরতা তাদের পুরুষানুক্রমে মারছে । এখনও তাদের মেয়েরা শয়ে শয়ে বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে । নয়তো জন্ম দিচ্ছে বিকৃত বিকলাঙ্গ শিশুর । ওরা দলে দলে মানসিক ভারসাম্য হারাচ্ছে, আত্মহত্যা করছে, এবং এ অভিশাপ যে তাদের কত দিন, কত যুগ, বয়ে বেড়াতে হবে, তাও তারা জানে না ।'

ক্যাথি বার্ড জবাব দেয় না । তার বদলে একটা ভারি দীর্ঘশ্বাস ফেলে । রাজীবও যেন সহসা বোবা হয়ে যায় । দুর্গম পথ ভেঙে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে দুজনে ।

রঙলালের বাৎসল্যরস

বেসাম-বেলায় রঙলাল এল দশরথ ভক্তার দুয়ারে । হাঁক পাড়ে উঠোন থেকে, 'সুচাঁদ ? সুচাঁদ বেটা কাঁহা রে ?' বলতে বলতে ওর চোখাচোখি হয় দশরথের সঙ্গে ।

দশরথ ভক্তার ফোকলা মুখে হাসি । বলে, 'উ ত' আইজ্ঞা নাই ঘরে ।'

রঙলাল ব্যাজার মুখে এগিয়ে আসে, দশরথ ভক্তার পাশটিতে বসে । শুধোয়, 'কাঁহা ? কতদূর ?'

'বহুত ধুর আইজ্ঞা !' দশরথ জবাব দেয়, 'বানারস ।'

'আরে ব্বাস্ !' রঙলালের লাল লাল চোখ কাপালে উঠে যায়, 'বাংলা মুলুকসে দল কাশীধাম গেছে লাচ দিখাতে ?'

'কাশী লয় আইজ্ঞা ।' দশরথ ভক্তা বিজ্ঞের মত শুধরে দেয় রঙলালের ভুল, 'বানারস ।'

'উই কাশীরই দুশরা নাম ব্যানারস ।' মেজাজ খিঁচড়ে গেছে রঙলালের । খুব কাঠ কাঠ গলায় তাই কথাগুলো বলে সে ।

শুনেই নিমেষে চুপসে যায় দশরথ ভক্তা । হায় বাপ ! অমন কথা কে জানত ? মাস্টারও তো বলে নাই ! সুচাঁদও লয় । চ্যাংড়া-চেংড়িগুলান কাশী গেল, সে কিনা বুঝতেই পারল নাই ! বুঝলে কি অমন সুযোগখানা হাত-ছাড়া করত ? দলের সঙ্গে গিয়ে নির্ঘাৎ কাশী-দর্শনটা সেরে আসত সে । ইস্ বড় মওকা গেল হে ।

দশরথের বউ ঘটিতে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে যায় । আড়চোখে ঘটিটা দেখে নিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় রঙলাল । ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে । তারপর কাঁধের থলিয়া থেকে বের করে এক বস্তু ।

দশরথ ভক্তা ঘোলাটে চোখে নিরিখ করতে থাকে বস্তুটা ।

রঙলাল স্নেহের হাসি হাসে । বলে, 'সুচাঁদ বেটার তরে একটা জামার কাপড় লিয়ে এলাম । আব্ বড়া হয়েছে । কেতনা জা'গামে যাচ্ছে । সেদিন দেখলাম, একটা টুটা-ফাটা শার্ট পরে বাঁকুড়া গেল । দেখে বড় দুখ্ লাগল দিল্‌মে । তার এখন কত নাম ।

কত লোকের সাথ্ জান-পহ্চান ! তাকে কি টুটা-ফাটা কাপড়-কামিজ মানায় ?'

দশরথ ভক্তার দিকে শার্টের ছিটখানা এগিয়ে দেয় রঙলাল ।

দশরথ ভক্তা তার ঘোলাটে চোখ জোড়ার সুমুখে মেলে ধরে ছিটখানি । খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে । কালো-সাদা চেক্-চেক্ ছিট । কত দাম কে জানে ! দশরথের চোখে তো বেশ দামিই লাগে । ওদের জাতে কে আর কবে পরেছে অমন চেক-চেক ছিটের জামা !

ছিটখানা উল্টে পাল্টে দেখে, এক সময় তা রঙলালকে ফেরত দেয় দশরথ ভক্তা । বলে, 'মোকে লয় । উ আইজ্ঞা ফিরে এইলে, উয়াকে লিজের হাতে দিও ।'

রঙলাল মুহূর্তকাল কী যেন ভাবে । বলে, 'ঠিক হ্যায় । উহি আচ্ছা হোবে ।' ছিটখানা থলির মধ্যে ফের চালান করে দেয় রঙলাল । ঘটিখানা তুলে নেয় হাতে । উঠোনের একপাশে গিয়ে পরিপাটি করে মুখ হাত ধোয় । দশরথের বউ ততক্ষণে নাবিয়ে দিয়েছে ভাজা মুড়ি আর তালের পাটালি ।

মুড়ির সঙ্গে পাটালি দেখে অল্প চমক খায় রঙলাল । এদের বাড়িতে এর মধ্যেই পাটালি ঢুকে পড়েছে ?

বারান্দার একপাশে শন-দড়ির এক নতুন দোলনা খাটান । উঠোনের এককোণে একটা লকলকে চালতা চারা । তার চারপাশে পরিপাটি বেড়া । হাঁটু সমান গভীর যে নালাটি উত্তর দিকে বয়ে গিয়ে ছোট খরসতিয়ার সঙ্গে মিশেছে, তাতে মোটা মোটা কাঠ দিয়ে পুল বানিয়ে পাবাপাবের ব্যবস্থা । ফি'বছর বর্ষাকালে রোজ রাত্রে দু'একজন পড়ত ঐ নালায় ।

চারপাশে চোখ চারিয়ে কেমন যেন এক সুখের মৃদু সৌরভ পায় রঙলাল । ইদানিং অল্প স্বল্প শ্রী-ছাঁদ দেখতে পাচ্ছে এদের ঘর-দোরে । বুকের মধ্যে চিন চিন করে ওঠে অচেনা ব্যথা । গলায় কুটকুটে ওলের স্বাদ । দাঁতের ফাঁকে আটকে যায় শুকনো মুড়ি ।

'এসব গাছ-গাছাল কে লাগাল হে ?' রঙলাল যেন মজা করবার ভঙ্গিতে বলে ওঠে, 'এই পুল বানাল কে ?'

'কে ফের ? উই মাস্টার ।' দশরথ ভক্তার গলা থেকে যেন উথলে ওঠে স্নেহ, 'পাড়ার সব ছগ্রাকে জটো কইর‍্যে জঙ্গলের শালবোল্লা কেইট্যে, সবাই মিলে বানালেক এ পোল । তা বাদে, ঘরে ঘরে গাছ লাগাতে হবেক, ফল-ফুলারি, আনাজ-খন্দের গাছ । মাস্টারের হুকুম ।'

বলতে বলতে হিঁ-হিঁ করে হাসতে থাকে দশরথ ভক্তা ।

মনটা ধীরে ধীরে তেতো হয়ে যায় রঙলালের । দু'চোখ গুটিয়ে নেয় চারপাশ থেকে । আর দেখতে চায় না চারপাশের সুখকর দৃশ্যাবলী । শুনতে চায় না 'মাস্টার' নামক হাড়বজ্জাত লোকটির সুখ্যাতি ।

আপাতত সব দিক থেকে গুটিয়ে এনে মুড়ির বাটিতে নিবদ্ধ করে মন ।

রঙলালের দাঁতের ফাঁকে বেইমান সুপুরির টুকরো

দশরথ ভক্তার দুয়োরে বসে দেশ কালের হরেক গল্প জুড়েছে রঙলাল । ফের্ নাকি যুদ্ধ বাধবে । জিনিসের দাম নাকি আরও বাড়বে । সে তো বাড়বেই । মানুষ বাড়ছে লাখে লাখে । কিন্তু তাদের জন্য অত কাজ কর্ম কই ? অধর্মও বাড়ছে দেশে, তাই নিয়েও রঙলালের দুশ্চিন্তা । মানুষ ক্রমশ পাপী হয়ে উঠছে । সাচ বাত বলে না, সিধা পথে চলে না, বিশোয়াসের

দাম রাখে না একতিল। কলি পরবেশ করেছে সবার অন্তরে। ফলও পাচ্ছে হাতে নাতে। এইতো, দিনকয় আগে কোথায় যেন বাঁধ ভেঙে হাজার মানুষ জলের তলায়। লাখ মানুষ মকান হারিয়ে আসমানের তলায় দিন গুজরান করছে। সবাই বলছে, ঠিকাদার নাকি দুবলা কাম করে নাফা করেছে। সিরমেন্টের বদলে নাকি মিট্টি দিয়েছে। দেখোতো কেমন আজব বাত! শয়ে শয়ে বাঁধ হ্যায় দেশমে, কোনটাই ভাঙলো না টুটলো না, কেবল ঐ বাঁধটাতেই ঠিকাদার দুবলা কাম করেছে?

সে তো বটেই। না বিশ্বাস করে উপায় নেই দশরথ ভক্তার। অ্যাতো অ্যাতো বাঁধ থাকতে উট্যাই বা কেন ...।

এসব দিন দিন আরও বাড়বে, রঙলালের সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বন্যা-মহামারী-দুর্ভিক্ষ-খাটারশাল, এসব হররোজের কহানী হয়ে উঠবে। এ'তো হতেই হবে। তুমি দু'চোখে ঠুলি পরে থাকলে কি হবে? ওপরে একজন নেই? তিনি সব দেখছেন না? তাঁর পাশে তো কিছুই ছুপানো যায় না! তাঁর বিচার বড় কড়া!

দশরথ ভক্তা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যায় সব কথার। সাবেক কালের মানুষ সে। সবকিছুর ওপরে ধর্মভয়টা তার স্বভাবতই প্রবল। দশরথ ভক্তা বসে বসে ভাবে। সত্যযুগের ছবিখানি মনে মনে আঁকে। সে যুগে মানুষ কত সুখে ছিল! বনে বনে ফল ছিল, ক্ষেতে-মাঠে অঢেল ফসল। মানুষের মনে করুণা ছিল, দিবদ্বিজে ভক্তি ছিল। সে যুগে সবকিছুই ছিল খাঁটি। মানুষও ছিল নিখাদ সোনা। সে যুগ গেছে, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর, এখন কলি। কলির সইন্ঝা। ক্রমশ রাত গভীর হবেক, আঁধার বাড়বেক। আগামী দিনগুলোর কথা ভাবতে গেলেই এক অনাগত আশঙ্কায় বুক কাঁপে দশরথের। হায় বাপ! শেষ তক্কো বাঁইচব্যেক্ তো মানুষ? মানবকুল থাইকবেক্ তো এই ভূ-ভারতে?

একসময় রঙলাল আসল কথাটা পাড়ে। বলে, 'মুরুব্বি মানুষ তুমি। একটা কথা ক'দিন ধরে বলবো বলবো সোচ্‌ছি। গাঁর লেড়কা-লেড়কিদের কি জাহান্নামে ভেজতে চাও তোমরা?'

'ক্যানে আইজ্ঞা?' দশরথ ভক্তা অল্প চমক খায়।

'সে ভি তোমাকে সমঝাতে হোবে?' রঙলাল যেন অবাক হয়, 'আরে মুনিষ-মাইন্দারের বেটা-বেটি, কাম ছোড়্‌কে লাচতে চললো ভিন দেশে! উস্‌মে দুখ্ যাবে? খানা মিলবে?'

দশরথ ভক্তা ভাবে। কথাটাতো মিছা লয়। এক-আধ রাত্তির গেল, ফুর্তি-ফার্তা করল, মেডেলপাতি গলায় ঝোলাল, ঠিক আছে। কিন্তু হররোজ অমন হিলি-ডিল্লি করে বেড়ালে ঘর-গিরস্থালী দেখবেক্ কে? দিনভর খাটালি করে কোমরের বাঁধন টুটে যায়, তবুও পেট পুরে না, দুখ যায় না, মোদের ঘরের ছেইলা-মেইয়ার কি অত লাচ-গান, বিলাসিতা, সাজে?

রঙলালের দু'চোখ কপালে উঠে যায়।

বলে, 'স্রেফ লেড়কারা গেলে তবু কথা ছিল। সাঙমে গেল কিনা একপাল ডবকা লেড়কি! আজীব বাত! একটা ভিনদেশী জোয়ানের হাতে ঘরের আউরৎদের এমন ছেড়ে দেয় কেউ?'

তাও তো বটে! আট-দশটা ছগরী-মেয়া গেছে দলের সঙ্গে। রত্তী, পার্বতী, সরেস্বতী

আর কৌশল্যা তো ছিলই। ইদানিং যাচ্ছে কিংকর কোটালের ঝি বৃন্দা। বাণেশ্বর মল্লিকের ঝি সুহাগী। লস্কর ভক্তার ভাইঝি মালতী। আরো যেন কে কে গেল।

'বাসে-রেলে সবার সাথে উঠছে, বসছে। রাতে যে কিস্‌কা পাশ শুচ্ছে, রামজীকো মালুম। আজকাল মকানের মধ্যে পুরে রেখেও সামলানো যায় না জোয়ান লেড়কা-লেড়কীদের। তুমি বুড়া আদমি হয়েও এসবে বাধা দিচ্ছ না ? ঘরের লেড়কীদের বাহারমে পাঠিয়ে দিলে চরতে ? তাজ্জব কি বাত !' সহসা গলাটা অস্বাভাবিক খাটো করে রঙলাল। দশরথ ভক্তার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, 'দেখবে, সবকোই লেড়কি ইয়া বড় পেট লেকর ঘর লৌটেগা।'

বটে, বটে ! কথা তো ঠিক ! আজকালের ছেইলা-ছগরাদের মতিগতি বোঝা দায়। কখন যে কি অঘটন ঘটায় ! রঙলাল তো মিছা বলে নাই। আগুন আর ঘি পাশাপাশি রাখলে জ্বলবেই।

সলতেখানা উসকে দেয় রঙলাল, 'সাথ্‌মে ফিন্ ঐ চালু মাস্টার। লেড়কা-লেড়কিকে পঢ়া-লিখা শিখাতে এলো কালেজে নোকরি লিয়ে। শেষে হলো কিনা লাচপার্টির ম্যানেজার। বড় খতর্‌নক্ আদমি উ শালা ! এক্কেবারে সত্যনাশটি না করে দেয় তোমাদের।'

দশরথ ভক্তার বুকের মধ্যে ভয় ঢোকে। মনের গহীনে একটা অবিশ্বাস আর সন্দেহ তো ছিলই, সেটা পাকাপোক্ত হয়ে বাসা বাঁধতে থাকে মনে। পড়ালিখা ভদ্দর আদমিরা এমনিতে বড় বজ্জাত হয়। দশরথরা কি সাধে ওদের 'কাঁকড়া' বলে ডাকে ! উয়ারা সর্বদাই কথায় এক, কামে দুসরা। ব্রিটিশ সরকার ভালোই ছিল। রাতে-ভিতে খাঁকি পইরে আসত, জুয়ান দেখে বাঁধত, হাজতে পুরে মারত, মারবার পর খেতে দিত, ফাটকের মেয়াদ ফুরালে পাছায় এক লাথি কষিয়ে সোজা দেখিয়ে দিতো গজাশিমুলের পথ। এখন ব্রিটিশ সরকার নাই। এখন লেতারা আছেন সে জায়গায়। উঁয়ারা সব মারেন না, ধরেন না। গায়ে গা' মিশিয়ে কথা কন। মিঠা মিঠা হাসেন। আর কোমরে ক্যারেকুটু দিতে দিতে সাফ করে দেন ট্যাঁক। উঁয়ারা দিনের বেলায় জঙ্গল বাঁচানর মিটিন্ করেন। রাতের বেলায় চুপিসাড়ে পাঠিয়ে দেন সারবন্দী টেরাক। 'কাঁকড়া'দের মতিগতি ঠাহর করা মুস্কিল।

সত্যি। মেয়াগুলানের জন্য ভারি ভাবনা হচ্ছে দশরথ ভক্তার। একদল সোমত্ত ছগরা-ছগরী একসাথে বাসে-রেলে ঠেসাঠেসি, উঠছে-বসছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, শুচ্ছে, লিদাচ্ছে। সাথে একজন 'কাঁকড়া'। সেও জুয়ান, দেখতে সুন্দর। নাহ্, এ ভারি ভাবনার কথা ! এবার দল ফিরলেই ষোলআনার মিটিন্ বসাতে হবেক। এ লাচগানের দল না বন্ধ করলে একদিন অধঃপাতে যাবেক্ সব।

'ক্যায়সে বন্দ করবে হে বুঢ়া ? তোমার বাত্ উ লেড়কা-লেড়কি শুনবে ? জানো তো, হাতির দাঁত একবার নিকলাতে দিলে ফিন্ অন্দরে ঘুসানো ভারি শক্ত। এরপর তোমাদের আর মানবেই না ওরা।'

'মানবেক্, মানবেক্।' মনে মনে অস্থির হলেও বাইরে জাঁক দেখায় দশরথ ভক্তা, 'মোদ্যার গাঁ-র ছেইলা, মোদ্যার কথা শুনবেক নাই ?'

'কোশিশ কর্‌কে দেখো।' পরম উদাসীনতায় বলতে থাকে রঙলাল। মাথার ওপর ঘটি তুলে ঢকঢক জল খায়। ঘটি নাবিয়ে রাখে মাটিতে। গামছা দিয়ে মুখ মোছে।

খইনির ডিবে বের করে ফতুয়ার পকেট থেকে। মতিহার আর চুন সাজায় বাঁ-হাতের তেলোতে।

খইনির গুঁড়োতে চাপড় মারতে মারতে রঙলাল গজগজ করতে থাকে, 'ফিন্ হামার কি ? হামার রুপেয়া ক'টা মিটিয়ে দিলে হামি সাথে সাথ চলে যাবো এ গাঁ ছেড়ে। উস্কা বাদ, তোমাদের লেড়কা-লেড়কি কী করবে, কিস্কা সাথ রাতে শোবে, সে সব তোমাদের ব্যাপার। তবে কিনা, বহুত বরষ্ এ গাঁয়ে আনাগুনা, উ সব লেড়কা-লেড়কিদের জনম ভি হয় নি তখন। হামার চোখের সামনেই জনম্ লিলো ওরা। বঢ়া হলো। সেই কারণেই প্যারটা জমে আছে দিল্মে।'

এ'তো হক্ কথাই! রঙলাল অলেহ্য কিছো বলে নাই। এসব কথা যে দশরথ ভক্তাও মাঝে মাঝে ভাবে নি, তা নয়। দশরথরা হল সাবেক কালের মানুষ। ছেলে-মেয়েদের অত স্বাধীনতা দেবার পক্ষপাতী ওরা কখনোই নয়। তবে কিনা পুরো ব্যাপারটা ঘটে যাচ্ছে কেমন যেন নেশার মতো। সেই প্রথম বাঁকুড়ায় মেডেল পাওয়ার পর, দল গেল কলকাতায়। সেখানে মেডেল পেল। টাকা পেল। তিনরাত্তির গাইবার সুবাদে দলের সব্বাই পেল লগদ এক কুড়ি করে টাকা। এ-ক কুড়ি টাকা! সে টাকা খচ্চা হতে না হতেই পুরুল্যায় বায়না হল দু'আসর। সেখান থেকে মেদুন্পুর। বচ্ছর ঘুরতে না ঘুরতে খোদ দিল্লীতে ডাক পড়ল। সেখানেও সেরিয়া মেডেলটি পেল গজাশিমুল পার্টি। তারপর থেকে একের পর এক বায়না যেন লেগেই রয়েছে। বায়না মানেই টাকা। সেই টানেই যাচ্ছে সব। ফিরেও আসছে সবাই। এক-এক খেপে কুড়ি-পঁচিশ টাকা নিয়ে ধরে দিচ্ছে মা-বাপের হাতে। দুঃখের সংসারগুলো চলছে তাতে। দু'দিন না যেতেই বায়না পেয়ে চলে যাচ্ছে দুসরা থানে। সুস্থির হয়ে কি আর দু'দশ দিন বসতে পারছে ঘরে ? হৈ-হৈ করে যাচ্ছে, হৈ-হৈ করে ফিরছে, টাকা তুলে দিচ্ছে মা-বাপের হাতে, ফের চলে যাচ্ছে। অভাবী মানুষগুলোও লগদা টাকা হাতে পেয়ে যেন কেমন হয়ে গেছে! ভালো-মন্দ, বিচার বুদ্ধিও ঠিক যেন কাজ করছে না ওদের মগজে। ফলে, দিন দিন গজাশিমুল পার্টির কলেবর বাড়ছে। আগে দলে ছিল জনা পনেরো। এখন পঁচিশের কম নয়। বাজনদার, জোগাড়দার ইত্যাদি মিলে তিরিশের ওপর।

বসে বসে আক্ষেপ করতে থাকে রঙলাল, 'এ খেপে জনাদশেক লেড়কিকে লিয়ে যাবার মতলব ছিল। মগর যাদের লিয়ে যাবার মন ছিল, তারা তো ঐ বজ্জাতটার সাথ উড়ে বেড়াচ্ছে। ডালে তো একটা চিড়িয়াও বসছে না। পার্বতীর বাপটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোন গতিকে পার্বতীকে দলছাড়া করলাম। সে চিড়িয়াও ভাগল দলের সাথ। আগাম এক গাদা টাকা দিলাম ঝাড়েশ্বর কোটালকে রঙীর খাতে। এখন শুনছি, সে শালী নাকি দলের এক নাম্বার চিড়িয়া বনেছে। আব তো শাদি করবার তরে লাচছে। কে এক বেজম্মা এসে নাকি পসন্দ্ করে গেছে ওকে। তুমি কিছু শুনেছো নাকি ?'

দশরথ ভক্তা ধীরে ধীরে মাথা দোলায়। তার চোখে বিস্ময়! বলে, 'শুইনেছিল্যাম্ বটে, লাচনহাটির থিক্যে বরপক্ষ এইস্যে পাকা-দেখা দেইখ্যে গেঁইছে। তা সত্ত্বেও টাকা লিছে ঝাড়েশ্বর কোটাল ?'

'আরে, হামার পাশ রুপেয়া লিবার কি গুনা-গুন্তি আছে উ শালার ? আগের দো লেড়কির

খাতে লিয়েছিল যা, সেটাই আভি তক্ উশুল হয়নি। তার উপর রঙীর নামে লিয়েছে দু'বরষ পহ্‌লে। তা লিক। রুপেয়া দিবার তরে হামি আছি। লিবার তরে তুমরা। রুপেয়া লাও, কুছ্ লোকসান নাই। মগর তুমি রুপেয়া ভি লিবে, ফিন্ বেটিকে শাদি দিয়ে শ্বশুরাল পাঠাবে, এ কি হয় ? তুমি তো বুঢ়া আদমি, এ গাঁওকা সরপঞ্চ, তুমিই বল।'

'তাও ফের হয় ?' দশরথ ভক্তা ঘন ঘন মাথা নাড়ে।

'এ সব বন্দ্ না হলে বহুত খারাপ হয়ে যাবে মুখিয়া,' সহসা ক্ষেপে ওঠে রঙলাল, 'হামার সাথে বত্‌মিজি করলে মামলা রুজু করবো। জেলের ঘানি টানাবো সব শালাদের। ঘরে ঘরে হামার রুপেয়া পড়ে থাকবে, আর সব লেড়কি চলে যাবে লাচদলের সাথে, লয় তো শাদি করে শ্বশুরাল ভাগবে, এ হামি মানবো না। এ হোল হামার আখ্‌রি বাত্।'

দশরথ ভক্তা ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে। রঙলালের কথার জবাব দেয় না। নিদারুণ উভয় সঙ্কটে পড়েছে বেচারি।

বসে বসে সমানে গজ গজ করতে থাকে রঙলাল। এদের সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়! ঘরে দানা পানি জুটে না, ভুখ খিঁচে খিঁচে জুয়ান বয়েসেই বুঢ়ঢা বনে যায় সব। তো, কাম জুটিয়ে দিচ্ছি চা-বাগিচায়। বাসে-রেলে চড়ে লাট-সাহাবকা মাফিক যাবি, মজাসে থাকবি, মাহিনা মিলবে, রেশন মিলবে, কুম্পানীকা কুয়াটার মিলবে, রোগ-জাড়িমে কুম্পানীকা ডগ্‌দর, হাট-বাজার সব হাতের পাশে মজুত। এসব ছেড়ে ছুড়ে সারা গাঁ চললো কি না লাচ দিখাতে! হামার গাঁ হলে, পেড়্‌মে বাঁধকর্ পিটাথা সব কোইকো। উ মাস্টার লোগোকো জেরা জ্যাদা।

প্রবল ক্রোধে হিসহিস করতে থাকে রঙলাল। অনেক্ষণ ধরে দাঁতের ফাঁকে আটকে রয়েছে সুপারির একটা টুকরো। কষ্ট দিচ্ছে বেজায়। খোট্‌না দিয়ে সুপারির কুচিটাকে বের করতে গিয়ে হয়রান হয়ে ওঠে সে।

৬. 'ফোক' নিয়ে 'জোক' নয়

জঙ্গলটা ক্রমশ ঘন হচ্ছে। প্রাচীন বৃক্ষের সমাহার বাড়ছে। ডুংরীগুলোকে এতক্ষণ লাগছিল যেন কালো মেঘের তাল। কিংবা একপাল ধূসর রঙের কুন্‌কো হাতি। ক্রমশ ওরা এগিয়ে আসছে কাছে, সংখ্যায় বাড়ছে, আকারেও। ওদের ধোঁয়াটে গায়ে রক্ত-মাংস লাগছে। গাছ-গাছালি, ঝোপ-ঝাড়গুলো স্পষ্ট দৃশ্যমান হচ্ছে ওদের বুকে।

ভারি নির্জন লাগে। জঙ্গলের কত নিজস্ব ধ্বনি, চেনা-অচেনা, কাছের-দূরের, পাখি-পাখালের ডাক, বনচর প্রাণীদের হাঁটা-চলা, সব ভেসে ভেসে আসে। পরিপূর্ণ নির্জনতাটা যেন অবয়ব পায় ওতে, নিটোল হয়। রয়ে বসে প্রায় তিন ঘণ্টা হাঁটল রাজীব আর ক্যাথি বার্ড। তিনজন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল না ওদের।

'ওরে বাবা!' হাঁটতে হাঁটতে একসময় উচ্চারণ করে ক্যাথি বার্ড, 'এ জঙ্গল কদ্দূরে শেষ হয়েছে ?'

'তোমার ভয় করছে ?'

'ভয়?' রাজীবের দিকে মুখ ফেরায় ক্যাথি বার্ড, 'কিসের ভয়?' কাকে ভয় ?'

'এমন নির্জন জায়গায় ধর আচমকা যদি কেউ অ্যাটাক করে তোমায় ?' রাজীবের মুখের তেলতেলে হাসি মিলোয় না, 'তোমার রূপের খবর তো তুমি রাখ না ।'

ক্যাথি বার্ড তাকায় রাজীবের দিকে । পরম তাচ্ছিল্যে ঠোঁট ওলটায় । বলে, 'কে অ্যাটাক্ করবে ? এখানে কে আর রয়েছে ? ইন্‌ফ্যাক্ট, আই অ্যাম ফিলিং অ্যান্ অ্যাক্যুট অ্যাবসেন্স অব্ ম্যান্ হিয়ার । এক নিদারুণ জনশূন্যতায় ভুগছি ।'

কোথায় যেন গাছের আড়ালে একটা ফাজিল হরবোলা পাখি ডাকছে ।

কথা বলতে বলতে ক্যাথি বার্ড আচমকা ডেকে ওঠে পাখির ডাক নকল করে । তারপর রাজীবের গলা জড়িয়ে ধরে চকাস্ করে চুমু খায় তার ঠোঁটে । রাজীব আকস্মিক বিহ্বলতায় বুঝি হারিয়ে ফেলে নিজেকে । মুখ থেকে একটিও কথা বেরয় না । কি করবে, কিছু বুঝতে পারে না সে । শুধু সারা শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবিরাম বাঁশি বাজতে থাকে । আর, গাছের ডালে হরবোলা পাখিটা ডাকতেই থাকে ।

রাজীবকে ছেড়ে দেয় ক্যাথি । বাঁ-হাত দিয়ে নিজের ঠোঁট মুছতে মুছতে বলে, 'হ্যাঁ, শোন, সামনের মাসের লাস্ট-উইকে ফ্রি আছ তুমি ?'

রাজীব একটু সময় নেয় । ঘাড় ঘুরিয়ে পাখিটাকে দেখে । পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাড়-গলা-মুখ, মুছে নেয় পরিপাটি করে । তারপর ব্যাগ থেকে ডায়েরি বের করে পাতা ওলটাতে থাকে ।

বলে, 'ওরে ব্বাবা ! লাস্ট উইকে আমি অ'ফুলী বিজি । পরপর তিনটে কল-শো ।'

'পরের মাসের ফার্স্ট বা সেকেণ্ড উইকে ?'

'মালদা যাচ্ছি পাঁচ তারিখে । সেখান থেকে শিলিগুড়ি ...

'আই সি-। প্রচুর কল-শো পাচ্ছ তোমরা, তাই না ?'

'প্রচুর না হলেও বেশ ভালোই পাচ্ছি ।'

'ব্যাপারটাকে কি কমার্শিয়াল করতে চাইছ ?'

'ঠিক কমার্শিয়াল নয় । গজাশিমুলের বত্রিশটি পরিবারের নিদারুণ অভাবের কথা তো তোমায় বলেছি । রঙলাল ওদের কি ভাবে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধেছে, তা তুমি জান । কাজেই, কিছু কিছু আর্থিক সুরাহা না হলে ওরা একাজে সময় দিতে পারবে না । তাছাড়া, রঙলালের লালখাতা থেকে ওদের ছাড়িয়ে আনতে হলে কিছু বেশি শো' আমাদের করতে হবেই ।'

'এখন ওরা মাসে কত টাকা শো করে পায় ?'

'কত আর, বড় জোর একশো-সওয়াশো ।'

'ঐ অল্প টাকায় ওদের সংসারে কিইবা সুরাহা হয় । আমার তো মনে হয়, ওটা যে কোনও মধ্যবিত্ত লোকের এক দিনের পকেট-মানির চেয়েও কম ।'

রাজীব ম্লান হাসে । বলে, 'তুমি জান না । ঐ একশো-সওয়াশো' টাকার দাম ওদের কাছে কতখানি । কি আর বলব তোমায়, মাত্র দু'তিনশো টাকা কর্জ নিয়ে ওরা রঙলালের মত আড়কাঠির হাতে সঁপে দেয় আপন রক্তের সন্তানকে, প্রায় সারাজীবনের মত । ঐ কর্জের টাকা পুরুষানুক্রমে ফুলতে থাকে সুদে-আসলে, লাল খাতার মধ্যে । কাজেই ঐ একশো টাকা .. ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ক্যাথি বার্ড । তারপর বলে, 'আমি শুধু একটা কথাই ভাবছি । তুমি তো আর সবদিন এখানে থাকবে না । তখন এদের কি হবে ?'

'সেটা আমি ভেবেছি । এবং সেই মত ব্যবস্থা নিচ্ছি আজ থেকেই ।'

'কি রকম ?'

'ওরা আমাকে ওদের কর্ণধার করতে চায় । পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করতে চায় আমার কাছে । ওরা বলেছিল, উসব কুমেটি গইড়ে কি হব্যেক্ মাস্টার ? আপনি তো আছেন । যেমনটি বলবেন, তেমনটি করব । মোরা যন্ত্র, আপনি যন্ত্রী । আমি বলেছি, না । তোমাদের ভালো-মন্দ তোমাদেরই বুঝতে হবে । ধীরে ধীরে একেবারে স্বয়ংভর হয়ে উঠতে হবে তোমাদের । বাইরের মানুষের ওপর নির্ভর করে লাভ কি ? ওরা আমাকে সংঘের প্রেসিডেন্ট করতে চেয়েছিল । আমি রাজি হইনি তাতেও । হাত জোড় করে বলেছি, আমি কোনও পদ চাইনে । পদের লোভে তোমাদের মধ্যে ঢুকিনি । জঙ্গলের মধ্যে সুগন্ধি ফুলের গাছটি ছিল, সবার অগোচরে । আমি বাইরের থেকে যতদিন সম্ভব সার-জল জোগাব, তত্ত্ব-তালাশ নেব । ফুল ফোটাবে তোমরা । আমি শুধু বাইরে থেকে সাহায্য করে যাব । যত দিন প্রয়োজন, ঠিক তত দিন । তার এক দিনও বেশি নয় ।'

গজাশিমুলের মানুষ অবাক হয়ে শুধিয়েছিল, 'তো, ইয়াতে তুমার লাভটা কি মাস্টার ? তুমি ক্যানে কালিজ কামাই করে পইড়্যো রয়েঁছো মোদ্যের মাঝে ?'

আমি বলি, 'গাছে মিষ্টি আমটি পেকেছে, লোকচক্ষুর আড়ালে । আমি চাই, মিষ্টি আমটি দুনিয়ার তাবত মানুষ খাক । আমার প্রথম লাভ বলতে এটাই । আমার দ্বিতীয় লাভ হল, আমি চাই—রঙলাল ক্রমশ রোগা হয়ে যাক্ । সে আমার পৌরুষে আঘাত দিয়েছে । আর তৃতীয় এবং শেষ কারণ হল, রাজীব মিষ্টি হেসে বলে, 'আমি চাই, তোমাদের মত সরল, অপকট দুঃখী মানুষগুলো একটুখানি সুখের স্বাদ পাক ।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল ক্যাথি বার্ড ।

বলল, 'রঙলাল রোগা হয়েছে ?'

'এখনও হয়নি । তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হবে । খুব শিগ্‌গির হবে ।' উজ্জ্বল চোখে রাজীব বলে, 'এখন গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘের অনেক নাম । চারপাশ থেকে বায়না পাচ্ছি ঘন ঘন । আমাদের রেটও বাড়ছে ক্রমশ । এভাবে বছর পাঁচেক চালাতে পারলে আমরা রঙলালকে অনেকখানি রোগা করে দোব ।'

খুব পরিতৃপ্ত দেখাচ্ছিল ক্যাথি বার্ডকে, একটা মিষ্টি প্রেমের গল্প শুনছে যেন । বলে, 'আমি ড. পোর্টারকে এসব জানাব ।'

'ড. পোর্টার কে ?'

'সে কি ! তোমায় বললাম না সেদিন ? ড. পোর্টার হলেন, আমাদের 'ইস্ট-ওয়েস্ট ফোক ফাউণ্ডেশন'এর ডিরেক্টর !' বলতে বলতে ক্যাথি বার্ড-এর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, 'উহ্, পুরনো জিনিসের প্রতি স্যারের যে কি দুর্বলতা ! বলেন, ওল্ড ইজ ওলওয়েজ গোল্ড ।'

'সেটা শুধু তোমার স্যারেরই নয়,' রাজীব আলতো খোঁচা মারে, 'তোমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারই পুরনোর ওপর এক অমোঘ আকর্ষণ রয়েছে, তোমারও রয়েছে, বল, নেই ?'

হেসে ফেলে ক্যাথি বার্ড। বলে, 'সত্যি বলতে কি, আছে। কিন্তু কেন থাকে বল তো ?'

রাজীব একটুক্ষণ ভাবে। বলে, 'সঠিক্ বলা মুশকিল, তবে, সম্ভবত, তোমাদের নিজস্ব পুরনো কিছু নেই বলেই পুরনোর প্রতি এমন দৃষ্টিকটু হ্যাংলামো।'

ক্যাথি বার্ড সহসা গম্ভীর হয়ে যায়। বলা যায় গুম মেরে যায়। মুখের রেখাগুলোতে তিলমাত্র ভাঙচুর হয় না। একটু পরে খুব ধীর গলায় বলে, 'আমাদের দেশ সম্পর্কে অন্যদের মত তোমারও তাহলে ঐ ধারণা !'

'কি ধারণা ?'

'ধারণা হল এই যে, আমেরিকা একটি সম্পন্ন রিফুজি-ক্যাম্প ছাড়া আর কিছুই নয়। কিছু কাঁচা সম্পদ করে ওরা ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। ওদের কোনও কালচার নেই, বনেদিয়ানা নেই, শেকড় নেই ..., কোন হৃদয় নেই, উদারতা, বদান্যতা কিছুই নেই ... । থাকবার মধ্যে আছে শুধু রাশি রাশি টাকা আর প্রভূত পরিমাণ বজ্জাতি বুদ্ধি।' বলতে বলতে ক্যাথি বার্ড স্পষ্টতই ক্ষুণ্ন, বলে, 'অন্যরা বলছে বলুক, কিন্তু তোমরাও !'

'অন্যরা কারা ?'

'অনেকেই, পৃথিবী জুড়ে বহু দেশ, বহু মানুষ এসব বিশ্বাস করে, রটিয়ে বেড়ায় ... ।'

'তাতে তোমাদের বিন্দুমাত্র দুঃখিত হওয়ার কারণ নেই। আজকের উদ্বাস্তুরাই কালকের শাসক। দেশে দেশে, যুগে যুগে, সেটাই ঘটেছে পৃথিবীতে। অতএব মাভৈঃ।' হালকা চালে কথাগুলো বলতে বলতে এক সময় রাজীব দেখে, ক্যাথির চোখ-মুখ ঈষৎ লাল হয়েছে। কথাগুলো শুনতে শুনতে ঈষৎ উত্তেজিত ও।

রাজীব বিচলিত বোধ করে। হালকা গলায় বলে, 'আমরা স্রেফ গসীপ করছিলাম। তুমি এতখানি ক্ষেপে যাবে জার্নলে .. ।'

'ক্ষেপছি নে।' ক্যাথি বার্ড সামলে নেয় নিজেকে, 'কিন্তু ভেবে দ্যাখ দিকি, দুঃখ লাগে না ? সারা পৃথিবী ব্যাপী কত দান-খয়রাতি আমাদের, অথচ, আমরা তো বুঝতে পারি, বহু দেশের বহু মানুষই ভালবাসে না আমাদের। কিছু লোক তো রটিয়ে বেড়ায়, আমরা নাকি রিলিফও বেচি ! আমরা নাকি ভিক্ষে বেচি !'

ক্যাথি বার্ড উত্তেজিত, বুঝেও, রাজীবের বুকের মধ্যে চোরা খুশি। একটু উস্কে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারে না। বলে, 'শুধু ভিক্ষেই ? তুমি খুবই আপসেট হয়ে পড়েছ-।' রাজীব মিষ্টি হেসে বলে, 'নইলে একটা চালু গল্প শোনাতাম তোমায়।'

'না, না আপসেট হইনি। বল, বল, গল্পটা।' ক্যাথি বার্ড কষ্ট করে হাসে, 'গল্পটা তুমি ভালই বল।'

তোমাদের দেশের একজন রাইটার, ধর তার নাম ক-বাবু, থাকেন নিউইয়র্ক শহরে। বাপের একমাত্র ছেলে, বাপ থাকেন অনেক দূরে ফ্লোরিডার একটি গাঁয়ে। লিখে-টিখে ক-বাবুর ইদানিং খুব নাম হয়েছে। পয়সাও পাচ্ছেন খুব।

অনেকদিন কোনই চিঠি পান নি বাবা। আগে, বছরে তিন-চার বার গিয়ে বাবাকে দেখে আসত ছেলে, ইদানিং আর যাওয়া হয়ে উঠছে না।

একদিন ক-বাবু একখানা চিঠি পেলেন বাবার থেকে। খুবই দুঃখ করে লিখেছেন বাবা।

খোকা, আজ এক বছর তুই আসিস নি । তোকে কি একটিবার দেখতে ইচ্ছে করে না আমার ? বাবাকে কি একেবারে ভুল গেলি ! আসতে যদি একান্তই না পারিস, মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেও তো পারিস । মাসে একখানা চিঠি লিখতেও কি তোর এতই-আলস্য ! বৌমার কথা জানতে ইচ্ছে করে, নাতি-নাতনীদের কথা জানতে ইচ্ছে করে, লিখে-টিকে নাকি খুব নাম হয়েছে তোর, সে সব জানতে ইচ্ছে করে । আশাকরি বুড়ো বাপের দুঃখটা তুই বুঝবি । এবার থেকে মাসে অন্তত একখানা চিঠি আশা করছি ।

ঠিক এক মাসের মাথায় ছেলের চিঠি পেয়ে বাপের তো আহ্লাদ আর ধরে না । খোকারে, কি সুন্দর চিঠিই না লিখেছিস, পড়তে পড়তে বুকখানা জুড়িয়ে গেল । তবে বড্ড ছোট চিঠি, মন ভরে না । ছেলের কাছ থেকে অন্তত এক পৃষ্ঠার চিঠি ছাড়া কি মন ভরে !

পরের মাসেই আবার চিঠি পেলেন বাবা, এবং ছোট নয়, পুরো এক পৃষ্ঠা জুড়ে চিঠি । ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ দেয় বুড়ো, 'ঈশ্বর, অমন পিতৃভক্ত বাধ্য ছেলে যেন এ দেশের ঘরে ঘরে হয় ।' এই পর্যন্ত বলে থামে রাজীব, লক্ষ্য করে, ক্যাথি বার্ড খুবই মগ্ন হয়ে শুনছে ।

বলে উঠল, 'তারপর ? গল্প শেষ ?'

'আরে না, না,' রাজীব ঠোঁটের ডগায় মিষ্টি হাসিখানি ঝুলিয়ে রাখে, 'এর পরেই তো গল্পটা । দ্বাদশ মাসে, দ্বাদশতম চিঠিখানির সঙ্গে একটি বিল পেল বুড়ো । সঙ্গে ছোট্ট চিঠি । বাবা, এখন আমার লেখার রেট পৃষ্ঠা-পিছু দেড়শ ডলার । তোমার কাছে সাড়ে এগার পৃষ্ঠার জন্য বিল পাঠালাম । প্রথম চিঠিখানি আধ-পৃষ্ঠা ধরেছি । যদিও ঐ চিঠিতে ছ-সাত লাইনের বেশি ছিল না, কিন্তু কি করব বল, আধ-পৃষ্ঠার কমে বিলই হয় না, ওটাই মিনিমাম ইউনিট, আমার রেটই ঐ রকম । আর পরিশেষে জানাই, বিলের মুখবন্ধ স্বরূপ এই ছোট চিঠিখানির জন্য কোন বিল করলাম না । ওটা ফ্রি, তোমার জন্য স্পেশাল কনসেসান । আফটার অল, তুমিই আমাকে এই পৃথিবীর মুখ দেখিয়েছ ।'

শুনতে শুনতে ফুঁসতে লেগেছে ক্যাথি বার্ড ।

ঝাঁঝাল গলায় বলে, 'আমাদের সম্পর্কে এসব রটিয়ে তোমরা যদি আনন্দ পাও, আমার বলবার কিছুই নেই । কিন্তু মনে রেখ, আমরা কিন্তু এভাবেই তোমাদের ভালবেসে যাব ।'

'তোমাদের মানে ?'

'মানে, সবাইকে, সব কিছুকে, এই পৃথিবীর নুতন, পুরাতন, যা কিছু, বিরল, মূল্যবান, —আমরা অর্থ, উদ্যোগ এবং মমতা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবই ।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো উচ্চারণ করে ক্যাথি বার্ড ।

'এবং অন্য কোথাও নয়, বাঁচিয়ে রাখবে তোমাদের নিজস্ব যাদুঘরে, দুনিয়ার অন্য কোনও দেশে সে সব জিনিস থাকলে তোমাদের বেজায় দুঃখ হবে ।'

রাজীবের কথার খোঁচাটা ক্যাথিকে বিদ্ধ করে । তাও ঠাণ্ডা মাথায় বলে, 'সত্যি করে বল তো প্রফেসর, আমরা সংগ্রহ করে না নিয়ে গেলে এসব জিনিস খুব বেশিদিন অক্ষত থাকবে ? এমনিতেই তো থার্ড-ওয়ার্ল্ড-এর বারো আনা জিনিস ইতিমধ্যেই লুপ্ত কিংবা বিকৃত । বাকিটুকুকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি বলে তোমরা এটাকে হ্যাংলামো বলবে ? এই পৃথিবীতে, মানুষ, তার ইতিহাস, তার পুরাতত্ত্ব- এসবকে আমরা ভালবাসি বলেই এসব করছি, এমনটা

ভাবছ না কেন, প্রফেসর ?'

'হ্যাংলামো শব্দটায় তোমার আপত্তি থাকলে, ফিরিয়ে নিচ্ছি।' রাজীব হাসে, 'কিন্তু ভেবে দ্যাখ, পুরনো মন্দির, মূর্তি, নাচ-গান ইত্যাদির পেছনে তোমরা যে পরিমাণ টাকা ঢাল, আর কষ্ট স্বীকার কর, একটা দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকায় তো তার এক আনাও কর না।'

'কে বলে, করি নে ?' ক্যাথি বার্ড তেতে ওঠে, 'সারা পৃথিবী জুড়ে আমাদের রিলিফ অপারেশন চলছে।'

'চলছে তো বটেই। চলছে, চলবে।' রাজীব বেশ রিদ্‌ম্ দিয়ে উচ্চারণ করে কথাগুলো, 'কিন্তু তার সঙ্গে এর মৌলিক তফাতটা তোমরাও বোঝ, আমরাও বুঝি।'

ক্যাথি বার্ড খানিক চুপ করে রইল।

তারপর বলল, 'তুমি বোধ করি পরের মুখে বেজায় ঝাল খেয়েছ। আমাদের ফোক্ ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে বছর কয়েক মেলামেশা কর, তারপর ফের খোলা যাবে এই চ্যাপ্টারটা। রাজি ? অন্তত তার আগে আমাদের ফোক্ ফাউণ্ডেশন নিয়ে কোন জোক নয়। কোনও অব্‌লিক্ রেফারেন্সও নয়।'

ক্যাথি বার্ড তার শাঁখের মত হাতখানা এগিয়ে দেয় রাজীবের দিকে, 'বল, রাজি ?'

রাজীব মৃদু হেসে হাত মেলায়।

রাজীবের হাতখানা আর ছাড়ে না ক্যাথি বার্ড। মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে প্রায় নাচের ভঙ্গিতে এগোতে থাকে গজাশিমুলের দিকে।

বর্তমান আর ভবিষ্যতের মাঝখানে 'অদৃষ্ট' নামক এক নিরেট ডুংরীর আড়াল

একটা ডুংরীর একদম কোলে এসে পৌঁছেছে ওরা। ডুংরীটা বেশ বড়। নাম হাতিলাদা ডুংরী।

ক্যাথি বার্ড শুধোয়, 'কই, প্রফেসর ? তোমার গজাশিমুল আর কদ্দূর ? হাঁটতে হাঁটতে তো প্রায় নর্থ পোলটাই পেরিয়ে এলাম। আর আমি হাঁটতে পারব না।'

রাজীব হাসে। বলে, 'আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, চরৈবেতি, চরৈবেতি। চল, চল।'

'বটে !' ক্যাথি ভ্রূ কুঁচকে তাকায়, 'শুধুই চল, চল ? থামতে বলে নি তোমাদের শাস্ত্রে ? মাঝে মাঝে থামো, থামো,—বলেনি ?'

'না' রাজীবের মুখে প্রশ্রয়ের হাসি। বলে, 'কেবল ইন্‌সেসেণ্ট, নন-এণ্ডিং অ্যাডভান্সমেণ্ট। থামলেই তোমার আগে সময় এগিয়ে যাবে। অর্থাৎ তোমার ব্যাক্‌ওয়ার্ড মুভমেণ্ট শুরু।'

ক্যাথি বার্ড যেন অল্প বিমূঢ়, 'এসব কথা সত্যিই লিখেছে তোমাদের শাস্ত্রে ?'

'জানি। আমাদের কোনকিছুকেই সহজে বিশ্বেস কর না তোমরা। ইচ্ছে করে, তোমাকে এদেশের একজন বড় হিন্দু ফিলোসফারের কাছে নিয়ে যাই।'

'কোথায় তিনি ?' ক্যাথি বার্ড প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, 'আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল। আমি তাঁর কথা শুনব।'

'না, থাক। স্পিরিচুয়াল ফিলোসফির ওপর কোনও ইণ্ডিয়ানের ব্যাখ্যা তোমাদের টানে না, জানি। তুমি বরং ন্যু-ইয়র্ক য়্যুনিভার্সিটির ড. ওয়েলারের কোনও বই জোগাড় করে

পড়ো। হিন্দু ফিলোসফি নিয়ে তাঁর বহু ভাবনা-চিন্তা রয়েছে।'

'পড়বো।' ক্যাথি বার্ড প্রায় তৎক্ষণাৎ স্থির করে ফেলে, 'এবারে কোলকাতা গিয়েই ড. ওয়েলারের সবগুলো বই আনিয়ে নোব।'

রাজীব খুব বিস্মিত চোখে তাকায় ক্যাথি বার্ড-এর দিকে। তারপর আচমকা হো-হো করে হেসে ওঠে।

'হাসছ যে?' অপ্রস্তুত হয়ে শুধোয় ক্যাথি।

'এমনি।' রাজীব জবাব দেয়।

'এমনি এমনি কেউ হাসে না।' ক্যাথি বার্ড ঈষৎ রুষ্ট।

'ইণ্ডিয়ানরা হাসে।' রাজীব রহস্যময় গলায় বলে, 'এমনি এমনিই হাসে, অকারণে।'

ক্যাথি বার্ড আর কথা বাড়ায় না। গোমড়া মুখে হাঁটতে থাকে।

দু'পাশের ঘন জঙ্গল চিরে বয়ে গেছে একটি গভীর ঝোরা। ডানদিকের ডুংরীটার থেকে খুব টাটকা টাটকা নামছে ওটা। গর্জন তুলে ছুটছে তাই। ঝোরাটার পাড় ধরে শুঁড়িপথ, অতি সাবধানে হাঁটছে দু'জনে। ক্যাথি বার্ড ঘনঘন তাকাচ্ছে ঝোরাটার দিকে।

'এ ঝরনাটারও কোনও নাম নেই নিশ্চয়?' খুব নিরাসক্ত গলায় শুধোয় ক্যাথি।

'না, অন্তত আমার জানা নেই।'

'নাম দেবার প্রয়োজন নিশ্চয়ই নেই।' ততোধিক যান্ত্রিক গলা ক্যাথির।

'আমি তো তেমন প্রয়োজন বোধ করছি নে।' রাজীব ঠোঁট টিপে হাসে।

ক্যাথি নিরুত্তাপ গলায় বলে, 'দেন প্রসিড।'

পরমুহূর্তেই চেঁচিয়ে ওঠে সে, 'লুক, প্রফেসর, ওগুলো কিসের বাচ্চা?' ক্যাথি আঙুল তুলে দেখায় ঝোরাটার ওপারে।

রাজীব দেখে, ঝোরাটার অপর পাড়ে একটা ভুঁড়ুর গাছের তলায় তিন-চারটে ছোট প্রাণী নির্ভয়ে খেলছে। অবিকল দেশি কুকুরের বাচ্চার মত দেখতে। গায়ের রঙও পাটালি-হলুদ। ক্যাথি বার্ড এ দেশের গাঁয়ে-গঞ্জে ঘুরে বেড়ানোর দরুণ দেশি কুকুরের বাচ্চা দেখেছে ঢের। বলে, 'এই ঘোর জঙ্গলে কুকুরের বাচ্চা এল কি করে বল ত?'

রাজীব হেসে বলে, 'কুকুরের বাচ্চা নয় এগুলো?'

'তবে?'

'এগুলো হায়েনার বাচ্চা।'

'অ্যাঁ!' আঁতকে ওঠে ক্যাথি বার্ড, 'বল কি? কি সর্বনাশ! রিয়েল হায়েনা?'

মুচকি হেসে মাথা দোলায় রাজীব।

'এই,' ততক্ষণে রাজীবের হাত শক্ত করে ধরেছে ক্যাথি, 'আমাদের অ্যাটাক করবে না তো?'

'আরে, না, না। এগুলো তো নেহাতই বাচ্চা।'

'বড়রা হয়ত কাছাকাছিই রয়েছে।'

'অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু সাধারণত ওরা দিনের বেলায় মানুষকে আক্রমণ করে না। তার ওপর আমরা রয়েছি দু'জন।'

রাজীবের কথায় আশ্বস্ত হয় ক্যাথি। সঙ্গে সঙ্গে মুখখানি মিষ্টি হাসিতে ভরে যায় ওর।

বলে, 'দ্যাখ, দ্যাখ, কি সুন্দর খেলছে । কেমন সরল, অকপট মুখগুলো, কেমন নিষ্পাপ চাউনি ।'

রাজীব এক পলক চোখ রাখে ক্যাথির চোখে । তারপর রহস্যময় গলায় বলে, 'এই পৃথিবীতে সব প্রাণীকেই শিশু অবস্থায় নিষ্পাপ লাগে ।'

ক্যাথি কী বোঝে, কে জানে, আচমকা গুম মেরে যায় সে ।

বেশ খানিকক্ষণ হাঁটবার পর ঝোরাটা ক্রমশ চওড়া হয়ে এল । চারপাশে ছোট-বড় ডুংরী । বিশাল বিশাল মহীরুহ । ঝোপঝাড় । তার মধ্য দিয়ে তিরতির করে বয়ে চলেছে ঝোরাটি । অকস্মাৎ বড় নিঃসঙ্গ লাগে ওকে । ঝোরার বুকে নানা আকারের পাথরের চাঙড় । বিচিত্র তাদের রঙ । পাথরের খাঁজ দিয়ে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ জল ।

ক্যাথি বার্ড আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে । চোখে মুখে ফিরে এসেছে তার স্বভাবসিদ্ধ প্রগল্‌ভ ভাবখানি ।

একটা বড়-সড় ডুংরী সামনেটা পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছে । একটা সঙ্কীর্ণ রাস্তা ঝোরা পেরিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে ডুংরীর দিকে । ওরা মসৃণ পাথরের ওপর পা ফেলে ফেলে পেরিয়ে গেল ঝোরাটা । এখন চারপাশে শুধু গোলাকার ডুংরী । মনে হয় এক উঁচু পাড়ওয়ালা বিশাল মজা হ্রদের মধ্যিখানে দাঁড়িয়েছে দু'জনে ।

সহসা দাঁড়িয়ে পড়ে ক্যাথি বার্ড । অপরূপ ভ্রূ-ভঙ্গি করে তাকায় রাজীবের দিকে । বলে, 'ভুলিয়ে ভালিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছ, বলো দেখি সত্যি করে ?'

সে কথায় রাজীব হাসে । বলে, 'তোমায় নিয়ে যাচ্ছি এমন এক প্রত্যন্ত প্রদেশে, যেখান থেকে তোমার কোনও সন্ধানই আর সভ্য দুনিয়ার কাছে পৌঁছুবে না ।'

'সেটা মন্দ নয়—।' সোনালী চুলের রাশ ঝাঁকিয়ে ক্যাথি বার্ড বলে, 'কিন্তু তার ফলটা একবার ভেবো ।'

'ফল আবার কি হবে ?'

'আন্দাজ কর দেখি !' ক্যাথি বার্ড ভ্রূ নাচিয়ে বলে ।

'কী আবার হবে ?' রাজীব আলগা ভঙ্গিতে বলতে থাকে, 'তুমি বিহনে তোমাব মনের মানুষটি আমেরিকার কোনও একশোতলা বাড়ি থেকে ঝাঁপ দেবে তলায় । কিংবা— ।'

'ফুঃ—।' ক্যাথি বার্ড যেন ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চায় রাজীবের কথাগুলো, 'তোমার কোন ধারণাই নেই দেখছি । তবে বলি, শোন । আমার হদিশ না পেলে, ভারতের মার্কিন রষ্ট্রদূতের চাকরিখানা যাবেই । ইণ্ডিয়ার সঙ্গে 'মেরিকার রিলেশন আর স্ট্রেইন্ হবে । ফলে 'মেরিকা আরো ডজন কয়েক এফ-১৬ দেবে পাকিস্তানকে । 'মেরিকান প্রেসিডেণ্টকে রিজাইন করতেও হতে পারে পাবলিক প্রেসারে । চাই কি এটাকে কে. জি. বি.'র কাণ্ড ভেবে রাশিয়াকে অ্যাটাক করে বসতে পারে 'মেরিকা । শুরু হয়ে যেতে পারে থার্ড ওয়ার্ল্ড-ওয়ার । আর বুঝতেই পারছ, থার্ড-ওয়ার্ল্ড-ওয়ার শুরু হলে পৃথিবীতে প্রাণ বলে কিছুই আর থাকবে না ।'

বলতে বলতে এক অপরূপ ভঙ্গি করে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল ক্যাথি বার্ড ।

শুনতে শুনতে মনটা ভারি হয়ে আসছিল রাজীবের । ক্যাথি বার্ড-এর কথাগুলোকে পুরোপুরি রসিকতা বলে মনে হল না তার । সত্যিই তো, ওদের দেশের একজন মানুষ খোয়া গেলে দুনিয়াব্যাপী তুমুল হৈচৈ পড়ে যায় । দেশের সর্বোচ্চ মানুষটিকে জবাবদিহি

করতে হয় স্বদেশবাসীর কাছে। আর আমাদের দেশের শয়ে শয়ে যুবতী নারী পাচার হয়ে যায় বিদেশে। পশুর মতো বিকিয়ে যায়। ফলাও করে সে খবর ছাপা হয় কাগজে। ফলে কাগজের বাম্পার সেল হয়। তার বেশি কিছু নয়। এদেশের অপহৃত মেয়ের বাবার ডায়েরি থানা নিতে চায় না। রসিক বড়বাবু ততোধিক রসিক হাসিটি হেসে বলে, 'দেখুন গে, পাড়ারই কোনও জামাইয়ের সঙ্গে ভেগেছে হয়তো! মা কালীর থানে পুজো চড়ান্ মশাই। অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকা বেঁচে গেল আপনার।'

রাজীবকে গুম মেরে থাকতে দেখে ফের তাড়া লাগাল ক্যাথি বার্ড, 'বল না, তোমার ঐ 'গোজাশিমুল' আর কদ্দুর? কোন্ রাজ্যের পার?'

রাজীব হেসে বলে, 'এই বড় ডুংরীটার ঠিক ওপারেই গজাশিমুল, স্ট্রেইট হাঁটলে বড় জোর পাঁচশো গজ।'

'রিয়েলী! তবে দেখতে পাচ্ছি নে কেন?' অবরুদ্ধ আবেগ আর উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকে ক্যাথি।

'কি করে পাবে? ডুংরীখানা আড়াল করে রেখেছে যে! ডুংরীটা পেরোলেই দেখা দেবে তোমার স্বপ্নের গজশিমুল।'

'ঠিক আমাদের জীবনের মত।' ক্যাথি বার্ড-এর গলা রণরণিয়ে ওঠে, 'বর্তমান আর ভবিষ্যতের মাঝখানে এই ডুংরীর মত এক চিলতে নিরেট আড়াল।'

'বাহ্!' রাজীব চমৎকৃত হয়, 'খুব তরল ভঙ্গিতে একখানা খুব ভারি কথা বলে ফেলেছ তো! আমাদের দেশে ওকেই বলা হয় 'অদৃষ্ট'।'

ক্যাথি বার্ড-এর মন তখন গজাশিমুলের দিকে ধাইছে। রাজীবের কথাগুলো শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না।

গজাশিমুল গাঁয়ে ভালুকের গর্জন

ডুংরীখানা পেরোতেই গজাশিমুল গাঁ'খানা সত্যিই দেখা গেল। ডাইনে ডুংরী, বাঁয়ে ডুংরী, পেছনে সারবন্দী হাতির পালের মত ডুংরী আর জংগল নিয়ে গোটা কতক পোয়াল ছাতুর মত কুঁড়েঘর দূর থেকে দেখতে পেল ক্যাথি বার্ড। আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠল সে।

এক সরু পায়ে চলা পথ। এঁকে বেঁকে উঁচালী-নীচালী দিয়ে চলে গিয়েছে গাঁয়ের দিকে।

গাঁয়ের পেছনে সবচেয়ে উঁচু আর বড় ডুংরীখানার দিকে আঙুল তাক করে রাজীব বলল, 'ঐ দ্যাখ, ওটার নাম গজাশিমুল ডুংরী। ঐ ডুংরীর নামেই গাঁয়ের নাম।'

'অন্যগুলোর নাম কি?'

'সবগুলোর নাম আমিও জানি নে।' রাজীব বলে, 'তবে ঐ ডানদিকের ডুংরীটার নাম ভালুকমুড়া।'

'মানে?'

'মানেটা কি করে বোঝাই তোমায়—।' রাজীব আমতা আমতা করে বলে, 'আক্ষরিক অর্থটা হোল, দ্য হেড অব্ আ বিয়ার।'

'কেন অমন নাম হল?' ক্যাথি বার্ড-এর কৌতূহল যেন কিছুতেই মেটে না।

'সেটা বলা শক্ত।' রাজীব বলে, 'দুটো সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। এক, কেউ কোনদিন ঐ ডুংরীতে কোন মৃত ভালুকের মুণ্ডু আবিষ্কার করেছিল। দুই, ডুংরীটা হয়তো ওদের কারুর চোখে ভালুকের মুণ্ডুর মত ঠেকেছিল আকৃতিতে।'

'আমার মনে হয় দ্বিতীয়টাই ঠিক।' ক্যাথি বার্ড হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে এক দৃষ্টিতে বারবার দেখছিল ডুংরীটাকে। বলে, 'ডুংরীটাকে অদ্দূর থেকে আমারও একটা ভালুকের মুণ্ডুর মত মনে হচ্ছে। ভালুকটা যেন আকাশের দিকে মাথা তুলে গর্জন তুলেছে।'

ক্যাথি বার্ড-এর কথায় মজা পায় রাজীব। বলে, 'গর্জনটাও শুনতে পাচ্ছ না তো ?'

কান খাড়া করে কী যেন শুনছিল ক্যাথি বার্ড। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। বিড় বিড় করে বলে, 'বোধ হয় তাও পাচ্ছি।' পরমুহূর্তে উত্তেজিত হয়ে ওঠে ক্যাথি, 'তুমি শুনতে পাচ্ছো না গর্জনটা ?'

মৃদু হেসে রাজীব বলে, 'পাচ্ছি বৈ কি ! ঐ গর্জনটাইতো ঐ ডুংরীর আসল আকর্ষণ।'

'গর্জনটা কিসের ? বল না।' ক্যাথি বার্ড যেন আকুল হয়ে ওঠে।

রাজীব বলে, 'ওটা একটা বুনো ঝরনা। ডুংরীর বহু উঁচু থেকে নাচতে নাচতে — না বলে, বলা ভালো, লাফাতে লাফাতে নেমে গেছে ও — ই নালা দিয়ে। তারই জল এই এলাকাটাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বয়ে গেছে পাহাড়ী নদীর রূপ ধরে। নদীটার নাম ছোট খরসতী।'

'নদীটার ধারে একটিবার নিয়ে যাবে না আমাকে ?' বাচ্চা মেয়ের মত উচ্ছ্বসিত গলায় বলে ওঠে ক্যাথি।

মাথা দোলায় রাজীব, 'নিয়ে যাব।'

'কিন্তু এটা নয়, আমি আর একটা গর্জন শুনতে পাচ্ছি।' ক্যাথি বার্ড সন্ত্রস্ত গলায় বলে, 'কান পেতে শোন, কে যেন চিৎকার করে ধমক দিচ্ছে কাউকে। কারা যেন গলা ফাটিয়ে কাঁদছে— ।'

এভাবে পালানো যায় না

গাঁয়ে ঢোকবার মুখেই কিনাবনী পুকুর। তার পাড়ে একটি পুরোনো কুসুম গাছ। তার তলায় একটা বড়সড় জটলা। দূর থেকে দেখে থমকে দাঁড়াল দু'জনে।

ক্যাথি বার্ড স্পষ্টতই ভয় পেয়েছে। কিছুক্ষণ আগেই মনুষ্য-সঙ্গের জন্য হাঁকুপাঁকু করছিল এই মেয়ে, এখন এই জঙ্গল-ঘেরা পরিবেশে, একদল অর্ধ-উলঙ্গ মানুষের সামনে পড়ে গিয়ে সে যেন সহসা হতচকিত, বিহ্বল।

শুধোয়, 'ওরা এমন চিৎকার করছে কেন ? আমাদের কি অ্যাটাক করতে পারে ?'

'আরে না, না।' ক্যাথির সমস্ত আশঙ্কা ফুৎকারে উড়িয়ে দেয় রাজীব, 'চল, এগিয়ে গিয়ে দেখি, কী ঘটেছে।'

পাশাপাশি পৌঁছেই রঙলালকে দেখতে পেল ওরা। কুসুমগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে, গর্জন তুলেছে সে। একটুক্ষণ খাড়া থেকে ওর বক্তব্যের সারবস্তু শুনল রাজীব।

ক্যাথির বোধগম্য হয়নি কিছুই । সে ভয়ার্ত গলায় শুধোল, 'এই, কি হচ্ছে এখানে ?'

'ভালুকে গর্জন তুলেছে ।' রাজীব তেতো গলায় বলে, 'একটু আগেই ভালুকের গর্জন শুনবার জন্য কান খাড়া করেছিলে না তুমি ? ঐ শোন, জ্যান্ত ভালুকের গর্জন ।'

রঙলালকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর করছিল ক্যাথি ।

বলল, 'তোমার সেই ভিলেন না ?'

মাথা নেড়ে সায় দেয় রাজীব ।

'ওকে আমরা রানীবাঁধ বাজারে দেখলাম না গতকাল ?' ক্যাথির চোখে মুখে অবিশ্বাস, সন্দেহ, ভয়, মিলেমিশে একাকার, 'আমাদের আগে কী করে এখানে পৌঁছে গেল ও ?'

'ও যাদু জানে ।' রাজীবের সংক্ষিপ্ত জবাব ।

রাজীবের কথায় চকিতে মুখ ফেরায় ক্যাথি । রাজীবের কথার সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করে । বলে, 'ইজ ইট ? এই, সত্যি করে বল না, ও কি সত্যিই যাদু জানে ? যাদুবলেই কি একদিনের পথ একঘণ্টায় এসেছে ?'

রাজীব অবাক হয় না ক্যাথির কথায় । এমন কথা শোনার পরও কিন্তু মেয়েটাকে মাথামোটা বলে মনে হয় না রাজীবের । কারণ সে জানে, ভারতবর্ষের অলৌকিকত্ব নিয়ে পৃথিবীময় কত ঘটনা, রটনা গুজব চালু রয়েছে । 'ইয়োগ' যে মানুষকে কোন অতীন্দ্রিয় ধামে পৌঁছে দিতে পারে এ দেশের কিছু মানুষ ওদেশে গিয়ে তার ডেমোনেস্ট্রেশন দিচ্ছে আজকাল । ঐ ধরনের কিছু বিশ্বাস মগজে ভরে নিয়েই এদেশের পথে পা বাড়িয়েছে ক্যাথি । ইণ্ডিয়া ইজ আ ল্যাণ্ড অব সেইন্টস্ অ্যাণ্ড অ্যাসসেটিকস্, তন্ত্রজ্ অ্যাণ্ড ব্ল্যাক-ম্যাজিক, মিস্ট্রিজ অ্যাণ্ড মিরাক্‌ল্‌স্ ... এখানে পথে-ঘাটে, ঝোপে-ঝাড়ে গিজগিজ করছে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী শয়ে শয়ে মানুষ । এ দেশে এসে, এর পথে-প্রান্তরে, গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছে ক্যাথি, চষে ফেলেছে এ দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি । বেশি করে মিশেছে আদিবাসী নিম্নবর্গের মানুষজনের সঙ্গে । দেখেছে, প্রায় প্রত্যেকটি মানুষ অলৌকিক ক্ষমতায় গভীর বিশ্বাসী, প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেখেছে সেই শক্তির প্রকাশ, পেয়েছে তার সুফল, কিংবা রোষে পড়ে সর্বনাশ হয়েছে ... । ওরা বিশ্বাস করে, গভীর ভাবে, বুঝতে পারে, চিনতে পারে, গন্ধ পায়, স্বপ্ন দেখে, এবং এ ব্যাপারে ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অজ্ঞে মোটামুটি কোনও ভেদ নেই । এ দেশের মানুষের সঙ্গে দীর্ঘকাল ঐ বিষয়ে বাক্যালাপ করে ক্যাথি বার্ড-এর যা ধারণা জন্মেছে তা হল, এ দেশে লাখে লাখে অলৌকিক ক্ষমতাধর মানুষ রয়েছে, হাটে-বাটে-ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে, পাহাড়-জঙ্গল-নদীর কিনারে, টাঁড়ে-টিঁকরে, এক কথায় দেশের রক্তে-মাংসে-মজ্জায় মিশে রয়েছে ওরা প্রকাশ্যে কিংবা গুপ্তভাবে । ওরা সাধারণত ছেঁড়া-ময়লা পোশাক পরে, মুখে লম্বা লম্বা দাড়ি রাখে, মাথায় লম্বা লম্বা চুল ..., গলায় পরে বিভিন্ন স্টোন এবং সীডের মালা । কপালে চন্দন কিংবা সিন্দুরের ফোঁটা নেয়, হাতে বিচিত্র-গড়ন লাঠি । খুব ময়লা থাকে ওরা । গাছের তলায়, নদীর ধারে, নির্জন জায়গাতে ওরা বসে থাকে, দিনরাত গাঁজা খায়, ঘুমিয়ে থাকে ধুলো-বালির ওপর, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় । গভীর রাতে অনেকেই খক্‌খক কাশে, স্মোকার্স কাফ্, স্পষ্ট বোঝা যায় ।

ক্যাথি প্রথমে এদের বেগার কিংবা ইণ্ডিয়ান হিপি গোছের কিছু ভাবত । কিন্তু এ দেশীয়রা

ওকে জিভ কেটে বলেছে, এরা ভিখিরী ? বল কি ! সাত-রাজার ধন মানিক এদের করায়ত্ত। এরা সব ভেতরে ভেতরে এক-একজন জাঁদরেল মিরাক্‌ল্‌বাজ। ইচ্ছে করলে যা খুশী তাই করতে পারে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ ঐশীশক্তি, এদের দখলে। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান এদের নখের ডগায়। বিশ্বেস না হয় হাতখানা একটিবার পেতে দাও ওর সামনে, তোমার গুষ্টির যাবতীয় কথা এক নিঃশ্বাসে বলে দেবে। এ দেশে এমন মানুষ আছে, যারা জল আর আগুনের ওপর হাঁটতে পারে, শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওরা গড্‌-এর সঙ্গে কথা কয়, তাদের আদর করে, গল্প করে ওদের সঙ্গে, আবার ক্ষেপে গেলে ধমকায়। এরা চাইলে বৃষ্টি নামাতে পারে, মরা মানুষকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। শিবের অসাধ্যি, ব্যাধি, ওরা শুধু ছুঁয়ে দিলেই ভাল হয়ে যায়। বন্ধ্যা নারী, ওরা শুধু ছুঁয়ে দিলেই তার বাচ্চা হবে। ক্যাথি বার্ড চোখ বড় বড় করে শুনতে থাকে এসব। শুধু ছুঁয়ে দিলেই বাচ্চা হবে ? আর কিছু করতে হবে না ? স্ট্রেঞ্জ ! তেমন লোকের কাছে নিয়ে চল আমায়। আমি তাকে দেখব, তার সঙ্গে কথা বলব, তার ইণ্টারভিউ নেব, ছবি তুলব। ওর কথা ছাপব। মানুষজন বিদেশিনী যুবতীর এমন প্রগল্‌ভতায় সস্নেহে হাসে। তিনি কথাও বলবেন না, ইণ্টারভিউও দেবেন না, ফটোও তোলাবেন না। তিনি চাইলে তোমাদের ম্যাগাজিনের সমস্ত পাতা শুধু তাঁর ছবিতেই ভরে যাবে।

সব চেয়ে বড় কথা, তুমি তাকে চিনবে কেমন করে ? তিনি কি বলে বেড়াবেন, আমি হেন জানি, তেন জানি ? যারা জানে তারা কখনও লাফায় ? গণ্ডুষ জল মাত্রেন শফরী ফর্‌ফরায়তে। কিন্তু এঁরা অন্য জাতের মানুষ, বিজ্ঞাপন দিয়ে রাস্তার মোড়ে বসে থাকেন না, জীবনের চলার পথে এদের খুঁজে নিতে হয়। খুঁজে নেবে এমন সাধ্যই বা কই তোমার ! তোমার সুকৃতির ফল থাকলে তিনি নিজেই দেখা দেন, আচম্বিতে, অনাড়ম্বর ... । শিক্ষিত নাগরিক মানুষ এ কথার পরই ভাবাবেগ সহকারে আবৃত্তি করে ওঠেন :

ওরে, দুয়ার খুলে দে রে, বাজা শঙ্খ বাজা —
গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা ... ।

আশ্চর্য, পারেও এরা, যখন-তখন এই পৃথিবীতে থেকে নিঃশব্দে কেটে পড়ে অন্য জগতে ডুব মারতে। ক্যাথি তেমনটিও দেখেছে।

এই সেইন্ট, অ্যাস্‌সেটিক, মিরাক্‌ল্‌বাজদের নাকি তাও চেনা যায় খুঁটিয়ে দেখলে, কিন্তু ব্ল্যাক-ম্যাজিক যারা করে তাদের তো তুমি চিনতেই পারবে না। তারা মানুষের সমাজে সাধারণ মানুষের মতোই বাস করে, জলের মধ্যে যেমন মিশে থাকে মাছ, তুমি বুঝতেই পারবে না, অথচ ও একটুখানি তাকালে, তোমার গাইয়ের বাঁটে দুধ থাকবে না, গাছের ফল যাবে শুকিয়ে, পুকুরের মাছ যাবে উড়ে, তোমার ছেলেটি হাড় জিরজিরে হয়ে শুকোতে শুকোতে একদিন মরে যাবে। সে একটা মেয়ের নামে মন্ত্র পড়ে একটা ফুল দিলে, ঐ ফুল যার কাছে থাকবে, মেয়েটি তার পেছনে মাদী কুকুরের মত ঘুরবে। সে মন্ত্র পড়ে একটুকরো খড়ের ওপর এক ফোঁটা মন্ত্রঃপূত রক্ত ফেললে, বিশ-পঞ্চাশ মাইল দূরে তুমি মুখে রক্ত উঠে মারা যাবে। ক্যাথি বার্ড যতই শোনে, ততই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এরা তো শুধু থিয়োরিটিক্যালি বলে না, প্রত্যেকের ঝুলিতে এ ধরনের ঘটনা সাত থেকে দশটি। ক্যাথি এ ক'বছরে হাজার কয়েক এ ধরনের ঘটনা সংগ্রহ করেছে। সব অ্যাসেম্বল্‌ করে একটা বই লেখার ইচ্ছে।

সব দেখে শুনে ক্যাথির ধারণা হয়েছে, এদেশে যে কেউ, আপাতভাবে তাকে যতই সাধারণ দেখাক না কেন, সে জানতেও পারে যাদু গোছের কিছু ।

ক্যাথি অস্থির গলায় শুধোয় তাই, 'বল না, লোকটা কি সত্যিই যাদু বলে চলে এসেছে এখানে ?'

'না, না' । বলতে বলতে হেসে ফেলল রাজীব, 'ও পায়ে হেঁটেই এসেছে ।'

'বাট হা — উ ?' ক্যাথির গলায় অধৈর্য, 'ওকে আমরা রানীবাঁধে ছেড়ে এসেছি ।'

রাজীব গম্ভীর হয়ে ওঠে । বলে, 'আমরা পথ ধরে হেঁটেছি । ও বে-রাস্তায় হাঁটে। সে পথ দুর্গম, কিন্তু অনেক শর্ট-কাট ।'

'কিন্তু ও চিৎকার করে বলছেটা কী ? অত তর্জন-গর্জন করছে কেন ? চারপাশের লোকগুলোই বা কারা ? আর, ঐ মেয়েটাই বা ধুলোয় লুটিয়ে কাঁদছে কেন ?'

ক্যাথি বার্ড-এর প্রশ্ন যেন থামতে চায় না কিছুতেই ।

রাজীব ওকে হাতের ইঙ্গিতে থামায় । বলে, 'সেগুলোই তো বোঝবার চেষ্টা করছি ।'

ঝাঁকড়া কুসুম গাছের তলায় লাল ধুলোর ওপর শুয়ে, ফুলে ফুলে কাঁদছে রঙী । কাপড়-চোপড় আলুথালু । যুবতী শরীরখানি কান্নার দমকে দুলছে । পাশে লুটোচ্ছে একটি কাপড়ের পুঁটলি ।

রঙলাল সমানে চেঁচাচ্ছিল, 'শালী, রঙলালের রুপেয়াটা সস্তা আছে, না ? পহ্‌লে রুপেয়া মেটাতে বল তোর বাপকে, উসকো বাদ যেদিকে যাবি, যা ।'

চারপাশের জমায়েত, সব্বাই গজাশিমুলের বাসিন্দা, বোবার মত দাঁড়িয় দাঁড়িয়ে রঙলালের নাটক দেখছে । রা' কাড়ছে না কেউ । অল্প দূরে রঙীর বাপ ঝাড়েশ্বর কোটাল পুতুলের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে । ভাবলেশহীন মুখ তার ।

ধীরে ধীরে পুরো ব্যাপারটা স্বচ্ছ হয়ে এল রাজীবের কাছে । নাচনহাটিতে বিয়ে ঠিক হয়েছিল রঙীর । রঙলালের কানে চলে গিয়েছিল সে খবর । রঙীর নামে কিছু টাকা নেওয়াই ছিল আগে থেকে । আরও কিছু টাকা ওর হাতে গুঁজে দিয়েই নিজমূর্তি ধরেছিল রঙলাল । বিয়ের দিনক্ষণ পাকা করতে এল পাত্র-পক্ষ । রঙলাল খবর পেয়েই গিয়ে হাজির হল ঝাড়েশ্বরের উঠোনে । ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিল পাত্রপক্ষকে ।

'কেন ?' কথার মধ্যিখানে বলে ওঠে ক্যাথি বার্ড, 'ওর বাধা দেবার রাইট কোথায় ?'

'বা - রে ! তা হলে তোমাকে এতক্ষণ ধরে বললামটা কি ? ঝাড়েশ্বর কোটাল রঙীর নামে দাদন নিয়েছে না রঙলালের কাছ থেকে ? সুদে-আসলে ঐ টাকা শোধ না হওয়া অবধি রঙী তো রঙলালের কাছে হাইপোথিকেটেড । তার বিয়ে হবে কী করে ? রঙলাল তার 'আইনসঙ্গত' দাবী ছাড়বে কেন ?'

ক্যাথি বার্ড আচ্ছন্নের মত বলল, 'তারপর ?'

'তারপর আর কি ? পাত্রপক্ষ ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল । বিয়ের কথাবার্তা এমন শেষ পহরে এসে ভেঙে যাওয়ায় একেবারে হতাশ হয়ে উঠেছিল রঙী । এমনি সময়ে রঙলাল

ওকে আসামে নিয়ে যেতে চাইল। বাপের তো আপত্তি করবার কিছুই নেই। কাজেই দিনক্ষণ ঠিক হয়েছিল আগামী পরশু। কিন্তু অমন সুন্দর ছেলের সঙ্গে বিয়ে হতে যাচ্ছিল। রঙীর মন যে কিছুতেই আসাম যেতে চায় না! ভাবনা-চিন্তায় পড়তে পড়তে সে মেয়ে 'সহসা মরিয়া হয়ে উঠল। অকস্মাৎ ঠিক করে ফেলল, সে পালিয়ে যাবে বিনপুর থানার লাগাদড়ি গাঁয়ে। সেখানে তার মাসির বাড়ি। সেখান থেকে কোনও উপায়ে খবর পাঠাবে লাচনহাটি গাঁয়ে খোদ বরের কাছে। তার বিশ্বাস অমন তাগড়া জোয়ান ছেলে সাহসীও হবে। নির্ঘাৎ সাড়া দেবে ওর ডাকে। মাসীর বাড়িতে বিয়ের পর্ব শেষ হবে ওদের। রঙলাল কিছুতেই লাগাদড়ি গাঁয়ের খোঁজ পাবে না। সাহসে বুক বেঁধে সবকিছু গুছিয়ে গাছিয়ে গোপনে তৈরী হল মেয়ে, পালাবার জন্য। ওদিকে খবরটা কিন্তু কী করে যেন যথা সময়ে চলে গেল রঙলালের কানে। ঝটিতি ছুটে এল সে গজাশিমুল গাঁয়ে। রঙী ঘর থেকে বেরোতেই সাক্ষাৎ শমনের মত পথ আগ্‌লেছে। তার পরের ঘটনা তো চোখ দিয়েই বুঝতে পারছ।

ক্যাথি বার্ড কোনও কথা বলছিল না। সে এক দৃষ্টিতে দেখছিল রঙীকে। প্রথাগতভাবে নিজেকে পশুর মত অদৃষ্টের হাতে সঁপে না দিয়ে, মেয়েটি অন্তত তার নিজের মত পদ্ধতিতে চলতি ব্যবস্থাকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছে। এটা ভেবে সে মনে মনে বার বার তারিফ করছিল মাটিতে লুটানো রঙীকে। মুখে বিড় বিড় করে উচ্চারণ করছিল, 'আ নন-কম্প্রোমাইজিং ব্রেভ গার্ল!'

রঙীর দিকে এগিয়ে গেল রাজীব। পরম মমতায় হাত বোলাতে লাগল মাথায়। ভারি গলায় বলল, 'বাড়ি ফিরে যা রঙী। এবাবে পালিয়ে যাওয়া যায় না।'

৭. গজাশিমুল গাঁয়ে বারুদের সঞ্চার

মালদা আর শিলিগুড়ি থেকে দল ফিরে এসেছিল দিন দশেক আগে। সুচাঁদ আর রাজীব মাস্টার ফেরে নি দলের সঙ্গে। থেকে গেছে শিলিগুড়িতে। ওদের নাকি অন্য কোথায় কী সব কাজ রয়েছে। বদন কোটালও এখন সামান্য চালাক-চতুর হয়েছে। অদ্দূর থেকে দলটাকে ফিরিয়ে এনেছে ও-ই। সুচাঁদ আর মাস্টারের খবর দিতে পারে নি দলের অন্যরা।

আজ বিকেলের দিকে সুচাঁদ ফিরল। একলাটি। দশরথ ভক্তা ভারি চিন্তায় ছিল এ ক'দিন। সুচাঁদকে দেখামাত্তর বাঘের ঝাপ্‌টি নেয় সে, 'কুথা গেলি, কবে ফিরবি, কোউ কিছো বইল্‌তে লারে, তুয়াদ্যার ব্যাপারখান্ কি? মাস্টার কুথা?'

'মাস্টারদা আসে নাই। সে থেইক্যে গিছে কোলক্যাতায়। জরুরী কাজকর্ম রয়্যেছে উয়ার। তথ্যমন্ত্রীর সাথ ভেট কর্‌ইর্‌বেক। হপ্তাটাক বাদে ফিরবেক উ।'

আসলে, দশরথ ভক্তা মুখিয়েছিল সুচাঁদের জন্য। মনে মনে শক্ত হয়ে রয়েছে সে। বেনারস থেকে দল ফিরে আসার পর থেকেই সোরগোল তুলেছিল সে। গাঁয়ের ছগ্‌রা-ছগরীদ্যার আর লাচ দেখাতে বাইরে যেত্যে হবেক নাই। ঘরে থাক্ সব, খাটা-বাটা কর্, দুখ ঘুচবেক উয়াতে। উই মাস্টারের কথায় আর লাচিস নাই তুয়ারা। গাঁয়ের বাছা বাছা

মুরুব্বিরাও সায় দিয়েছিল দশরথের কথায় । রাজীব সব শুনে বজ্রাহতের মত তাকিয়েছিল খানিকক্ষণ । দুদিন ধরে বুঝিয়েছিল সবাইকে । কিন্তু মুরুব্বিরা অনড় ।

'ঠিক আছে ।' গলায় চরম হতাশা ফুটিয়ে বলেছিল রাজীব, 'মালদা আর শিলিগুড়ির শো-গুলোতে অন্তত যাক ওরা । বায়না হয়ে রয়েছে । টিকিট ছাপিয়ে বিক্রি করে ফেলেছে ওরা, প্রচার করেছে সর্বত্র । না গেলে মাথা কাটা যাবে ।'

সুচাঁদও সায় দিয়েছিল মাস্টারের কথায় । এই শো'গুলো শেষ হয়ে গেলে না হয় ভেঙে দেওয়া হবে দল । নিমরাজি হয়ে প্রস্তাবটা মেনে নিয়েছিল মুরুব্বিরা, 'কিন্তু এই শেষ । আর যেন একটিও নতুন বায়না না হয় ।'

সেই থেকে দিন গুনছে গজাশিমুলের মুরুব্বিরা । শিলিগুড়ি থেকে দল ফিরলেই ষোল-আনার মিটিন্ বসিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভেঙে দেওয়া হবে গজাশিমুল সংস্কৃতি সঙ্ঘ । মাল-ঝাল, যা মাস্টার তার নিজের পয়সায় কিনেছে, ফিরিয়ে দেওয়া হবে তাকে । যে সব সামগ্রী দলের গাওনের টাকা থেকে কেনা হয়েছে, বিক্রি করে দেওয়া হবে । যত জলদি সম্ভব এগুলো শেষ করে ফেলতে হবে । কারণ, রঙলাল মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে । বেজায় ক্ষেপে গেছে সে । বার কয়েক হুঁশিয়ারি দিয়ে গেছে ইতিমধ্যে । ওকে তো চটানো যাবে না । ওই তো গজাশিমুলের মানুষের কাছে দুর্দিনের ভরসা । শো' করে যে পরিমাণ টাকা ঘরে আনছে ছেলে-মেয়েরা, তার পরিমাণ হয়ত নিতান্ত কম নয় । কিন্তু যে টাকা আজ দশ-বিশ সাল ধরে আগাম নেওয়া হয়েছে রঙলালের কাছ থেকে, ওগুলো শোধ হবে কী করে ? রঙলাল তো থানায় যাবে বলছে । মামলা রুজু করবে প্রত্যেকের নামে । রঙ মেখে সঙ সেজে রঙলালের বিষ-নজরে পড়বার দরকারটা কি ? তাছাড়া রঙলালের আরেকটা কথাও খুব খাঁটি । গাঁয়ের একপাল ডবকা ছুঁড়ি সম্বচ্ছর হিল্লী-ডিল্লী ঘুরে বেড়াবেক একপাল যোয়ান ছগ্‌রার সঙ্গে এ কেমন ধারা কথা !

সুচাঁদ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নড়ে চড়ে বসেছে দশরথ ভক্তা । পুরো ব্যাপারটায় ইতি করে দিতে হবে দু'এক দিনের মধ্যেই ।

গজশিমুল গাঁয়ে 'সাদা কাঁকড়া'র উপদ্রব

এদিকে দিন দুয়েক হল, ঐ বিলাতি মেয়েটা এসে থানা গেড়েছে । ভালুকমুড়া ডুংরীর চুড়োয় কাপড়ের তাঁবু টাঙিয়েছে । সঙ্গে আছে এক বিলাতি মরদ । তার লালপানা মুখে মেহেদী রঙের চাপ দাড়ি । প্রায় সারাক্ষণ হাফ-প্যান্ট আর গেঞ্জি পরেই থাকে ।

তাঁবুর মধ্যে কদাচিৎ থাকে ওরা । সর্বদা টো-টো ঘুরে বেড়ায় যুগলে । ডুংরী, খুলিয়া, জঙ্গলে চক্কর মারে । ঝরনা থেকে টিনের কৌটোয় জল ভরে আনে । দু'জনে ঝরনার জলে উদোম হয়ে সিনান করে একসঙ্গে । খাবার-দাবার, ফিতার খাটিয়া, গোটানো-চেয়ার, লোহার উনুন, এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত রসদ এনেছে কুলির মাথায় চাপিয়ে । মাঝে মাঝে টিনের কৌটো থেকে আজব আজব খাবার বের করে খায় । কাছে-পিঠে কেউ থাকলে দু'এক টুকরো দেয় ।

রোজ ঝিঁঝকা পহর থেকে বেরিয়ে পড়ে দুজনে । বেলা আড়াই-পহর তক্ক শুধু ঘুরেই বেড়ায় । গাঁয়ে-গাঁয়ে, ঘরে-ঘরে যায় । ভাবসাব করে । বাচ্চাদের লজেন্স-বিস্কুট বিলোয় । চড়া দরে মুরগী, ডিম ইত্যাদি কেনে । কোন কোনও দিন ঢুকে যায় নিবিড় জঙ্গলে । ওদের

কাছে বন্দুক-পিস্তল আছে । তাই দিয়ে শিকার মারে । ফিরে এসে ডুংরীর কোলে কেঁদ গাছের তলায় ফিতের চেয়ার পেতে এলিয়ে বসে থাকে দু'জনে । গল্প গুজব করে নিজেদের মধ্যে । শুকনো খাবার খায়, বই পড়ে ... । দুপুর বেলায় ঝর্ণায় গিয়ে সিনান সেরে আসে। বিকেল নাগাদ ভালুকমুড়া ডুংরীর চূড়া থেকে সুগন্ধ ভেসে আসে গজাশিমুল গাঁয়ে । লোহার উনুন ধরিয়ে রান্না চড়ায় ওরা । মাংস ঝলসায়, রুটি সেঁকে নেয় । তারপর, পড়ন্ত বিকেলে কেঁদ গাছের তলায় বসে চলতে থাকে দু'জনের জমজমাট ভোজ ।

গজাশিমুলের মানুষ সন্তর্পণে লক্ষ্য করে যায় ওদের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ । মেয়েটাকে ওরা চেনে । মাস্টারের সঙ্গে দিনকতক আগে এসেছিল একবার । দিন দু'তিন ছিল গাওন দলের অফিস ঘরে । ভাঙা ভাঙা বাংলা বলত, আর কথায় কথায় খিলখিলিয়ে হাসত । মরদটা মেয়েটার স্বামী কিনা বোঝার উপায় নেই । এ দেশের মেয়েদের মত এয়োতির চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করে না ও । কিন্তু দু'জনে যেভাবে থাকে, খায়-দায়, সিনান করে, রাতে একই তাঁবুর মধ্যে ঘুমোয়, স্বামী-স্ত্রী না হলে এমনটা হয় না । কিসের জন্য এসেছে এরা, কেন তাঁবু খাটিয়ে বসবাস করছে, চারপাশে ঘুরে ঘুরে কী অত দেখে, কিছুই জানা নেই গজাশিমুলের মানুষের । ভারি সন্দেহ হয় । ভয় ।

কাস্তো মল্লিকের দু'চোখের কোঁচকানো চামড়া সামান্য খুলে যায় । একজোড়া বিবর্ণ ঘোলাটে চোখ বেরিয়ে আসে !

চাপা গলায় বলে, 'লজর রাখ্ বাপ সকল । এ 'সাদা কাঁকড়া' দুটি যে কি লছনায় আঁইছে, সিট্যা বাবা কানাইশরকে মালুম । অবশ্যি মাস্টারের চিনা লোক । সিটাই রইক্ষা। তব্বো সাবধানের মার নাই বাপ । বাচ্চাগুলাকে চোখে চোখে রাখ । দাগীরা জঙ্গলে সেঁধাও ।'

এরা কিন্তু নির্বিকার ঘুরে বেড়ায় গাঁয়ের মধ্যে । মানুষকে নানান্ কথা শুধোয় । গজাশিমুলের মানুষ কী খায়, কেমন থাকে, কী করে, জঙ্গলের মধ্যে কোনও প্রাচীন মন্দির বা বাড়িঘর আছে কিনা, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সোজাসুজি কদ্দূর যাওয়া যায়, এইসব নিয়ে এদের হাজারো কৌতূহল । মেসিন চালিয়ে সব কথা পটাপট তুলে নেয় । দু'জনেই এ দেশীয় ভাষা একটু একটু বোঝে এবং বলতে পারে, তবে মেয়েটা তুলনায় ঢের বেশি ।

তবে হ্যাঁ, মেয়াটার দিল্ আছে । সেবারো যখন উ এলো মাস্টারের সাথে, তখন গজাশিমুল গাওন পার্টির ঘর বলতে ছিল, পাতায় চাওয়া এক কুঁড়িয়া । পট্ কইর‍্যে দু'হাজার টাকা দিয়ে বলে, ভালো কইরে ঘর বানাও । মাথায় টিন-টালি চাপাও । দরকার হইল্যে আরো দুবো । এখন গজাশিমুল গাওন পার্টির ঘরটিকে ডুংরীর কোলে ঠিক ছবির মত দেখায় ।

সেই কারণেই মেয়াটাকে মুখের ওপর কিছু বলতে পারে না গজাশিমুলের মানুষ । গাঁয়ে ঢুকতে দেয়, ঘরে সেঁধাতে দেয়, কথার জবাব দেয় । তবে সব কিছুর মধ্যেও শিয়রে মায়ের মত জেগে থাকে এক অচেনা ভয় ।

হাজার হোক, 'সাদা কাঁকড়া'তো ।

বসু-শবরের বুকের আগুন

বড় শুকনো দেখাচ্ছিল সুচাঁদকে। মুখখানায় কে যেন এক পোচ কালি লেপে দিয়েছে। দশরথ ভক্তা ওকে নজর করে দেখে। গম্ভীর মুখে বোঝবার চেষ্টা করে ভেতরের অন্দি সন্দি। খবর পেয়ে ছুটে আসে গাঁয়ের লোকজন। দলের সঙ্গীরা। বদন কোটাল, কানচা মল্লিক, রঙী, দুলারীরা।

দশরথ ভক্তা শুধোয়, 'কুথা গেঁইছলু তুয়ারা ?'

খানিক চুপ করে থাকে সুচাঁদ। তারপর মৃদু গলায় বলে, 'আসাম'।

চমকে ওঠে গজাশিমুলের মানুষ, 'ক্যানে ?'

'দিদির খোঁজে।'

ধক করে ওঠে দশরথ ভক্তার বুক। বড় মেয়ে সুবাসী গিয়েছে আসাম মুলুকে প্রায় দশ বছর আগে। দশ বছর ! আর দেখা নাই ওর সঙ্গে। ওর নামটা ক্রমশ ফিকে হয়ে এসেছে মগজে। মুখখানা ঝাপসা হয়ে ভাসে, দু'চোখের সামনে, যেন কত দিন আগের মানুষ, কত দূরের। আকাশের দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকে দশরথ, অনেকক্ষণ। খানিকবাদে বলে, 'কেমন আছে সুবাসী ? ভালা ? বল্। চুপ কইর‍্যোঁ আছু ক্যানে ?'

'জানি নাই।' বিলম্বিত লয়ে মাথা দোলায় সুচাঁদ, 'সে উখ্যেনে নাই। বচ্ছর পাঁচেক আগে ছিল। তারপর রঙলাল উয়াকে কুথায় যে লিয়ে গেঁইছে, সিট্যা কোউ জানে নাই।'

পাথরের মত নিশ্চল বসে থাকে দশরথ ভক্তা। রা' জোগায় না মুখে। বাপ-বেটা যেন এক সঙ্গে বোবা হয়ে যায়।

এক সময় সুচাঁদ বলে, 'গিদ্ধারি জ্যাঠ্যার বউটা মর‍্যে গেঁইছে বছরটাক আগে। সুফল কোটালের দু'পায় দগদগে ঘা। উয়াকে শিকল দিয়ে বেঁইধে রাখত উযারা।'

'ক্যানে' ?

'উ বার দু'তিন পালাই আসতো গিয়ে ধরা পইড়েঁ গেঁইছিল। তা বাদে, জটা, মংলী, পর্বত আর ঝিনুক ভক্তাকে দেখলাম্।'

'কেমন আছে উযারা ?'

চারপাশের জমায়েতের ওপর চোখ বোলায় সুচাঁদ। তারপর ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে। চওড়া ছাতি ওঠানামা করতে থাকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত।

'উয়ারা কোউ মানুষ নাই হে! সব জানোয়ার হয়্যোঁ গেঁইছে। উদয়াস্ত গরুর মতোন খাটালি করে। দিনান্তে আধপেটা খায়। ঝুপড়ি ঘরে শুয়ে রয় আর রাতভর খকর্ খকর্ কাশে। ঝাড়েশ্বর মামুর বড় মেয়া সাবিত্রী রোজ হাজার জনের খিদা মিটায়। আধপেটা খাবারটুকু ছাড়া ওদের মজুরী বাবদ আর সমস্ত টাকাই রঙলাল গিয়ে সরাসরি কুম্পানীর থিকো তুলে লেয়। ঝাড়েশ্বর মামুর মেজ মেয়ে রূপমতীর কুনো খোঁজ নাই। রঙলাল উয়াকে চা-বাগিচায় লিয়ে যায় নাই।'

সুচাঁদ বিতাং করে বলতে থাকে আসামের জংগলে আপনজনদের নারকীয় জীবনের বিত্তান্ত।

অল্পক্ষণের মধ্যে সারা গাঁ-ময় চাউর হয়ে যায় কথাটা। মানুষজন ভীড় করে ছুটে

আসে । গোল হয়ে দাঁড়ায় সুচাঁদ ভক্তার চারপাশে । বহুদিন বাদে রঙলাল গাঁয়ে এলে যেমনটি ভীড় করত তার চারপাশে, তারিয়ে তারিয়ে শুনত আপনজনের সুখের বাখান, আজও তেমনি ভীড় করেছে গজাশিমুলের তাবৎ মানুষ । কিন্তু সে এক অন্য কাহিনী শুনবার •তরে ।

সুচাঁদ শান্ত গলায় বর্ণনা করে যায় তার আসাম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা । বর্ণনা করে ঝাড়েশ্বর কোটালের বড় মেয়ে সাবিত্রীর করুণ জীবনের কাহিনী । কিষ্টো মল্লিক, শীধর মল্লিক, কানাই দিগরের আত্মহত্যার গল্প । নিশি আর চাঁপি ভক্তার শরীরগুলো কেমন করে সন্ধ্যেটি হলেই শেয়াল-শকুনের খাদ্য হয়ে ওঠে, সেটা বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে । আরো বহু মেয়ের হাল হদিশ বলতে পারে না সুচাঁদ । রূপমতী, তারা, যশোদা, খাঁদি, টিয়া, পলাসী, এমনিতরো বহু কিশোরী যুবতী — যারা গত দশ পনেরো বছর ধরে রঙলালের সঙ্গে পাড়ি দিয়েছে কাছাড়ের পথে — তারা যে কোথায় কেমন আছে, জানে না কেউ । আছে, না কি চলে গেছে এ দুনিয়া ছেড়ে, তাও কেউ বলতে পারে নি । তবে সাতদিন আসাম মুলুকে ঘুরে ঘুরে রঙলালের চরিত্রের এক বীভৎস দিক সুচাঁদের চোখের সুমুখে পরিষ্কার হয়ে গেছে । রঙলাল শুধু কুলি-কামিনের আড়কাঠি নয়, সে মেয়ে-চালানীরও ব্যবসা করে । মূলত ওটাই ওর প্রধান ব্যবসা । বিভিন্ন গাঁ-গঞ্জ থেকে যেসব মেয়েদের সে নিয়ে যায় কাজের লালসা দেখিয়ে, তার মধ্যে বেছে বেছে কিছু মেয়েকে সে নিঃশব্দে ঘুরিয়ে দেয় অন্য পথে। অন্য এক জগতের দিকে । কেউ বুঝতে পারে না । সবার অলক্ষ্যে রূপমতীদের মতোই সেসব মেয়ে হারিয়ে যায় নরকের তাল তাল অন্ধকারে ।

নিঃশব্দে শুনতে থাকে গজাশিমুলের মানুষ । দু'চোখ বেয়ে টপটপিয়ে জল ঝরতে থাকে। চোখের জলে বুক ভিজে যায় ।

সজোড়ে কপাল চাপড়াতে থাকে ঝাড়েশ্বর কোটাল । হাঁউমাউ করে বুক ফাটিয়ে কাঁদে। আকুল গলায় চিল-চিৎকার জোড়ে, 'রূপমতী রে —। ও আমার রূপমতী—!' সে আর্তনাদে সারা গাঁ উথাল-পাথাল হয়ে ওঠে । তীব্র মোচড় মারে প্রত্যেকটি নিরুপায় বুকে । ঝাড়েশ্বরের পাগল বউটা ভুলভুল করে ঝাড়েশ্বরকে দেখতে থাকে । কিছুই যেন বোধগম্য হয় না তার। এক সময় ফের ভুট ভুট বকতে শুরু করে আকাশের পানে তাকিয়ে । সাবিত্রী আর রূপমতীকে আসাম মুলুকে পাঠানোর ব্যাপারে প্রথম থেকে তীব্র আপত্তি ছিল ঝাড়েশ্বরের বউয়ের । ঐ নিয়ে ঝাড়েশ্বরের সঙ্গে তার তুমুল ঝগড়া চলেছিল শেষ দিন অবধি । যেদিন রূপমতীরা চলে যাবে, তার আগের রাতে এক বিকট স্বপ্ন দেখেছিল ঝাড়েশ্বরের বউ । সাবিত্রী আর রূপমতী পড়ে গিয়েছে এক গভীর ইদাঁরায় । পাতালের মত গভীর সে ইদাঁরা, ভেতরে চাপ চাপ আঁধার। ঐ অন্ধকার ভেদ করে মেয়ে দুটোকে দেখতে পাচ্ছিল না ঝাড়েশ্বরের বউ, শুধু শুনতে পাচ্ছিল, অন্ধকার পাতাল গহ্বর থেকে ঝলকে ঝলকে ভেসে আসা মেয়ে দুটোর বুক ফাটা কান্না ।

সকালে উঠেই সবাইকে বলেছিল স্বপ্নের কথাটা । আলুথালু কেঁদেছিল বুক ফাটিয়ে। ঝাড়েশ্বরের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধিয়েছিল আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে । এত করেও মেয়ে দুটোকে আটকাতে পারে নি ঝাড়েশ্বরের বউ । কিন্তু ঐ ঘটনার পর থেকে দ্রুত বদলে যেতে থাকে ও । নাওয়া-খাওয়া-ঘুমানো ত্যাগ করে । ধীরে ধীরে ওর মধ্যে পাগলামির লক্ষণগুলো স্পষ্ট

হতে থাকে। আজ তিন-চার বছর ও বদ্ধ পাগল। এখন, দুনিয়া উলটে গেলেও, ওর চোখের পাতনিটিও কাঁপে না।

ধীর গলায় সুচাঁদ বলতে থাকে, 'মাস্টার জবরদস্তি লিয়ে না গেলে আমরা কুনো দিনও জানথ্যম্ নাই ই-সব বিত্তান্ত।'

সারা গজাশিমুলের মানুষও মনে মনে স্বীকার করে সেটা। মাস্টারের প্রতি এক ধরনের গাঢ় কৃতজ্ঞতা বোধে ভরে ওঠে তাদের বুক। দিনভর গাঢ় বিষাদে ডুবে থাকে গজাশিমুলের মানুষ। উনুন জ্বলে না কোনও ঘরে। শুধু বুকের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে। মাঝে মাঝে এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে ভেসে আসে কান্নার আওয়াজ।

সন্ধ্যেবেলায় ষোল আনার মিটিং বসে। সুচাঁদ বলে, 'কাঁদা কাটা লয়। আমরা ইয়ার বদ্‌লা লিবো।'

'কী কইরে বদ্‌লা লিবি ?' সারা গাঁ যেন থমকে দাঁড়ায়।

'ইয়ার পর রঙলাল এ গাঁয়ে সেঁধালে, উয়ার সাথ মুকাবিলাটা হব্যেক আমাদের।'

'কী মুকাবিলাটা হব্যেক্ রে ?'

'উয়াকে আটক্ রাখব আমরা। যাদের হালহদিশ পাই নাই, উয়াদ্যার না ফেরত পাওয়া তক্ক উয়াকে নাই ছাড়ব।'

'ঠিক। উয়াকে কড়িকাঠে টাঙাই দিয়্যে জলবিছাতি দিব্যা হব্যেক্।'

'চিত কইর্যে ছাতিতে আগুন-মাল্‌সা।'

'সর্ব অঙ্গে বাঁশ-ডলাই।'

'উয়ার পাছা দিয়ে হুড়কা সেঁধ করাব আমরা।'

সীমাহীন আক্রোশে রঙলালকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে থাকে গজাশিমুলের মানুষ। তাদের সর্ব ইন্দ্রিয় নিশপিশ করে ওঠে বদলা নেবার জন্য।

এরপর একটিবার, শুধু একটিবার গাঁয়ে ঢুকুক রঙলাল !

'সাদা কাঁকড়া'র কবলে

দশরথ ভক্তার উঠোনে বসে গেছে ক্যাথি বার্ড। পাশে জনসন। জমিয়ে গল্পগাছা শুরু করেছে।

কথায় কথায় বসু-শবরদের মেলা-পার্বনের প্রসঙ্গ ওঠে। কানাইশর জীউর কাহিনী, 'আগুন-বরণের' ... শুনতে শুনতে চোখ চকচক করে ওঠে ওদের, আর, বলতে বলতে ভয়ে -ভক্তিতে গদগদ হয়ে ওঠে কান্তো মল্লিক।

জনসন মৃদু গলায় শুধোয়, 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার ?'

মাথা দুলিয়ে সায় দেয় ক্যথি বার্ড, 'প্রফেসর তো তাই বলেছে। এই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সীমাহীন নিবিড় জঙ্গল ছিল। ভালুক, বনবরা আর চিতা তো হামেশাই দেখা যেতো। নেকড়ে আর হুঁড়ারতো এখনও আছে। 'রয়েল বেঙ্গল' আসতো মূলত উড়িষ্যার দিক থেকে। বনচারী মানুষের আতঙ্ক ছিল ওরা। মাঝে মাঝে পথচারী দলের দু'একজনকে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে যেতো। রয়েল বেঙ্গল তুমি দ্যাখোনি। আমার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে সুন্দরবনে। সে কি গর্জাস আর ম্যাগনিফিসেন্ট ! কি বিশাল, ভয়ঙ্কর আর সুন্দর !'

অতঃপর 'আগুন-বরণ' নিয়ে আলোচনা শুরু হয় দশরথ ভক্তাদের সঙ্গে।

জনসন শুধোয়, 'এ তল্লাটে রয়েল বেঙ্গল জাতের বাঘ দেখা যায় এখনও ?'

ক্যাথি বলে, 'খুবই কম।'

'সত্যিকারের বাঘ লয় আইজ্ঞা।' দশরথ ভক্তা চোখ বড় বড় করে বলে, 'উনি হইলেন অলীক বাঘ। আসলে, স্বয়ং কানাইশর জীউ। ব্যাঘ্র বেশে লীলা।'

শুনে দু'জনে কলকল করে হেসে ওঠে। কি সব 'হ্যাট্-ম্যাট্' করে কথা বলতে থাকে নিজেদের ভাষায়।

একটু বাদে জনসন শুধোয়, 'তোমাদের টাইগার-ঠাকুরকে এই রাইফেল দিয়ে মারা যাবে না ?'

দশরথ ভক্তা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তাকায় রাইফেলটার দিকে। বলে, 'উয়ার আগে আপনার বন্দুকটা আইজ্ঞা ফেইট্যে চৌচির হইয়েঁ যাবেক্।'

শুনে ছোকরার কি দম ফাটানো হাসি !

ক্যাথি বার্ড বলে, 'এসব হল লেখাপড়া না জানার ফল, বুঝলে মুরুব্বি, এখানে একটা ইস্কুল গড়ব আমি। বাচ্চারা পড়বে সেখানে। সন্ধ্যে বেলায় বড়রাও।'

শুনে দশরথ ভক্তার ভাবনার আকাশে এক টুকরো কালো মেঘ। দশরথের মনে হয়, ওদের জব্দ করবার জন্য এই বিলাতী মেয়েটার এও এক নতুন ফন্দি। কারণ, বসু-শবর জাতে কে আবার কবে পড়া-লিখা শিখেছে ? একমাত্র ব্যতিক্রম ওর বেটা সুচাঁদ। সে পড়ালিখা শিখেছে পুরুল্যা জিলার চিরুড়ির ইস্কুলে। একদিন চিরুড়ি থেকে খুঁজে খুঁজে লোক এল গজাশিমুল গাঁয়ে। সঙ্গে ছিল লাচনহাটির পঞ্চা কোটাল। দূর সম্পর্কে দশরথের শালা। বলল, তুমার গাঁ'র দশটা ছেইলাকে লিয়ে যাব চিরুড়ি। উয়ারা সিখ্যেন থিক্যে গরমেটের পইসায় পড়া-লিখা শিখবেক্। কথাটা নিমেষের মধ্যে রটে গেল সারা গাঁয়ে তার ফল যা হল, সে আর কহতব্য লয়। গাঁয়ের সব উঠন্তি বাচ্চার দল জঙ্গলে সেঁধাল। দুদিন আর ঘরমুখো হল না তারা। কেবল দশরথ ভক্তাই সাহকে বুক বেঁধে সুচাঁদকে তুলে দিল শালার হাতে।

সুচাঁদ গিয়ে ভর্তি হল চিরুড়ির ইস্কুলে। সেখানে লোধা খেড়িয়া, শবরদের ছেলেকে বিনা পয়সায় পড়ায় গরমেট্, খাবা-দাবা দেয়, কাপড় চোপড়ও।

সুচাঁদ ওই চিরুড়ির হুটেলে (হোস্টেলে) ছিল বহুত দিন। বছরে একবার ঘর আসত, মাসটাক থাকত। তার গায়ে-গতরে চিক্সানি লেগেছিল। বসু-শবরের বাচ্চাদের মত খড়ি ওঠা গা' নয়। কেমন তেল তেলে শরীর। চুলে সিঁথা। জামা-গেঞ্জি, পেন্টালুন পরে আসত সে। তখন সুচাঁদকে বসু-শবর জাতের আর দশটা বাচ্চার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বলে মনে হত। কেমন ভদ্দর লোক, 'কাঁকড়া'দের বাচ্চা, বলে মনে হত ওকে। অনেক নৈতন কথা শোনাত ও। কেবল একটাই বদ্গুণ রপ্ত হয়েছিল তার। খিদে সে একদম সইতে পারত না। ছুটি-ছাঁটায় এলে তাই অষ্ট প্রহর কেবল 'খাই-খাই' করত। দশরথ ভক্তারা শুনে তাজ্জব, রেগে কাঁই। বসু-শবরের ছা হয়ে তুমি ভোখ খিঁচতে পারবে নাই ? এ কেমন ধারা কথা।

দশরথ ভক্তা ছেলেকে মাঝেমাঝেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত। ওর হোস্টেলের হাজারো খোঁজখবর নিত। সুচাঁদ সবকিছু গড়গড় করে বলে যেত। রোজ তিন-চার টাইম ভরপেট

খাওয়া, বছরে চারটে প্যা'ন্ট দুটো গেঞ্জি দুটো পিরাণ একটা গামছা, আর রোজ বিকাল বেলা বল খেলা...। তা বাদে, সরস্বতী পূজা, স্বাধীনতা দিবস... বেন্দে মাতোরম্... পতাকা, বুদিয়ালাড়ু ... মজা ঢের ।

শুনতে শুনতে চোখ কপালে উঠে যায় গজাশিমুলের মানুষের । অবাক হয়ে ভাবে ঐ আজব দুনিয়ার কথা । শুধু শুধু পরের ছেলেকে নিয়ে গিয়ে কেন যে জামাই-আদরে রাখেন বাবুরা ? কী যে উদ্দেশ্যে বাবুদের মনে, ভগবান্‌কে মালুম ।

দশরথ ভক্তা সুচাঁদকে শুধোয়, 'হুঁ' বে সুচাঁদ, তুয়াকে যে তিনবেলা খাবায়, কাপড় চোপড় পরায়, তার বদলে খাটায় না বাবুরা ?'

'খাটায় না ফের !' সুচাঁদের চোখে-মুখে তীব্র বিরক্তি, 'শুধু-মুদু খাবায় পরায় নাকি ?'

'বটে তো । শুধু-মুদু কোউ কারো তরে কিছো করে ফের এ দোনিয়ায় !'

'তো, কী কী কত্তে হয় তুয়াকে ?'

'খাবা-পরার বদলে আমাকে উয়াদ্যার বইগুলান পইড়ে দিতে হয় । দৈনিক সকালে-সইন্‌ঝায় । একগাদা বই ফুরালে, ফের একগাদা বই দেয় । গাদাগাদা বই পড়াঁই পড়াঁই জাহান্‌টা মেইরে দিল্যাক্ ।'

এতক্ষণে যেন জ্ঞানচক্ষু ফোটে গজাশিমুলের মানুষের । তাই ত বলি, শুধু মুদু ফের কোউ খাবায়-দাবায় আজকাল দিনে ?

তাও বহু দিগদারি সহ্য করে, সুচাঁদ ভক্তা চিরুড়িতে ছিল । থাকা-খাওয়া, জামা-কাপড়ের বিনিময়ে বাবুদের বহুত বই পড়ে দিয়েছে সে । অবশেষে একদিন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে । তখন তার বয়েস আঠারোর কম নয় ।

বিলাতী মেয়েটা সেই রকমের একটা ইস্কুল গড়তে চাইছে গজাশিমুল গাঁয়ে । সুচাঁদই হবে মাস্টার । মাসে মাসে মাইনা পাবে সে । যে ক'দিন ইস্কুলটা আনুষ্ঠানিক ভাবে না খুলছে, নিজেই একটু-আধটু মহড়া দেবার জন্য, গাঁয়ের দু'চারজন বাচ্চাকে নিয়ে টানা হেঁচড়া জুড়েছিল ক্যাথি বার্ড । বে-গতিক দেখে সবাই ঢুকে পড়েছে জঙ্গলে । দিনভর গাছে-পালায় বসে থাকে । বনের ফল-পাকুড় খায় । সন্ধ্যের আঁধারে ফিরে আসে ঘরে । ফের ভোর হলেই পালায় । বিলাতী লোকগুলো না গাঁ' ছাড়া অবধি আর গৃহবাসী হবে না । কোনও ভাবেই 'সাদা-কাঁকড়ার' কবলে পড়তে চায় না ওরা ।

৮. প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যৌথ ফোক-আন্দোলন

রাজীব যখন গজাশিমুল গাঁয়ে পৌঁছুল, তখন দুপুর গড়িয়ে এসেছে । ঝরনার দিক থেকে ক্যাথি ফিরছিল ডুংরীর দিকে । রাজীবকে দেখে কলকলিয়ে উঠল, 'উহ্, কোথায় গিয়েছিলে তুমি? এদিকে তোমার জন্য অপেক্ষা করে করে আমাদের যে কি অবস্থা ! চল, চল, জলদি তাঁবুতে চল । অনেক জরুরী কথা আছে ।'

'তোমরা কবে এলে ?'

'প্রায় এক সপ্তাহ্ হতে চলল । তোমার তো এক সপ্তাহ্ আগে ফেরার কথা । কোথায় গিয়েছিলে ?'

রাজীব একটু ভাবে । বলে, 'আমি একটুখানি আসাম থেকে ঘুরে এলাম ।'

'কেন ? এনি কনট্রাক্ট ?'

মাথা নাড়ে রাজীব, 'না । একেবারে অন্য কারণে । বলব পরে ।'

শেতাঙ্গ তরুণটি কেঁদ গাছের তলায় ফিতে-চেয়ারে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল । ডুংরীর চুড়োয় উঠে চিৎকার করে ওঠে ক্যাথি, 'হেই, জনসন, দ্যাখ কে এসেছে !' রাজীবের দিকে তাকায় ক্যাথি, 'মিট মিঃ জনসন । পেনসিলভেনিয়া য়্যুনিভার্সিটি থেকে দর্শনে মাস্টার ডিগ্রি করেছে ।'

জনসনের লম্বা বিশাল পুরুষালি চেহারা । পাতলা চাপ দাড়ি, মেহগনি রঙের । কটা রঙের উজ্জ্বল চোখ । সারা শরীর জুড়ে তারুণ্যের দ্যুতি । ওকে একদৃষ্টিতে দেখছিল রাজীব । দেখতে দেখতে চমৎকৃত রাজীব এগিয়ে গিয়ে জনসনের সঙ্গে হাত মেলায়, 'কেমন লাগছে এই বনবাস ?'

'ফাইন !' জনসন জিভের সঙ্গে টাকরার মিলন ঘটিয়ে বিচিত্র আওয়াজ তোলে ।

'জনসন ফ্রি-লান্স জার্নালিজম্ও করে' ক্যাথি বলে ওঠে, 'আমেরিকার কয়েকটি কাগজে মাঝে মধ্যেই ফিচার লেখে । তোমার একটা ইনটারভিউ নেবে ও ।'

শুনে মোলায়েম হাসে রাজীব । জনসন কয়েকটা ছবি তোলে রাজীবের । ক্যাথি বলে, 'ইনটারভিউ নেবার আগে আমরা গুটিকয় কাজের কথা সেরে নিই ।'

রাজীব মৃদু হেসে বলে, 'বেশ তো ।'

তাঁবুর মধ্যে ঢুকে একখানা সুদৃশ্য খাম নিয়ে আসে ক্যাথি । এগিয়ে দেয় রাজীবের দিকে।

'এই নাও, ইস্ট-ওয়েস্ট ফোক ফাউণ্ডেশনের ডিরেক্টর ড. ওরিন পোর্টার তোমায় চিঠি লিখেছেন ।

চিঠিখানা আদ্যপ্রান্ত পড়ে রাজীব । এক দুর্লভ প্রাচীন সংস্কৃতি আবিষ্কার করবার জন্য রাজীবকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন ড. পোর্টার । এই ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীতে মানুষের প্রাচীন চর্চাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা যে কত জরুরী সে বিষয়ে লিখেছেন অনেকখানি । সবশেষে আসল কথাটা পেড়েছেন । ইস্ট-ওয়েস্ট ফোক ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতায় বাঁকুড়া জেলায় একটি ফোক রিসার্চ সেন্টার খোলার প্রস্তাব রেখেছেন ড. পোর্টার । এ বিষয়ে রাজীবের অকুণ্ঠ সহযোগিতা প্রর্থনা করেছেন ।

চিঠি থেকে মুখ খোলে রাজীব । বলে, 'কী করতে চাইছ বলতো ?'

ক্যাথির চোখে অসংখ্য দ্যুতি । ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, 'অনেক প্ল্যান রয়েছে মাথায় । আপাতত বাঁকুড়ায় অনেকখানি জমি চাই । সেখানে সেন্টারের বাড়ি-ঘর হবে, সেমিনার-হল, ওয়ার্কশপ, লাইব্রেরি, গেস্ট হাউস, ফোক-মিউজিয়ম, —আরো অনেক অনেক কিছু—।'

বলতে বলতে কেমন যেন মিইয়ে যায় ক্যাথি, 'কিন্তু সবই তো নির্ভর করছে তোমার ওপর ।'

'আমার ওপর ? সব নির্ভর করছে ?'

'নিশ্চয় ।' আদুরে গলায় বলে ওঠে ক্যাথি, 'তুমি যদি সেন্টারটার দায়িত্ব নিতে না চাও !'

'আমি !' রাজীব যেন অল্প চমক খায়, 'তুমি থাকতে, আমি !'

নীল চোখে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় ক্যাথি। আরো আদুরে হয়ে ওঠে মুখ, 'আমি কি আর বারো মাস তিরিশ দিন থাকতে পারব এখানে ? আমি রয়েছি পুরো ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ার দায়িত্বে। আমাকে পুরো এলাকা চষে বেড়াতে হয়। হেড অফিসের সঙ্গে অহরহ যোগাযোগ রাখতে হয়। আমি হয়ত মাসে এক-আধবার এলাম—।'

'কিন্তু এখানে ফোক রিসার্চ সেণ্টার গড়বার কথা তোমাদের মনে হল কেন ?'

'বা-রে, তুমিই তো বলেছ, এই এলাকাটা নাকি 'ফোক্'-এ ঠাসা। টুসু, ভাদু, ঝুমুর, পাতানাচ, কাঠিনাচ... আরো অনেক সম্পদ নাকি ছড়িয়ে রয়েছে এই এলাকার মাটিতে। আমরা যদি এই সেণ্টারের সঙ্গে পুরুলিয়াকে জুড়ে নিই...। আমাদের প্রথম কাজ হবে, সারা এলাকার হারিয়ে যাওয়া ফোকগুলোকে খুঁজে খুঁজে সংগ্রহ করা এবং ঐ ফোকগুলোকে যারা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের আইডেণ্টিফাই করা। দ্বিতীয় ধাপের কাজ হল, উপযুক্ত 'এইড' দিয়ে ফোকগুলোকে ফের চাঙ্গা করে তোলা। দুনিয়ার সামনে ওগুলোকে তুলে ধরা। আমাদের তৃতীয় কাজ হল —।'

রাজীব মন দিয়ে শুনছিল। ক্যাথির মুখ আবেগে উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে, রাজীব দেখল।

বলল, 'টাকা ছড়িয়ে ফোককে বাঁচানো যায় না মিস বার্ড। প্রচণ্ড গতিশীল দুনিয়ায় ফোক ভুগছে অন্য বহুতর সমস্যায়।'

'জানি।' মুখের কথা কেড়ে নেয় ক্যাথি বার্ড, 'সেসব কথাও আমরা ভেবেছি। সবকিছুকে মাথায় রেখে একটা দীর্ঘমেয়াদী মাস্টার-প্ল্যান বানাতে চাই আমরা। একটা ইনটেনসিভ সার্ভে প্রোগ্রামও নেব। তারপর শুরু হবে তৃতীয় পর্যায়ের কাজ। ততদিনে ঐ সেণ্টারটিও কলেবরে অনেক বাড়বে। তৈরী হয়ে যাবে রিসার্চ-সেল, মিউজিয়াম, লাইব্রেরি, আরো অনেক কিছু থাকবে। পাশাপাশি, সেণ্টারেরই নেতৃত্বে চলবে সারা এলাকা জুড়ে আমাদের সোস্যাল এবং রিলিফ প্রোগ্রাম। সেই প্রোগ্রামে কিছু রাস্তাঘাট হবে, ইস্কুল হবে, মেডিকেল এইড় সেণ্টার হ্যাণ্ডিক্রাফট্ ইউনিট—। আরো অনেক অনেক স্বপ্ন রয়েছে আমার। বলব তোমায় পরে পরে। কিন্তু তার আগে তুমি বল, আমাদের সঙ্গে পুরোপুরি তোমায় পাচ্ছি কিনা। কারণ তোমাকে না পেলে —।'

রাজীব কথা বলছিল না। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আকাশের দিকে। ক্যাথি বার্ড-এর কথাগুলো তার কানে ঢুকছিল কিনা তাও বোঝা যাচ্ছিল না।

সহসা কথা থামিয়ে ক্যাথি বার্ড শুধোয়, 'কী ভাবছ, প্রফেসর ?'

রাজীব যেন সহসা হুঁশে ফিরে আসে। বলে 'ভাবছিলাম অনেক কিছুই।'

ক্যাথি বার্ড কটমট করে তাকায়। কপট রোষে বলে, 'তুমি নিশ্চয়ই আমার প্ল্যানটাকে পুরোপুরি ইউটোপিয়ান ভাবছ !'

মুচকি হেসে রাজীব বলে, 'আমি ওসব ভাবছি নে।'

'তা হলে, নিশ্চয়ই ভাবছ, আমরা কোনও ধান্দাবাজী করতে চাইছি।'

'আমি তাও ভাবছি নে।'

'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তুমি উল্টোপাল্টা কিছু ভাবছ।'

'তোমার মধ্যে গিলটি-কনসাস্‌নেস কাজ করছে, তাই অমন মনে হচ্ছে ।' রাজীব বলে, 'সে যাগগে । কিন্তু আমি ভাবছি, তোমাদের 'মল্লভূম ফোক সেন্টার' এর সম্পাদকগিরি করবার সময় কি হবে আমার ? আমার বলে এখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল গোছের অবস্থা । রঙলালকে হটাতে গিয়ে আমি যে ওদের হাড়িকাঠে মাথা গলিয়ে বসে আছি । এখন গজাশিমুল গাঁয়ের ঐ বত্রিশটা পরিবারের ভরণপোষণের দায়টা বলতে গেলে, পুরোপুরিই আমার ঘাড়ে চেপেছে ।'

'ওহ্, প্রফেসর,' ক্যাথি বার্ড ঈষৎ অসহিষ্ণু গলায় বলে, 'তুমি আমাদের ফোক্ সেন্টারের মাধ্যমেই ওদের কাজ কর না । কে আটকাচ্ছে তোমায় ?' বলতে বলতে রাজীবের হাত দুটো চেপে ধরে ক্যাথি, 'প্লিজ প্রফেসর, তুমি আর না করো না । আমি ড. পোর্টারকে প্রায় কথা দিয়ে এসেছি । জনসন, বোকা ছেলে, দেখছ কি অমন ফ্যাল ফ্যাল করে ? চটপট একখানা ছবি তুলে নাও । 'দ্য ফোক' পত্রিকার পরের ইস্যুর কাভার-পেজ হবে ওটা । 'প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যৌথ ফোক্ আন্দোলন'—দারুণ ক্যাপ্সন হবে !'

জনসন চটপট শাটারে আঙুল ছুঁইয়ে চাপ দিয়েছে ততক্ষণে ।

ক্যাথি বার্ড-এর ধবধবে শাঁখের মতো হাত দুটো থেকে নিজের হাতখানা ধীরে ধীরে টেনে নেয় রাজীব । বলে, 'আমাকে একটুখানি ভাবতে দাও মিস্ বার্ড ।'

'কেন ? অতো ভাবাভাবির কি আছে ?'

'আছে ।' রাজীব নিরুত্তাপ গলায় জবাব দেয়, 'প্রথমত, তোমাদের পশ্চিমের কাজ কারবার নিয়ে আমার মনে ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে । তোমরা যে কখন্ কিসের জন্য, কী কর, আমাদের মতো মানুষের তা মাথায় ঢোকে না । দ্বিতীয়ত, আমার হাতে এই মুহূর্তে কিছু জরুরী কাজ রয়েছে । সেগুলো শেষ না করলে—।'

ক্যাথি বার্ড পলকহীন চোখে রাজীবকে জরীপ করছিল । বলল, 'তোমার প্রথম আপত্তির জবাবে এই মুহূর্তে আমি কিছুই বলতে চাইনে । ও কথার জবাব ধীরে ধীরে তুমি পাবে । তোমার এই মুহূর্তের 'জরুরী কাজগুলো' একটু ডিটেল্‌স-এ জানতে পারি কি ?'

'তা পার।' রাজীব বলে, 'আমি দিন কয়েক আগে আসাম থেকে ফিরেছি । সেখানে কুলি-কামিন্‌দের যে নারকীয় জীবন দেখে এলাম তা শুনলে তোমার পক্ষেও চোখের জল রোখা অসম্ভব হবে । সেই কারণেই, এখন আমার একমাত্র কাজ, কী করে, কত তাড়াতাড়ি রঙলালকে এ গাঁ থেকে চিরকালের মত তাড়ানো যায় ।

ক্যাথি বার্ড বলে, 'রঙলালকে জলদি তাড়াতে হলে আমার প্রস্তাবেই তোমার সায় দেওয়া উচিত । ভেবে দ্যাখ, শুধু বাইরের বায়নার ভরসায় একটা পুরো গ্রামকে স্বাবলম্বী করার চিন্তা বাতুলতা । এদের জন্য অ্যাডিকোয়েট ফিনান্‌সিয়াল হেলপ্ চাই । শুধু তাই নয়, এদের এডুকেশন চাই, চিকিৎসার বন্দোবস্ত চাই । আমাদের প্রোগ্রামে সব কিছুরই ব্যবস্থা রয়েছে ।'

রাজীবকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল । বলে, 'আমাকে একটুখানি ভাববার সময় দাও, প্লীজ—।'

আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিল রাজীব, তার আগেই তার চোখ পড়ে ডুংরীর তলায়। ওর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে ক্যাথি বার্ড এবং জনসনও তাকায় নীচের দিকে ।

ডুংরীখানাকে দক্ষিণ ও পুব দিকে বেড় দিয়ে একখানি লাল কাঁকুরে রাস্তা এঁকে বেঁকে চলে গেছে ছ্যাঁদাপাথরের দিকে । ওরা দেখল, ঐ রাস্তা ধরে পিঁপড়ের মত সার বেঁধে এগিয়ে চলেছে জনা চার-পাঁচ মানুষ । তাদের পরণে খাকি পোশাক । মাথায় টুপি ।

সাইকেলে চড়ে চলেছে ওরা । ঠিক গজাশিমুল গাঁয়ের দিকে নয় । রাস্তাটা গাঁয়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে পুণ্যাপানির দিকে ।

এদিকে নানা কারণেই মাঝে মাঝে আসে ওরা । পুণ্যাপানির অঘোর রায়ের কিংবা পচাপানির সিংহবাবুদের দালানে গিয়ে ওঠে । ওদের জন্য জমজমাট খানাপিনার বন্দোবস্ত হয় । মদ-মাংসের বিপুল আয়োজন । সিংহবাবুরা সুযোগ মত মন্ত্র দিয়ে দেয় কানে, এলাকার কাকে কাকে টিট করা দরকার ।

আজ বোধ হয় অঘোর রায়ের বাড়িতেই থাকবে এরা রাতে । এই অবেলায় আর রানীবাঁধে ফিরে যাওয়া অসম্ভব ।

নেহাতই ফূর্তি মারতেই হয়ত এসেছে এরা, তবুও রাজীবের চোখে মুখে ফুটে উঠল গাঢ় দুশ্চিন্তার ছায়া ।

এল ধর্মরাজের ঘোড়া

কিনাবনী পুকুরের পাড়ে রঙলালকে দেখে ভীষণ চমকে ওঠে কান্‌চা মল্লিক । পেছনে একপাল খাঁকি । ভালুকমুড়া ডুংরীর ওপারে সূর্য তখন পশ্চিম গগনে সামান্য হেলেছে । কান্‌চা মল্লিক চিল-চিৎকার সহযোগে দৌড় মারে গাঁয়ের ভেতর । রঙলাল আঁইছে হে—! সাথে পুলুশ । হুই ভাল, কিনাবনীর দখিন পাড়ে ।

মুহূর্তে সোরগোল পড়ে গেল সারা গাঁয়ে । কে যে কোথায় সেঁধাবে, তার দিক দিশা পায় না ।

পাড়ার মাঝবরাবর এসে থামে রঙলাল । সামনে আঙুল তাক করে বলে, 'এটাই সুচাঁদ ভোক্তার মাকান্ হুজৌর ।'

বড়বাবু মাথার টুপি খুলে হাতে রাখেন । দীর্ঘ চড়াই-উতরাই করে তিনি ঘেমে নেয়ে একসা ।

এগিয়ে গিয়ে সুচাঁদ ভক্তার উঠোনে দাঁড়ায় রঙলাল । হাঁক পাড়ে জোরসে, 'হো মুখিয়া, মুখিয়া হো ? সুচাঁদ বেটা ? ঘরমে হ্যায় ? আবে, থানাসে বড়বাবু এলেন । বাহার আ বেটা ।'

সুচাঁদ ভক্তা ঘরে ছিল না । সে ছিল ঝাড়েশ্বর কোটালের দোরে । ওখানে বসেই শুনতে পেয়েছে বড়বাবু আগমনের খবর ।

গজাশিমুলের মানুষ এখন যেন খেদাড় খাওয়া মুষা । লুকোবার গর্ত খুঁজছে প্রাণপণে। রঙলালের উপর আক্রোশটা কখন জানি কর্পূরের মত উবে গ্যাছে । তার বদলে ভয় । বড়বাবু স্বয়ং অতখানি পথ পায়দলে উজিয়ে এসেছেন ! সঙ্গে ফের রঙলাল । পুরা গাঁ'টাই না বাঁধা পড়ে আজ । আজ আবার মাস্টার নেই । বেগতিক বুঝে গজাশিমুলের মানুষ নিঃশব্দে পিছলি কাটে । এক দৌড়ে ঢুকে পড়তে চায় জঙ্গলে । সেঁধিয়ে যেতে চায় খুলিয়ার গভ্‌ভরে।

সুচাঁদ এমনটাই আশা করছিল । গজাশিমুলের মানুষকে সে আজীবন চেনে । সরল এবং ভীতু এই মানুষগুলোর মনের রঙ ঘনঘন বদলায় । সেদিন ষোল-আনার মিটিং-এ

রঙলালকে টাঙানোর হুঙ্কার এরাই ছেড়েছিল। ঐ হুঙ্কারে কোনও খাদ ছিল না। আজ আবার পুলিশ দেখে ভয়-তরাসে লুকোতে চায়। এই ভয়ের মধ্যেও কোনও খাদ নেই।

সুচাঁদ ওদের সামনে গিয়ে পথ আগুলে দাঁড়ায়। বলে, 'পালাচ্ছু ক্যানে তুয়ারা ? চুরি-ডাকাতি-খুন করি নাই। তেবে পালাবার কি হইল্যো বটে ? বরং পালালেই বেশী সন্দেহ কইর্‌বেক্ বড়বাবু। ভাববেক্, কি না কী দোষ কইরেছে গজাশিমুলের মানুষ। এ বরং ভালাই হয়্যেঁছে। রঙলালের নামে মেয়া চলানীর লালিশটা থানায় গিয়ে কইর্‌তে হইত্যো। ইখন বাড়ি বইয়্যে আঁইছেন বড়বাবু। সক্কলে জোটোপোটো হইয়্যে একসাথে জানাও দেখি আজ্জি। ক্যামন না শুইন্যে চইল্যে যায় বড়বাবু।'

সুচাঁদের ভাষণটা মন দিয়ে শোনে গজাশিমুলের মানুষ। তাও ভয়-ভয় চোখে তাকায়। সন্দেহে দোলে। কি বলে এই অবোধ ছগ্‌রা ? পুলুশ ফের ছুটো লোগদ্যার আজ্জি শুইন্‌বেক? তাও রঙলালের নামে ? উয়ার বলে কত্তো লোকের সাথ উঠাবসা। কত্তো উপর মহলে আনাগোনা। কোর্ট-কাচারি, থানা-পুলুশ সব ওর পকেটের মধ্যে থাকে। রঙলালের নামে আর্জি শুনবেক্ বলে অতোটা পথ পায়দলে এসেছেন বড়বাবু ?

সুচাঁদ তবুও সাহস জোগাতে থাকে সমানে। সকলের ভবিষ্যতের দায়িত্ব নিজে নিতে চায়।

একজন দু'জন করে ধীরে ধীরে কিছু লোক জুটল বড়বাবুর চারপাশে। কিছু লোক তাও জঙ্গলে গিয়ে সেঁধাল।

রঙলাল চরকির মত ঘুরছে। ছুটে গিয়ে দশরথ ভক্তার বাড়ি থেকে একখানা দড়ির খাটিয়া নিয়ে এসেছে সে। পেতে দিয়েছে ভুঁয়াশ গাছের ছায়ায়। দড়ি-বালতি নিয়ে পাথর-কুয়ো থেকে ঠাণ্ডা পানি তুলে এনে ধরে দিয়েছে বড়বাবুর সুমুখে।

জলটল খেয়ে বড়বাবু বললেন, 'মুরুব্বিদের ডাকো। এইসব চ্যাংড়াদের সঙ্গে কথা বলব নাকি ?'

একে একে মুরুব্বিরা এল। দশরথ ভক্তা, ঝাড়েশ্বর কোটাল, কিনু কোটাল, বান্‌ছা দিগর। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত সেরে বসল বড়বাবুর পায়ের তলায়, ফাঁকা ভূঁইতে।

এখন বিকেল হলেও রোদ্দুরে উত্তাপ খুব। ঝলা বাতাস। রঙলাল পেছনে দাঁড়িয়ে হাওয়া করতে লাগল বড়বাবুর মাথায়।

দশরথ ভক্তার দিকে তাকিয়ে বড়বাবু শুধোলেন, 'কি হে, বুড়ো, রঙলাল তোমাদের গাঁয়ে ঢুকতে পারছে না কেন ?

দশরথ বুড়া বার-দুই ঠোঁট চাটে। একপলক তাকায় রঙলালের দিকে। তোবড়ানো মুখের মধ্যে অলবল করে ঘুরে বেড়ায় জিভ।

বড়বাবু বলেন, 'তোমরা ওকে ভয় দেখিয়েছ কেন ?'

দশরথ ভক্তা একটুক্ষণ থেমে বলে, 'ভয় হজুর, মনের বস্তু। মনের মধ্যে উয়ার বসবাস। আমরা বাইরের থিক্যে কি কইরে উয়ার অন্দি-সন্দি জানব আইজ্ঞা ?' ধীরে ধীরে পুরো পটভূমিটাই খোলসা করে ব্যাখ্যা করে দশরথ ভক্তা।

'এ গাঁয়ের বহুৎ ছগ্‌রা-ছুগরীকে চা-বাগিচার কামে লিয়ে গিছে রঙলাল। আজতক্ উয়াদ্যার কুনো হদিশ নাই। আমার ব্যাটা সুচাঁদ গিছলো আস্‌াম মুলুকে। উ খুঁইজে খুঁইজে হায়রান। আমাদ্যার সন্দেহ, এ পিচাশ উয়াদ্যার বিকেঁ দিয়েছে কুনো তেপান্তরে। এখন পাছে

আমরা আমাদ্যার মেয়া ফেরত চাই, সেই ডরেই হয়তো বা—।'

বড়বাবু রঙলালের দিকে তাকালেন, 'বল তো রঙলাল, এত বছর বাদে আজ হঠাৎ এ গাঁয়ে ঢুকতে ভয় পাচ্ছ কেন ?'

'আমাকে জানে মেরে দিবে হুজুর। দশরথের বেটা সুচাঁদ ভক্তা আভি লিডার বনেছে। আপনি তো সব কুছু শুনেছেন দেওতা।'

সুচাঁদ ভক্তার দিকে তাকালেন না বড়বাবু। জমায়েতের ওপর দৃষ্টিটা কম্পাসের মত ঘুরিয়ে বললেন, 'খুন করাটা খুব সোজা, তাই নয় ? দেশে আইন-কানুন নেই ? আমরা সব মরে গেছি ?' বলতে বলতে চারপাশে চোখ চারাচ্ছিলেন বড় বাবু, 'কই, তোদের সেই মাস্টার কই ?'

দশরথ ভক্তা বলে, 'মাস্টার তো এ গাঁয়ের বাসিন্দা লয় আইজ্ঞা। উনি অবরে-সবরে আসেন। ছেইলা-ছগ্‌রাদের লাচ-টাচ দেখেন।'

'তোদের নাচান্‌ও।' বড়বাবু চোখ নাচিয়ে বলে ওঠেন, 'ওর কথায় তোরা নাচিস। উনি বসে বসে মজা দেখেন। কাগজ-পত্তর সব রেডি করছি। ওসব নক্‌শাল-ফকশালকে আমি এক রুলের গুঁতোয় একেবারে খেঁকশ্যাল করে ছাড়ব। ল্যাজ গুটিয়ে পালাবার পথ পাবে না বাছাধন !'

গুম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে গজাশিমুলের মানুষ। নিঃশ্বাস ছাড়ে সন্তর্পণে।

'সুচাঁদ ভক্তা কে ? সেই নয়া লিডার ?'

ভীড়ের মধ্য থেকে এগিয়ে আসে সুচাঁদ ভক্তা।

'ও তুমি ?' বড়বাবু যেন ভেংচি কাটেন, 'মোড়লের বাটা মোড়ল ! এ গাঁ'টা কি তোমার পৈতৃক সম্পত্তি না কি হে ? যে কেউ গাঁয়ে এলে খুন করে ফেলবে তুমি ?'

'খুনের কথাটা আইজ্ঞা মিছা।' সুচাঁদ থমথমে গলায় বলে, 'মানুষগুলানকে লিয়ে গিছে রঙলাল, উয়ারা ক্যানে দশবছর ঘরে ফিরে না ? উয়াদ্যার তো চিরদিনের তরে বিকে দিই নাই আমরা ?'

'আহ্‌হা!' বাঁ-পা মাটিতে অল্প ঠুকে রঙলাল বলে, 'তারা যে ভিন দেশে কাজ-কাম করছে রে বেটা। দেশে লোট্‌বে কিসের তরে ?'

'সেই ভিনদেশটি কুথায় রঙলাল ? আসাম মুলুকে সাত দিন আঁতি-পাতি খুঁজেও উয়াদ্যার পেল্যম নাই ক্যানে ?'

'আ—রে বোকা লেড়কা—।' রঙলাল যেন সস্নেহ ধমক দেয়, 'আসাম কি এত্‌না ছোটা মুলুক, যে তু' সাতদিনে তাদের তালাশ করে ফেলবি ? মাথা গরমী মত্‌ করো বেটা। তারা তাদের কাজ-কাম করছে, সুখে আছে।'

'উয়ারা সুখে আছে ? তো, হুজুরের পাশ মোদ্যার আর্জি, মোদের ঘরের মানুষ ঘরে ফিরুক ইবার। উয়াদ্যার আর উখোনে থেকে কাজ নাই।'

বড়বাবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও রঙলালের দিকে তাকান। ভুরু নাচিয়ে জবাব চান।

রঙলাল আতাবীজের মত দাঁত বের করে হাসে। বলে, 'উলোগ্‌ ফালতু মাথা গরম করছে হুজুর ? আসামে কি এক-আধটা চা-বাগিচা হুজুর ? শয়ে শয়ে। দু'দশটায় তালাশ করলে সব কামিনকে কী করে মিলবে সরকার ?'

'ঠিক আছে । আমাদ্যার কুন্ মেয়া কুন্ বাগিচায় কাম করছে, সিটা বল দেখি হুজুরের সুমুখে।' সহসা দশরথ ভক্তা বলে ওঠে ।

রঙলাল চুপ করে থাকে ।

'বলে দাও না হে ।' বড়বাবু হাই তুলতে তুলতে বললেন ।

রঙলাল যেন অল্প থতমত খায় । পরক্ষণে কালো দাঁত গিজুড়ে হাসে । বলে, 'সেটা আভি বলা বহুৎ মুশকিল হজৌর । উধার মে এক-এক মালিকের তিন-চার বাগিচা । এক বাগিচার কুলি দুশরা বাগিচায় হরবখত চালাচালি হয় । এদের গাঁয়ের কোন্ কামিন কোন্ বাগিচায় আছে এখন, উ বাত্ এখানে দাঁড়িয়ে হামি কী করে বোলবো দেওতা ?'

গোঁফে তা দিতে দিতে ব্যাপারটা অনুধাবন করেন বড়বাবু ।

সুচাঁদ কি একটা বলতে যাচ্ছিল । তাকে থামিয়ে রঙলাল বলল, 'অত কথায় কাম কি হজৌর । এরা হামার দাদন সুদে-আসলে ওয়াশীল করে দিক । হামিও ওদের মেয়ে-মরদ সব্বাইকে সাতদিনের মধ্যে হাজির করে দিবো । বেচে দিয়েছি না খেয়ে ফেলেছি, মালুম হবে তখন ।'

রঙলালের কথায় দমে যায় সারা গাঁ । টাকা শোধ দিলে সবাইকে ফেরত দেবে লোকটা! এর ওপর আর কথা চলে না । কিন্তু টাকা ফেরত দেবার সামর্থ গজাশিমুলের মানুষগুলোর যে নেই । হাড়াভাঙা খাটালি করেও দিনান্তে দু'মুঠো অন্ন জোটে না যাদের, তারা কিনা রঙলালের লালখাতার খাঁই মিটিয়ে মুক্ত করে আনবে আপনজনদের !

জমায়েতের ভাবগতিক পড়ে ফেলল রঙলাল । দু'কদম এগিয়ে আসে । বড়বাবুর সুমুখে হাতজোড় করে বলে, 'হজৌর, আপনার হুকুমে হামি সাতদিনের মধ্যে হিসাব কষে দিবো । এরা হামাব রুপেয়া কবে দিবে বলুক ।'

বড়বাবু গোলাকার চোখে তাকান জমায়েতের দিকে । বলেন, 'ভালো করে ভেবে বল্ ব্যাটারা । টাকা মেটাতে পারবি ?'

চুপ মেরে যায় তাবত জমায়েত । নিঃশব্দে শুনতে থাকে নিজেদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ।

সহসা এগিয়ে আসে সুচাঁদ । বলে, 'দুবো হুজুর, লির্ঘাৎ টাকা মিটাই দুবো । পালাগান থেইক্যে 'ফাগুো' বাইনেছি । উই টাকা দিয়ে এক-এক কইর‍্যে সক্কলকে ছাড়্যাই আনবো একদিন। তেবে টুকচান টাইম লাগবেক ।'

'ঠিক আছে ।' উঠে দাঁড়ালেন বড়বাবু, টাকা মিটিয়ে দিলে সবাইকে ফেরত পাবি তোরা। পাক্কা কথা । মিটে গেল মামলা । তবে যতদিন না পুরো টাকা মেটাস্, তদ্দিন রঙলাল এ গাঁয়ে আনাগোনা করবে । চুক্তি অনুযায়ী কুলি-কামিন নিয়ে যাবে । কেউ বাধা দিতে পারবি নে ।'

পায়ে পায়ে হাঁটতে শুরু করেন বড়বাবু । পিছু পিছু রঙলাল । ভুয়াশ গাছের তলায় পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে গজাশিমুলের মানুষ ।

হনহনিয়ে হাঁটতে লাগলেন বড়বাবু । দু পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল ।

'ডুংরীর চূড়ায় ওটা কি হে ?'

'তাঁবু, হজৌর ।'

'তাঁবু ! কার তাঁবু ?'

'এক বিলাইতি আউরত আউর এক বিলাইতি মর্দানা আজ সাতদিন এসে ডেরা লিয়েছে ওখানে । মাস্টারটার বড় ভাবসাব উ'লোগের সাথ ।'

ভ্রূ কুঁচকে ওঠে বড়বাবুর । কপালে চিন্তার ছাপ । কে আবার ডেরা পাতল এই পাণ্ডব-বর্জিত জায়গায়। সেই খ্যাপাটে মার্কিন মেয়েটা নয় তো ? দিন কয়েক আগে থানায় গিয়ে ছুঁড়ি মেলে ধরেছিল খোদ ফরেন সেক্রেটারীর চিঠি । উহু, এই পুলিশের চাকরিটাই এক ঝকমারি! কথা নেই বার্তা নেই এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে এসে ডেরা পাতল । এখন ভালোমন্দ একটা কিছু হয়ে গেলে দিল্লী অবধি জল গড়াবে । মাস্টারটাও নাকি এদের সঙ্গে জুটেছে । নাহ্, কেসটা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে । এই বজ্জাত মাস্টারটা তলে তলে কদ্দূর সুড়ঙ্গ কেটেছে, কে জানে ! ভাবতে ভাবতে ডাইনে বাঁক নিলেন বড়বাবু । মহুল বনের মধ্যিখান দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ । বড়বাবু পায়ে পায়ে এগোতে লাগলেন ডুংরীর দিকে । সেপাইদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এইখানে সবাই দাঁড়াও হে । বরং এ শালাদের পাড়ায় ঢুকে দ্যাখ, খানিকটে মধু-টধু পাওয়া যায় কিনা । এ শালারা তো মৌচাক ভাঙায় ওস্তাদ । আমি ততক্ষণে একটু খোঁজ খবর নিয়ে আসি ছুঁড়িটার । ফরেন সেক্রেটারীর চিঠি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে । যে সে মাল নয় ।'

'মাল' শব্দটি উচ্চারণ করতেই ঠোঁটে এক ধরনের তেষ্টা । যাওয়া যাক তাঁবুর দিকে। এসব পার্টির কাছে চব্বিশ ঘণ্টা এক নম্বর জিনিস মজুত থাকে । তার ওপর, আর যাইহোক, ব্যাটারা আতিথেয়তাটা জানে । মুখটি খুলে বাসনটি ব্যক্ত করলে একেবারে আকণ্ঠ গিলিয়ে দেবে । হবেই তো ! রাজার জাত যে ! খানা-খন্দ লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, জঙ্গল ফুঁড়ে অতটা পথ হেঁটে আসতে ভারি ধকল গেছে । আবার ফিরতে হবে ছ্যাদাপাথর অবধি । ঐখানেতেই জীপ। তার আগে গলাটা একটু ভিজিয়ে না নিলে আর চলছে না ।

৯. ওরা সাংস্কৃতিক উস্কানিদাতা

ঠা ঠা দুপুরে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায় মহাকরণের ফুটপাত ঘেঁসে । দরজা খুলে বেরিয়ে আসে রাজীব চৌধুরী । বিল মিলিয়ে দ্রুতপায়ে ভেতরে ঢোকে । প্রটেক্টেড এরিয়ার করিডোর ধরে গটমটিয়ে হেঁটে যায় ।

তথ্য ও সংস্কৃতি সচিব কমলেশ সিদ্ধান্তের ঘরের সামনে দর্শনার্থীদের ভীড় । কিন্তু স্লিপ পাঠিয়ে দু'মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে হয় না রাজীবকে । রাজীব খুব সহজভাবে ভেতরে ঢুকে পড়ে ।

বেশ বড়সড় ঘর, ঝকঝকে । এয়ার কুলার চলছে । ঘরের মধ্যে ঢোকামাত্রই শরীরখানা যেন জুড়িয়ে গেল রাজীবের । কাঁচে-ঢাকা বিশাল ডিম্বাকৃতি টেবিল । টেবিলের ওপারে বিশাল গদি- আঁটা চেয়ারে বসে রয়েছেন কমলেশ সিদ্ধান্ত । ছোটখাট মানুষটি । সরু রিমওয়ালা গোল-চাকতির চশমা নাকের ওপর ঝুলছে । টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে মনোযোগ সহকারে ফাইল দেখছিলেন কমলেশ সিদ্ধান্ত । টেবিলের কাঁচের ওপর রাজীবের

ছায়া দেখে মুখ তুলে তাকালেন । সঙ্গে সঙ্গে সারা মুখ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে গেল সিদ্ধান্ত -সাহেবের । সোজা হয়ে বসে হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন রাজীবের দিকে ।

'ওয়েল কাম, প্রফেসর চৌধুরী, বসুন, বসুন ।'

টেবিলের এ প্রান্তে কয়েকখানা গদি-আঁটা চেয়ার । তারই একটাতে বসে পড়ে রাজীব। তারপর বলুন, আপনার ফোক-এর কাজকর্ম কেমন চলছে ?'

'মন্দ নয় ।' রাজীব মৃদু হাসে, 'তবে আপনারা একটু না দেখলে আর এগোনো যাচ্ছে না ।'

'আমরা তো দেখছিই । জেলা স্তরে, রাজ্য স্তরে লোক-উৎসব করছি, গ্রাম-গঞ্জ থেকে লোকশিল্পীদের দিল্লী পাঠাচ্ছি জাতীয় উৎসবে । সব খরচই তো সরকার বিয়ার করছে ।'

'তা ঠিক, তবু, ভেবে দেখুন, এইসব গরীব শিল্পীগুলো যদি খেতে না পায়, ইন্‌ফ্যাক্ট পেট খালি রেখে—।'

'দেখুন প্রফেসর চৌধুরী, সরকার চাইলেও শুধু গান-বাজনা নিয়ে থাকতে পারে না । দেশে আরও হাজারটা ফাণ্ডামেন্টাল প্রব্লেম আছে । সরকারের তো আর অফুরন্ত টাকা নেই— । কিন্তু আপনার শিল্পীদের ক্ষেত্রে তো টাকার সমস্যা থাকবার কথা নয় ।'

'কেন ?' রাজীব বেশ অবাক হয়েই তাকায় সিদ্ধান্ত সাহেবের দিকে ।

'কেন মানে ? আপনার পেছনে কত বড় খুঁটি । ইস্ট-ওয়েস্ট ফোক ফাউণ্ডেশনের ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর মিস ক্যাথি বার্ড আপনাদের চিফ পেট্রন । ওরা ইচ্ছে করলে, ঐ গজাশিমুল না কি যেন, ঐ পুরো গ্রামটাকেই সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে পারে ।'

'ওরা তো সাহায্য করছেই । কিন্তু—।'

'বাই দ্য বাই, ওরা বাঁকুড়ায় যে সেন্টারটা খুলতে চাইছে, তার দায়িত্বটা নিতে চাইছেন না কেন ?'

'আমার এখন সময় কোথায় ? তাছাড়া—।'

'মিঃ চৌধুরী, ছেলেমানুষী করবেন না । কত বিশাল অরগানাইজেশন, জানেন ? ওদের শেকড় কত দূর অবধি, তার কোনও খোঁজ রাখেন ? স্টেট্‌স্‌-এর টপ ভি-আই-পি -রা ওর পেট্রন । আই অ্যাম শিয়োর, য়্যু আর গোয়িং টু বি আ ভি-আই-পি ভেরি সুন ।'

রাজীব মনে মনে খুবই বিব্রত বোধ করছিল । বলল, 'আমার কিন্তু ভি-আই-পি হওয়ার কোনই বাসনা নেই ।'

'আপনার না থাকতে পারে, কিন্তু—, তাছাড়া, ভি-আই-পি হওয়া না হওয়ার ব্যাপারটা না হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি নে, আপনি ফোক নিয়ে কাজ করতে চান, ফোক-এর উন্নতি চান, অথচ কাজ করবার সুযোগ পেয়েও নিচ্ছেন না কেন ? কিছু মনে করবেন না মিঃ চৌধুরী, এই জন্যই আমাদের, আই মিন, বাঙালিদের কিচ্ছু হয় না । হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতেই ওদের আনন্দ । এমনিতেই 'সুযোগ পাচ্ছি না' বলে চেঁচাবে, সুযোগ পেলে তখন মুখ ফিরিয়ে বৈরাগ্য দেখাবে ।'

'আসলে, আপনি স্যার ব্যাপারটা—।'

'না, না, আমি কোনও কথাই শুনতে চাই নে । এ দায়িত্ব আপনাকে নিতেই হবে । বলুন, রাজী তো ?'

রাজীব নাচার হয়ে হাসে । ঘাড় ঝাঁকায় । বলে, 'তা না হয় নিলাম, কিন্তু আপনি কেন এ ব্যাপারটা এত সিরিয়াসলি—।'

'নাথিং মিস্টিরিয়াস । আমি সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব । এরাজ্যে কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রমোশন ঘটানোই আমার কাজ । আমরা হলুম, যাকে বলে, সাংস্কৃতিক উস্কানিদাতা । ইট্‌স্ অ্যান্ এক্‌স্‌টেনশন ওয়ার্ক, অ্যাণ্ড নাথিং এল্‌স্ ।

সিদ্ধান্তসাহেব বেল বাজিয়ে চা বললেন ।

আজ সুতপার সঙ্গে দেখা হবে

গ্র্যাণ্ড হোটেলের তিনশো-তেইশ নম্বর স্যুটের সামনে এসে দাঁড়ায় রাজীব । কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে যায় । তখন দুপুর আড়াইটে ।

আজ সুতপার সঙ্গে দেখা হবে রাজীবের । বিকেল সাড়ে পাঁচটায় । সকাল থেকে, সেই কারণেই, মনটা উদগ্রীব হয়ে রয়েছে । কতদিন বাদে দেখা হবে সুতপার সঙ্গে ।

দরজার মুখেই রাজীবকে দেখে অবাক হয়ে যায় ক্যাথি । খানিকটা হতভম্বও বটে । পরক্ষণেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ।

'হ্যালো ! হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ !'

রাজীব মৃদু মৃদু হাসছিল । বলে, 'ভেতরে আসতে বলবে না ?'

'ওহ্, শিয়োর। এসো, এসো ।'

ক্যাথি দ্রুত নিজের খোলামেলা পোশাক সামলে নেয় ।

রাজীব ঘরে ঢোকে ।

ক্যাথি খুশী খুশী গলায় বলে, 'বসো ।'

ঘরখানা এমনিতেই খুব দামি আসবাব দিয়ে সাজানো । নরম বিছানার ওপর দামী বেড কভার । মেঝের ওপর নরম কার্পেট, দেওয়ালের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত । ভারি ভারি পর্দা ঝুলছে দরজা-জানলায় । বিছানার ওপর কিছু বই, কাগজপত্তর, ছবি ইত্যাদি এলোমেলো ছড়ান । রাজীব দেখেই বোঝে, ক্যাথি কাজ করছিল ঐ সব নিয়ে ।

ফোন তুলে কফি বলে ক্যাথি । ফিরে এসে রাজীবের মুখোমুখি দাঁড়ায় । চোখের কোণে দুষ্টমির ঝিলিক তুলে বলে, 'কি ব্যাপার, প্রফেসর, এমন অসময়ে একলা-যুবতীর ঘরে ঢুকে পড়া, মতলবটা কি ?'

ক্যাথির রসিকতাটুকু উপভোগ করে রাজীব । পাল্টা রসিকতা করার লোভটুকু সামলাতে পারে না । হাত দুটো সামনে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'এই নাও, বাঁধো । তোমার বাঁধনে ধরা পড়তে এলাম ।'

ক্যাথি ঝট করে মাথার লম্বা রিবনটা খুলে ফেলে । হো-হো করে হেসে ওঠে রাজীব । বলে, 'ও বাঁধা নয় । তোমার মল্লভূম ফোক সেন্টারের কাগজপত্র নিয়ে এস, সই করি।'

ক্যাথি মুহূর্তকাল থমকে দাঁড়ায় । ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে একটুখানি সময় লাগে তার । পরমুহূর্তে বাচ্চা মেয়ের মত উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে । সবলে জড়িয়ে ধরে রাজীবের হাত দুটি ।

বলে, 'রিয়্যালী ! তুমি সত্যি বলছ তো !'

বলতে বলতে ক্যাথি ছুটে যায় ঘরের কোণে । ফ্রিজ খুলে বের করে আনে স্কচের বোতল । দুটো গ্লাসে ঢালে । একখানা এগিয়ে দেয় রাজীবের দিকে ।—ধর । লেট্ আস

সেলিব্রেট দ্য মোমেন্ট ।

রাজীব অস্বস্তিবোধ করছিল । গ্লাসখানা হাতে নিয়েই বসে থাকে সে । কী করবে ভেবে পায় না । ক্যাথি ওর গেলাসখানা রাজীবের গেলাসে ছোঁয়ায় । '—চিয়ার্স । নাও ছোট্ট একটা সিপ্ কর । আর গুড্ডি গুড্ডি হয়ে থাকতে হবে না।'

রাজীব তাও ইতস্তত করে । সত্যি কথা বলতে কি, মদটা সে কোনদিনই বড় একটা ছোঁয় নি এর আগে । সুতপা মদ একেবারেই সইতে পারে না ।

ক্যাথি সহসা ভীষণ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে । বলে, 'আরে বাবা, তোমাদের অ্যানসেস্টাররা পিপে পিপে মদ খেতেন । সো-ম রস-অ । আমি পড়েছি ।'

রাজীব অগত্যা গ্লাসখানা মুখের কাছাকাছি তুলে আনে । ছোট্ট চুমুক দেয় । ক্যাথি তখন সমানে কলকলিয়ে চলেছে ।

গ্লাসে দু'চারটে চুমুক দিয়ে ক্যাথি বলল, 'এবার আমিও তোমাকে একটু চমকে দি । আমাদের ফাউণ্ডেশন ঠিক করেছে, এ দেশের ফোক নিয়ে স্টেট্স-এ কিছু সেমিনার করবে বিভিন্ন শহরে । সে জন্য যোগ্য লোকের নাম পাঠাতে বলেছে । আমার মনে হয়, এ সম্মানটা প্রথমে তোমাকেই দেওয়া উচিত ।' ক্যাথি সরাসরি চোখ রাখে রাজীবের চোখের ওপর, 'কি ? কী ভাবছ ?'

রাজীব কি বলবে ভেবে পায় না । বলে, 'বেশ তো । কিন্তু এই ফোক সেণ্টার নিয়ে তোমার পরিকল্পনাটা খুলে বল দেখি ।'

কাজের কথায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সিরিয়াস হয়ে গেছে ক্যাথি । সে প্রকল্পটি বিতাং করে বোঝাতে থাকে রাজীবকে ।

হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়াল রাজীব, বিকেল তখন গড়িয়ে এসেছে । রাস্তা বোঝাই বাস-ট্রাম-মিনি, অফিস-ফেরত যাত্রীদের দৌড়োদৌড়ি, ব্যস্ততা, ফুটপাথে হকারদের চিৎকার. . .। হোটেলের ভেতরের স্নিগ্ধ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে হকচকিয়ে যায় রাজীব। গলগলিয়ে ঘামতে থাকে । উত্তপ্ত ধুলোবালির ঢেউ বয়ে যায় ওর মুখের ওপর দিয়ে ।

গ্লাস শেষ হতেই, আবার ভরে দিয়েছিল ক্যাথি । কোনও আপত্তিই শোনে নি । ওর জেদ আর একগুঁয়েমির কাছে হার মানতে হয়েছে রাজীবকে । মাথাটা অল্প ঝিমঝিম করছে এখন । হাঁটতে গিয়ে পা দু'টো সামান্য টলছে । চোখের পাতা ষোল আনা খোলা রাখতে পারছে না । এবং সবচেয়ে বড় কথা, ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে তার । এক ধরনের লজ্জা আর অপরাধবোধ চারপাশ থেকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে । মদ নিয়ে বাহ্যত কোনও বাতিক নেই রাজীবের । কিন্তু এ যাবত, যে কোনও কারণেই হোক, বড় একটা ছোঁয় নি বস্তুটি । সুতপার আপত্তি ছিল বরাবর, তার ওপর অধ্যাপনার কাজ নেওয়ার ফলে মদ জাতীয়ব্যাপার-স্যাপার থেকে শত হস্ত থাকতে হত ওকে । সু-অধ্যাপক হিসেবে রাজীবের খুবই সুনাম । ঐ সুনামটুকুও তাকে, ক্যাথির ভাষায় 'গুড্ডি-গুড্ডি' হয়ে থাকতে প্ররোচিত করেছিল ।

খুব খারাপ লাগছে রাজীবের । এই অবস্থায় পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে, ছাত্র কিংবা ছাত্রতুল্য কারো মুখোমুখি পড়ে গেলে, লজ্জার আর শেষ থাকবে না । সবচেয়ে বড় সমস্যা হল সুতপাকে নিয়ে । এই অবস্থায় ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে কী করে রাজীব! অথচ আর আধঘন্টার মধ্যে তার আর সুতপার দেখা হওয়ার কথা । হাত ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে

মনটা চুপসে গেল রাজীবের । ভারি অসহায় লাগছে নিজেকে । কতদিন বাদে দেখা হতে চলেছে সুতপার সঙ্গে । সুতপাই শেষ চিঠিতে জানিয়েছিল, সে এই সময়টায় দিন কয়েক কোলকাতায় থাকবে । রাজীবেরও তলব পড়ল তথ্য-সংস্কৃতি সচিবের ঘরে । গতকাল কোলকাতায় পৌঁছেই সুতপাকে ফোন করেছিল রাজীব । ঠিক হয়েছিল, আজ গ্লোবে ইভনিং শো-তে 'টেন কমাণ্ডমেণ্টস' দেখবে দুজনে । কোথাও বসে গল্প করবে তারপর । সুতপা এতক্ষণে টিকিট কেটে গ্লোবের সামনে অপেক্ষা করছে নিশ্চয় । গ্র্যাণ্ডের তলা থেকে গ্লোব সিনেমা চার-পাঁচ মিনিটের পথ । অথচ রাজীবের পা দু'টো যেন কেউ শেকল দিয়ে বেঁধেছে । শুধু যে মুখে তীব্র মদের গন্ধ তাই নয়, মাথাটা ঝিমঝিম করছে, সারা শরীর জুড়ে এক ধরনের অস্থিরতা, বমি-বমি ভাব, কিন্তু তাও নয়, এই মুহূর্তে রাজীবের মগজের মধ্যে বিচিত্র সব এলোমেলো ভাবনা কিলবিল করছে, যাদের আদপে কোনও মাথামুণ্ডু নেই । ভাবনাগুলো কথা হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে প্রাণপণে । রাজীবের কোনই সন্দেহ নেই, এই মুহূর্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি তাকে প্রগলভ করে তুলবেই । এবং শরীরে, মনে এতখানি অসুস্থতা নিয়ে সুতপার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব নয় ।

রুমাল বের করে মুখ, ঘাড, গলা পরিপাটি করে মুছল রাজীব, একটা সিগারেট ধরাল। সামনে এখন বৈকালিক যান-বাহনের বিপুল স্রোত, তাদের অশান্ত গর্জন, ফুটপাথ জুড়ে পথচারীদের থিকথিকে ভীড়, গা জ্বালা করা গরম হাওয়া...। সুতপা কী ভাবছে এখন ? ঘড়ির ডায়ালে চোখ ফেলে রাজীব বুঝল, ছবি শুরু হতে আর দেরী নেই । এতক্ষণে সুতপা নিশ্চয়ই খুব অস্থির হয়ে উঠেছে মনে মনে । ভীড়ের মধ্যে রাজীবের মুখখানি আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে নিশ্চয় । কতক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করবে সুতপা, কতক্ষণ খুঁজতে থাকবে জন-অরণ্যে একটি পরিচিত মুখ । সুতপা কী ভাবছে, কী ভাববে রাজীব সম্পর্কে, আজকের সন্ধ্যের পর ? রাজীবই বা পরের চিঠিতে কি কৈফিয়ত দেবে আজকের ঘটনার ? সহসা মনটা তেতো হয়ে যায় রাজীবের, আত্মগ্লানিতে ভরে যায় বুক । আজকের বিকেলটা তার এক নি[illegible]ণ ক্ষতি, আচমকা তীব্র গরল ঢেলে দিয়ে গেল তার জীবনের পাত্রখানিতে ।

ক্যাথির ওপর রাগ করতে গিয়েও পারে না রাজীব । তার অনুপাতে অতিশয় স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করেছে সে । ব্যাপারটা এমনিতেই এমন কিছু গুরুতর নয় । কিন্তু মদ নিয়ে সুতপার দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনেকদিন বাদে তার সঙ্গে চাক্ষুষ মুখোমুখি হওয়ার প্রেক্ষিতেই বিষয়টি এতখানি ভিন্ন মাত্রা পেয়ে গেছে । সব চেয়ে বড় কথা, এই মুহূর্তে রাজীব নিজেকে অসুস্থ ভাবছে। তার মগজে অনেক ভাবনা, কথা কিলবিল করছে, গলা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, যা সুস্থ অবস্থায় সে কখনই ভাবে না । নিজের সম্পর্কে, মা, সুতপা, ক্যাথি এবং চারপাশের সবকিছু নিয়ে উদ্ভট অবাস্তব সব ভাবনা । তার কথা বলতে ইচ্ছে করছে, হাসতে ইচ্ছে করছে, পেচ্ছাব করতে ইচ্ছে করছে । সবচেয়ে যেটা খুবই ভয়ের, ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে রাজীবের ।

পা বাড়াল রাজীব । রাস্তাটা টলতে টলতে সন্তর্পণে পার হল । পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল গড়ের মাঠের দিকে । এখন একটুখানি খোলা হাওয়া চাই তার । মাথার ওপর তারা-বিছানো আকাশ, পায়ের তলায় সবুজ ঘাসের জাজিম.—এখন সবুজ ঘাসের ওপর সর্বাঙ্গ এলিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে রাজীবের ।

১০. ক্যাথি বার্ড-এর ফোক-চাষের কারখানা

রাজীব চেয়েছিল, মল্লভূম ফোক রিসার্চ সেন্টারের অফিসটা হোক রানীবাঁধে। তাতে করে গজাশিমুল সংস্কৃতি সঙ্ঘর কাজকর্ম চালানোরও সুবিধে হবে। বাদ সাধল ক্যাথি বার্ড। তার ইচ্ছে, ওটা বাঁকুড়াতেই হোক। ক্যাথির কথায় যুক্তি ছিল। শুধু গজাশিমুল তো নয়, এই ফোকসেন্টারের মাধ্যমে সারা মল্লভূমের ফোক নিয়ে চর্চা-গবেষণা হবে। জেলার একপ্রান্তে অফিস বানানোর কোনও মানে হয় না। যুক্তিটা মেনে নিয়েছে রাজীব। ক্যাথি ওকে কথা দিয়েছে, ফোক সেন্টারের ফাঁকে ফাঁকে গজাশিমুলের কাজকর্ম যাতে দেখাশোনা করতে পারে রাজীব, তার ব্যবস্থা করা হবে।

'তুমি তো সেমিনারগুলো সেরে এস আগে—।' চোখ নাচিয়ে বলেছিল ক্যাথি, 'তারপর ভাবা যাবে, তোমার গজাশিমুল নিয়ে কী করা যায়।'

সেই অনুসারে দ্রুতগতিতে কাজ এগোচ্ছে। বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে বিঘে পাঁচেক জমি কেনা হয়েছে। ঐ জমির ওপর বানানো হয়েছে ছিমছাম ছোট্ট অফিস বিল্ডিং। রাজীব এখন রোজ একবেলা ঐ অফিস ঘরে বসে। পাশের ফাঁকা জমিতে গড়ে উঠছে সেমিনার হল, লাইব্রেরি, ফোক-মিউজিয়াম আর, একটা ছবির মত গেস্ট-হাউস। সব কাজকর্মই দেখাশোনা করতে হচ্ছে মূলত রাজীবকে। ক্যাথি কিংবা জনসন মাঝে মধ্যে এক-আধবেলার জন্য আসে, কাজকর্মের প্রগ্রেস দেখে রাজীবকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে চলে যায়।

'কাজকর্মের কলেবর যে হারে বাড়ছে, তুমি একা সামলাতে পারবে না, চৌধুরী। অ্যাসিস্টেন্ট গোছের কাউকে নাও।' দিন কয়েক ধরে কথাটা বলছে ক্যাথি।

রাজীবেরও ইদানিং মনে হচ্ছে, পাশে সর্বক্ষণ একজনকে না হলে চলছে না। ক্যাথির পরবর্তী পরিকল্পনা অনুযায়ী এরপর সারা জেলা ব্যাপী ফোক-সার্ভে শুরু হবে। একটা ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিনও বেরোবে। মিউজিয়ামটা সাজানোর জন্য আসবাবপত্র বানানো, লোক-সামগ্রী সংগ্রহ, ক্যাটালগ তৈরী,—কাজ অনেক। এমন পরিস্থিতিতে বারবার সুনীলের মুখখানিই মনে পড়ে রাজীবের। চাকরি-বাকরি পায় নি ছেলেটা। কিন্তু এখনও নীরবে, লোকচক্ষুর আড়ালে কাজ করে চলেছে, চষে বেড়াচ্ছে সারা জেলা। কোলকাতার কাগজগুলোতে মাঝে মাঝে তার এক একটা লেখা, পড়লে চমকে উঠতে হয়।

সুনীলকে চিঠি লিখেছে রাজীব। যত জলদি সম্ভব দেখা করতে বলেছে।

সেন্টারের অফিস ঘরে বসে আজকের আসা চিঠিপত্রগুলো দেখছিল রাজীব। অনেক চিঠি। ক্যাথি বার্ড লিখেছে, পাশপোর্ট রেডি হয়ে গেছে। রাজীব যেন শিগ্‌গির একদিন কোলকাতায় এসে ওগুলো নিয়ে যায়। সুতপার চিঠিখানা খুলতে যাচ্ছিল রাজীব, তার আগেই নজর পড়ে একখানা ঝকঝকে খামের ওপর। মিঃ খাণ্ডেলওয়াল, 'ব্লু-বার্ড পাবলিশার্স' ফ্রম বোম্বে। সুতপার চিঠিখানা সরিয়ে রেখে রাজীব খাণ্ডেলওয়ালের খামখানা খোলে। চিঠিখানা পড়তে পড়তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুখ। মল্লভূম-ফোকের ওপর একখানা বই ছাপতে চায় ওরা, বইখানা লিখবার জন্য রাজীব চৌধুরীকেই নির্বাচন করেছে। রাজীব যদি রাজি থাকে, তবে কখন কোথায় চূড়ান্ত কথাবার্তা হতে পারে, চিঠি লিখে জানাবার অনুরোধ রয়েছে চিঠিতে।

খুব ভাল লাগছে রাজীবের। অনেকদিন ধরেই এ বিষয়ে একখানা বই লেখার কথা ভাবছে রাজীব। মাল-মসলাও জোগাড় করছে আজ ক'বছর ধরে। লিখে ফেলেছেও কতকটা। কিন্তু ছাপবার ব্যাপারে একটা অনিশ্চয়তা ছিলই। খাণ্ডেলওয়ালের চিঠি পেয়ে সেই অনিশ্চয়তা ঘুচল। বিশাল সংস্থা ওটা, রাজীব জানে, আন্তর্জতিক বাজার আছে ওদের। এমন সংস্থা থেকে বই বেরোনো এক মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার। এই চিঠির জবাব এক্ষুণি দেওয়া দরকার। কাগজ-কলম টেনে নেয় রাজীব।

চিঠিখানা তখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি, বাইরে সুনীলের গলা।

'এসো, সুনীল, ভেতরে এস।' রাজীব চিঠিখানা শেষ করে খামের মধ্যে ভরে।

'কি খবর তোমার? দেখা-সাক্ষাৎ নেই। আছ কেমন?'

জবাবে সুনীলের মুখে সরল হাসি, 'আপনার বাসায় গিয়েছিলাম দু'দিন। তালা বন্ধ ছিল।'

'তা তো থাকবেই।' রাজীব হাসে, 'বাসায় আর কতক্ষণ থাকি! গজাশিমুল আর এই সেণ্টার সামলাতে হিমশিম খাচ্ছি। তুমি এখানেই আমাকে পাবে।'

সুনীল বসল। একটু রোগা লাগছে ওকে। মুখে ক্লান্তির ছাপ, চোখের কোণে কালি, চোখ দুটি কিন্তু সেই আগের মত বুদ্ধিদীপ্ত, উজ্জ্বল।

'কাগজে তোমার লেখাগুলো পড়ছি। পুরোনো শখটা এখনো ভালই টিকিয়ে রেখেছ দেখছি।'

সুনীল কেমন অস্বস্তিবোধ করে। বলে, 'শখ নয় স্যার, লোক-সংস্কৃতির চর্চাটা আমার কাছে সিরিয়াস একটি নেশা। তবে এখনো পেশা হিসেবে নিতে পারি নি।'

রাজীব সরাসরি চোখ রাখে সুনীলের চোখের ওপর। কয়েক পলকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যায় বুঝি। বলে, 'পেশা হওয়া উচিতও নয়, তবে পাশাপাশি তো কাজকর্মও কিছু করতে হবে। পেটের জোগাড়ও তো চাই। চাকরি-বাকরি তো কিছুই পেলে না।'

সুনীল চুপ করে বসে থাকে।

একটা সিগারেট ধরাল রাজীব। বার দুই ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'চাকরি পেলে করবে?'

সুনীল চকিতে তাকায় রাজীবের দিকে। চোখের তারায় অবিশ্বাস, সংশয়।

'কি চাকরি, স্যার?'

'ধর, এই ফোক-সেণ্টারেই যদি একটা চাকরি হয়ে যায় তোমার?' প্রায় লোভ দেখানোর ভঙ্গিতে বলে রাজীব, 'ফোক-সংগ্রহ, সার্ভে, ফোক-মিউজিয়মের দেখাশোনা—, কাজটা তোমার ভালই লাগবার কথা।'

মুহূর্তকাল চুপ করে বসে থাকে সুনীল। এক সময়ে হেসে ফেলে সে।

'হাসলে যে?'

'না, ভাবছিলাম, জীবন আর জীবিকা, এক মোড়কের মধ্যে, সইবে তো?'

সহসা খুব রাগ হয়ে গেল রাজীবের। সিদ্ধান্তসাহেব যে কথাগুলো কিছুদিন আগে রাগ করে বলেছিলেন রাজীবকে, সেগুলোই সুনীলের সামনে উগরে দিতে ইচ্ছে হল। বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিল রাজীব। বলল, 'ব্যাপারটাকে এভাবে নেবে, বুঝিনি। আজকাল জব-

স্যাটিস্ফেকশন না পাওয়াটা প্রত্যেক মানুষের কাছে একটা ট্রাজেডি । রুটি-রুজির তাগিদে তাকে যে কাজ করতে হয়, সে কাজ তাকে আকর্ষণ করে না । যে কাজ তার ভাল লাগে, তেমন চাকরি সে পায় না । তুমি তো লাকী হে, রুটি-রুজির জন্য এমন কাজ তোমাকে করতে হবে, যা তোমার নিজস্ব প্রিয় বিষয় ।'

কিন্তু সুনীল নিভেই থাকে । রাজীবের কথাগুলো তার মনে কোনও বাড়তি উৎসাহ জোগায় না ।

বলে, 'আপনি বিদেশ যাচ্ছেন কবে, স্যার ।'

'এ মাসেরই তেইশে ।'

'তা হলে তো আর সময় নেই আপনার হাতে ।'

'সেই জন্যেই তো বলছিলাম, তুমি যদি রাজি থাকতে, তবে মিস বার্ডকে বলে তোমার ব্যবস্থাটা পাকা করেই রওনা দিতাম । আমার অ্যাবসেন্সে কাজকর্মগুলো দেখতে পারতে ।'

'আমাকে একটুখানি ভাববার সময় দিন, স্যার ।' প্রায় অপরাধীর গলায় কথাগুলো বলে সুনীল, 'তাছাড়া, কিছু জরুরী কাজকর্ম রয়েছে সামনে ।'

'জরুরী কাজকর্মগুলো কি ? জানতে পারি ?' রাজীবের গলায় বিরক্তি চাপা থাকে না।

'এ বছর আকাশের অবস্থা দেখে ভাল ঠেকছে না, স্যার । এখনও এক পশলা বৃষ্টি হল না । বৃষ্টির লক্ষণও নেই আকাশে । জেলাব্যাপী প্রবল খরার আশঙ্কা করছি আমি । যদি সত্যিই তেমন কিছু হয়, তবে সবকিছু ফেলে আমাকে নেমে পড়তে হবে কাজে । যাদের মধ্যে কাজকর্ম করছি, তাদের তো আগে বাঁচাতে হবে ।'

রাজীবকে খুব হতাশ দেখাচ্ছিল । বলে, 'ঠিক আছে । তুমি ভাব । আমিও ঘুরে আসি। কিন্তু সত্যি বলছি তোমায়, এমন সুযোগ ছেড়ে দেওয়া তোমার পক্ষে বোকামিই হবে ।'

ম্লান হাসে সুনীল । উঠে দাঁড়ায় । বলে, 'আমি আসি, স্যার । আপনার বিদেশ ভ্রমণ সফল হোক।'

'বাই দ্য বাই ।' রাজীব প্রসঙ্গ বদলায়, 'ফোক নিয়ে এ যাবত যেসব লেখা বেরিয়েছে তোমার, তার কাটিংগুলো দিতে পার ? সেমিনারে ওগুলোরও উল্লেখ করতে চাই ।'

'আমি দু'এক দিনের মধ্যেই দিয়ে যাব, স্যার । চলি ।'

ধীর পায়ে চলে যায় সুনীল । রাজীব খাণ্ডেলওয়ালের কাছে লেখা চিঠিখানা পকেটে ভরে বেরিয়ে পড়ে শহরের দিকে ।

রোমশ হাতের ছোঁওয়া

মোভী-ম্যানসনের পাঁচতলার ফ্ল্যাটে বসন্ত খাণ্ডেলওয়াল অপেক্ষা করছিলেন রাজীবের জন্য, ডোর-বেল বাজাতেই দরজা খুললেন স্বয়ং ।

'গ্ল্যাড টু মিট য়ু । আমি 'ব্লু-বার্ড' পাবলিকেশনের বসন্ত খাণ্ডেল্ওয়াল । আপনি নিশ্চয়ই রাজীব চৌধুরী ?'

রাজীব মৃদু হেসে হাতখানি বাড়িয়ে দেয় ।

'আপনি আমাকে না চিনলেও, আমি আপনার খবর ভালই রাখি ।' সোফায় বসতে বসতে

বললেন মিঃ খাণ্ডেলওয়াল, 'আমাদের পাবলিকেশন-এর খবর আপনি নিশ্চয়ই রাখেন ?'

'আপনাদের তো ওয়ার্ল্ড-ওয়াইড সার্কুলেশন ।' হেসে বলে রাজীব ।

মিঃ খাণ্ডেলয়াল ফোন তুলে কফি বলেন ।

'খুব অবাক হয়েছেন তো আমার চিঠি পেয়ে ? আসলে আমাদের পাবলিকেশন-এর যা গাইড-লাইন তাতে আপনাকে অফারটা দেওয়া বোধ করি যেত না । কিন্তু মিস বার্ড-এর স্পেশাল রেকমেণ্ডেশনে— । যাগ গে, আপনাকে দিয়ে আমরা 'বসু-শবর কালচার'-এর ওপর একখানা বই লেখাতে চাই । অবশ্যই ইংরেজীতে । ইন্ ফ্যাক্ট, ও ধরনের বই ইংরেজীতেই লেখা উচিত । এ দেশের কোনও রিজিওন্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে লিখলে পৃথিবীর ক'টা লোকই বা বুঝবে !'

রাজীব মন দিয়ে শুনছিল মিঃ খাণ্ডেলওয়ালের কথাগুলো ।

কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, 'লেখার ব্যাপারে আমার আপত্তি নেই, তবে— ।'

'টাকার কথা ভাববেন না । আমরা লেখকদের ঠকাই নে ।'

'না, না, আমি তা ভাবছি নে । আসলে, আমার ওপর ইদানিং খুব চাপ যাচ্ছে । গজাশিমূল সংস্কৃতি সংঘর পাশাপাশি আমাকে 'মল্লভূম ফোক রিসার্চ সেণ্টারের'ও দায়িত্ব নিতে হয়েছে ।'

'খুবই স্বাভাবিক । যে কাজ করে, কাজগুলো খুঁজে খুঁজে তার দুয়োরেই হানা দেয় ।' মিষ্টি হাসেন খাণ্ডেলওয়াল, 'তাছাড়া, মিস বার্ডের মুখে যা শুনেছি, ঐ এলাকার 'ফোক' নিয়ে কাজ করবার জন্য আপনার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কে আছে ?'

এমন খোলাখুলি প্রশংসায় মনে মনে বিব্রত বোধ করছিল রাজীব । বলে, 'শুধু ফোকের চাপই নয়, আমি আসলে 'ফোক' খুঁজতে এসে একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছি । চ্যালেঞ্জটা আমি গ্রহণও করেছি ।'

'আমি জানি । সব শুনেছি মিস বার্ডের কাছে । ঠিক আছে, আপনি সময় নিন । তবে আগামী বছর দিল্লী-ফেস্টিভ্যালের আগেই বের করতে চাইছি বইখানা । কোনও ভি-আই-পি'কে দিয়ে প্রিমিয়ার করাবার ইচ্ছে ।'

'ঠিক আছে— ।' রাজীব প্রসঙ্গ বদলায়, 'আপনাদের আর্থিক লেনদেন-এর ব্যাপারটা— ।'

'আমরা পাণ্ডুলিপি কিনে নেবো । এবার আপনিই বলুন, কতটা আশা করছেন ।'

ভারি দোটানায় পড়ে যায় রাজীব । এমন বইয়ের জন্য ঠিক কত চাওয়া উচিত, বুঝে উঠতে পারে না । অবশেষে সেটা স্বীকারও করে ফেলে । বলে, 'দেখুন মিঃ খাণ্ডেলওয়াল, আমি মূলত সাহিত্যের অধ্যাপক এবং লোকসংস্কৃতির গবেষক । টাকা-পয়সার ব্যাপারে নেহাতই আনাড়ি । কী বলি, বলুন তো ?'

'আরে, মশাই, বুঝুন আর না বুঝুন, আপনার কমোডিটি, দাম তো আপনাকেই হাঁকতে হবে ।' হা-হা করে হেসে ওঠেন খাণ্ডেলওয়াল ।

'তা তো হবেই । আচ্ছা, আমি যদি পঁচিশ হাজার চাই, খুবই কি বেশি হবে ?'

মিঃ খাণ্ডেলওয়াল কয়েক মুহূর্তের জন্য গুম মেরে যান । মুখের রেখাগুলোতে দ্রুত ভাঙচুর হতে থাকে । বার দুই সরাসরি দৃষ্টি বিঁধিয়ে দেন রাজীবের চোখে ।

বলেন, 'মিঃ চৌধুরী, ফোক আমিও ভালবাসি। সেই কারণেই চাই, বাংলার ফোক সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক। সবাই জানুক। কিন্তু আপনি তো জানেনই, এসব বইয়ের পাঠক খুবই লিমিটেড। এ তো আর হেডলি চেজ নয়। হয়ত শেষ অবধি লোকসানই যাবে। সে সব পরের ভাবনা। কিন্তু, আমার অনুরোধ, আপনি যা চাইবেন, সেটা যেন রিয়েলিস্টিক হয়।'

'আমি তো আগেই বলেছি, আমি সাহিত্যের অধ্যাপক, ব্যবসা-ট্যবসা আমার আসে না। ফোকের জন্য আমি ঘর-সংসার ছেড়ে বনবাসী হয়েছি। তা বলে, ফোক-এর ওপর বই লিখে টাকা কামাবো এমনটা আমার কল্পনাতেও নাই। আসলে, আমাদের খুব টাকার দরকার। যে ফোকটি আমি আবিষ্কার করেছি, তাকে টিকিয়ে রাখতে হলে, একটা রক্তচোষা আড়কাঠির হাত থেকে ওদের বাঁচাতে হবে, আর তার জন্যই আমাদের প্রচুর টাকা চাই।

মিঃ খাণ্ডেলয়াল আবার গুম মেরে গেলেন খানিকক্ষণের জন্য। খুব চিন্তিত মনে হল ওঁকে।

বললেন, 'আমরা আপনাকে পনের হাজার দেব।' বলেই সরাসরি চোখ রাখলেন রাজীবের চোখে।

পঁচিশ বলেছিল বটে,. তবে পনের হাজারও রাজীবের প্রত্যাশার অতীত। মনে মনে সে উল্লসিত। চোখে মুখে বোধ করি তার ছায়া দেখতে পেলেন খাণ্ডেলওয়াল। বললেন, 'এই অফারটা স্পেশ্যালী আপনার জন্য। নইলে, ওড়িশার ছৌ-নাচের ওপর দুটো, তিব্বতী নাচের ওপর দুটো, আইল্যাণ্ড ফোক আর মণিপুর মার্শাল আর্টের ওপর একটা করে পাণ্ডুলিপি আমার কাছে দু'বছর ধরে পড়ে রয়েছে। যে কোনও অ্যামাউণ্টেই তারা রাজি। বাই দ্য বাই, আপনার কাছে যথেষ্ট সংখ্যায় ফোটোগ্রাফ আছে তো?'

'তা আছে। আরো কিছু তুলে নেব।'

'হ্যাঁ, জলদি তুলে ফেলুন। আগামী মাসে প্রথমে কিস্তির টাকাটা পেয়ে যাবেন। কণ্ট্রাক্টটা তখনই করা যাবে, কি বলেন? আপনার লেখার প্রথম কিস্তি কবে নাগাদ পাচ্ছি?'

'এ মাসের থার্ড উইকে আমি স্টেট্স-এ যাচ্ছি। সেখানে আমার অনেকগুলো বক্তৃতা রয়েছে। ফিরে এসে —।'

'ওরে বাবা!' মিঃ খাণ্ডেলওয়াল সহসা চঞ্চল হয়ে উঠলেন, 'স্টেট্স্ থেকে ফিরলে তো আপনি আরও ভি-আই-পি হয়ে যাবেন। না মশাই, চুক্তিটা আমি সামনের হপ্তায় সেরে ফেলতে চাই। আপত্তি নেই তো?'

মৃদু হাসে রাজীব, 'আপত্তি নেই। তবে যে কোনও পরিস্থিতিতে, আমার কথার খেলাপ হবে না।'

'জানি।' আবার মিষ্টি হাসেন মিঃ খাণ্ডেলওয়াল, 'তবে আমরা হলাম বিজিনেস ম্যান। উই ফাইণ্ড দ্য ঘোসট্ অব স্যাবোটেজ ইন্ এভ্রি বুশ।' হা-হা করে হেসে উঠলেন মিঃ খাণ্ডেলওয়াল, 'বেস্ট অব লাক। আপনার বিদেশ ভ্রমণ মধুর হোক।'

মিঃ খাণ্ডেলওয়াল তাঁর রোমশ হাতখানি বাড়িয়ে দেন রাজীবের দিকে।

১১. খরা—অ্যান অ্যাকিয়্যুট ড্রাউট ইন উইদিন

পশ্চিম রাঢ় পুড়ছে ।

গেল ক'মাসে এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি তল্লাটে । এই মধ্য-আষাঢ়েও ধুলো উড়ছে মাঠে। জোড়-বাঁধে যা একটু আধটু জল ছিল, তাই দিয়ে আউশ ধান আর ভুট্টা বুনেছিল কেউ কেউ। সে ফসলও শুকিয়ে গেছে জলের অভাবে । আকাশের অবস্থা দেখে আগামী দিনগুলোকে আগাম বুঝে নিয়েছে এলাকার সম্পন্ন মানুষ আর ব্যবসায়ীর দল । লুকিয়ে ধান-চাল মজুত করছে ওরা । ফলে, সারা তল্লাট জুড়ে ধান-চালের দাম হয়েছে আকাশ ছোঁয়া । তার ওপর শুরু হয়েছে তীব্র জলসংকট । জোড়-বাঁধ সব শুকিয়ে ফুটিফাটা । কুয়ো-ইঁদারায়ও তলানি জল । কাঁড়া-গাড়িতে করে বহুদূর থেকে পানীয় জল বয়ে আনছে মানুষ । যারা সেটা পারছে না, তারা তলানি-কাদাজল দিয়ে তেষ্টা মেটাচ্ছে । হাহাকার উঠেছে চারপাশে । গজাশিমুলের বাসিন্দাদের অবশ্য পানীয় জলের খুব একটা অসুবিধে নেই । তারা চিরকাল খেতো ছোট-খরসতী আর পাহাড়ী ঝরনার জল । এই দুঃসহ খরায়ও নদীটার অপার করুণা । সরু সুতোর মত তিরতিরিয়ে বইছে এখনও । পাহাড়ের গুপ্ত গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসে 'কুম্' ফোটানো জল, সেই জল ঝরনা হয়ে সংবৎসর বয়ে যায় ।.জলের এই উৎস দুটিই চারপাশের দশ-বিশখানা গাঁয়ের একমাত্র ভরসা । রোজ দু'তিন ক্রোশ চড়াই-উতরাই পথ ভেঙে দল বেঁধে জল নিতে আসে মেয়েরা । গরু-বলদদের নিয়ে আসে জল খাওয়াতে । আকুল চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে পুরো এলাকার মানুষ, কখন আকাশের বুক একটুখানি ফাটে ।

গজাশিমুলের বসু-শবরদের এখন খাদ্যের চরম সংকট । রাজীব মাস্টার বিদেশ চলে গেছে আজ হপ্তা তিনেক । পৌঁছেই চিঠি দিয়েছিল সুচাঁদকে । সে চিঠি পাওয়া গেছে দু'তিন দিন আগে । মাস্টারবিহনে সংস্কৃতি সংঘর শো বন্ধ । রঙলালও কেন জানি আসছে না মাস দুয়েক । জঙ্গলের কাঠ-পালা কেটে বিক্রি করতে যাচ্ছে কেউ কেউ, কিন্তু কেনার লোক বিরল । সকলেই কেমন যেন থম মেরে রয়েছে । আগামী দিনগুলো কত ভয়াল হতে পারে, সেই শঙ্কায় ব্যাকুল সবাই । কাঠ-কুঠো কিনে সঞ্চিত অর্থটুকু খরচ করে ফেলতে চাইছে না কেউই । ফলে, এই দারুণ দুঃসময়ে গজাশিমুলের বসু-শবরদের দুর্দশার অন্ত নেই ।

পাশাপাশি সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ গাঁগুলো থেকে দলে দলে মানুষ চলে যাচ্ছে পুবের জেলাগুলোতে খাটতে । সেখানে মাঠ-ঘাটে অঢেল কাজ । রবি চাষ বোরো চাষ সে দেশে প্রচুর । সেচের জলও অফুরন্ত । সে দেশে সস্তায় প্রচুর সংখ্যায় লেবার চাই সংবৎসর । এ তল্লাটে বসমত্তার বুক ফেটে চৌচির বটে, ওদেশে কিন্তু 'ক্যাঁদেল' আর 'শেলো'র জলে চাষের কাজ শুরু হয়ে গেছে । ওদের মতো বোঁচকা-বুঁচকি লট-বহর বেঁধে চলে যেতে পারলে ভালই হত । বেঁচে যেত গজাশিমুলের মানুষ । কিন্তু বসু-শবররা যে ঐ কাজটি পারে না কিছুতেই। ক্ষেত-মাঠের কাজে তারা নেহাতই আনাড়ী । ঐ বিদ্যাটা ভগবান তাদের, যে কোনও কারণেই হোক, দেন নি । দুনিয়ার সব জাত শিখে ফেলল, কিন্তু চাষবাসের কাজটা বসু-শবরকুল শিখতে পারল না কিছুতেই । কাজেই, নাবালে যাওয়ার রেওয়াজ বসু-শবরদের মধ্যে একেবারেই নেই। ওরা জানেও না ও দেশের হাল-হদিশ । বসু-শবররা চিরকালই জঙ্গলের রাজা । জঙ্গলই তাদের চিরকালের স্বদেশ । জঙ্গলের ফল-পাকুড়, কন্দ-মূল, জন্তু-জানোয়ার

আর নদী-ঝরনার জল, —এই দিয়ে জীবন বেঁচেছে কোন গতিকে। কালক্রমে রঙলাল এসেছে, সে দেখিয়েছে অন্য পথ। চাষবাসের কাজকর্মটা আর শেখা হয়ে ওঠেনি। তবে অন্য এক ধরনের কাজে বসু-শবররা বেজায় দক্ষ। মাটি কাটার কাজ। বসু-শবরকে মাটি কাটতে বল, মাটি বয়ে বয়ে পাহাড় গড়তে বল, সে অন্য জাতের লোকের নাকে ঝামা ঘসে দেবে। বাবুদের মহল্লায় পুকুর কাটতে হলে কিংবা রাস্তাঘাটের কাজ হলে ওরা ভীড় করে সেখানে। ঐ কাজে সব্বাইকে হারিয়ে দেয়। বিশ ঝুড়ি মাটি বইবার পর, অন্যজাতের কুলি যখন এলিয়ে পড়েছে ক্লান্তিতে, বসু-শবর কুলির তখন গা গরমই হয়নি।

কিন্তু মাটি কাটবার কাজ কোথায় ? কোনও লক্ষণই তো নেই তার। রোজ সকাল হলেই দু'দশ জন জোয়ান মানুষ বেরিয়ে যায় গাঁ থেকে। ঘুরে ঘুরে বেড়ায় চারপাশের গাঁ-গঞ্জে, কাজকর্মের খোঁজ খবর নেয়। ফিরে আসে সন্ধ্যেবেলায়। কোনও খবর নেই কাজের। পঞ্চাতে কোন টাকাই আসে নি এখন তক্ক।

শুনতে শুনতে আশঙ্কা জমে মুরুব্বিদের মুখে। হায় ভগবান, এ মরসুমে বাঁচবেক ত গজশিমুলের মানুষ ! দুর্ভিক্ষ হবে নাকি, খাটারশাল !

এ সময়ে মাস্টারটা থাকলেও না হয় একটু বল-ভরসা পাওয়া যেত। সে তো গেল বিলাত। কবে ফিরবে ঠিক নেই।

দশরথ ভক্তা বলে, অ সুচাঁদ, তুই না হয় একটিবার রঙলালকে খবর দে। হুপটা-হুপটি কইর‍্যে তাড়ালি ক্যানে উয়ারে !

সুচাঁদ ভক্তার রাজদর্শন

বাঁকুড়ার কেঁদুয়াডিহির ডাঙায় বিশাল মণ্ডপ। দু'মানুষ উচুঁ মঞ্চ। রঙীন ঝালর দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। সামনে বাঁশ বেঁধে পুরো মাঠখানাকে আট-দশ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। লাউডস্পীকার খাঁচানো হয়েছে দশ-বিশ খানা। আজ মন্ত্রী আসবেন এখানে। বক্তৃতা দেবেন।

শুধু কেঁদুয়াডিহির ডাঙাই নয়। মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে সাজান হয়েছে পুরো শহরটাকে। এখানে- ওখানে তোরণ বানান হয়েছে আট-দশখানা। গন্ধেশ্বরীর পুল-পাড় থেকে মাচানতলা—চাঁদমারির ডাঙা—ভৈরবস্থান হয়ে কেঁদুয়াডিহির ডাঙা অবধি পুরো রাস্তার দু'ধারে বাঁশ আর শালবোল্লা পুঁতে ব্যারিকেড বানান হয়েছে। যাতে দর্শনার্থী জনতার চাপ রাস্তায় নেমে পড়তে না পারে। পুরো রাস্তার দু'ধারে ডজন ডজন পুলিশ সারবন্দী দাঁড়িয়ে। কেঁদুয়াডিহির ডাঙায়ও গিজগিজ করছে পুলিশ। কালো গাড়ি আর জলপাই রঙের জীপও অসংখ্য।

সুচাঁদ এসেছিল তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরে। গতবারের জেলা-সংস্কৃতি-মেলার বাবদ কিছু টাকা পাওয়ার কথা। তারই জন্য ঘুরছে আজ মাসতিনেক। প্রথমে বলল,এখন খরা চলছে সর্বত্র, সরকারের টাকা খরা খাতে খরচ হচ্ছে। তাই টাকা নেই। আবার বলল, পঞ্চাতের কাছ থেকে সার্টিফিকেট আনতে হবে। পঞ্চাত ঘোরাল বার তিনেক। আজ প্রধানবাবু নেই, কাল মিটিং করছেন, পরশু অন্য কিছু। অবশেষে সার্টিফিকেট মিলল। সার্টিফিকেট দিতে দিতে প্রধানবাবু বললেন, 'শুধু সার্টিফিকেট লিতে এইলেই চলবেক নাই। মিটিং-মিছিলেও আসতে হবেক, বুঝলি ? শিগ্গির তুয়াদ্যার গাঁয়ে যাবো। সব্বাইকে বলে রাখিস।'

সেই সার্টিফিকেট নিয়ে সুচাঁদ আজ এসেছিল। কিন্তু কাজের কাজ হলো না কিছু। সর্বত্র আজ শুধু দৌড়ঝাঁপ চলছে। কারুর দম ফেলবার ফুরসত নেই। তথ্য-অফিসার তো সুচাঁদের পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন। চিনতেই পারলেন না। বাধ্য হয়েই ফিরে আসতে হল। বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে দেখল, বাস নেই। কেন নেই, কখন মিলবে, তার হালহদিশ কেউ বলতে পারে না ঠিক ঠিক। বহুত খোঁজখবর করে জানা গেল, আজ বাস চলবার আশা নেই। কারণ সব লাইনের বেশির ভাগ বাসই মিটিংএর জন্য লোক বইছে। সুচাঁদ বুঝল, আজ আর তাদের গজাশিমুল ফেরা হল না।

সঙ্গে রয়েছে বদন কোটাল। বলল, 'ফিরাই যখন হচ্ছে নাই, তখন চল, মন্ত্রী দেখি।' দুজনেই রাজ্য মেলায় কিংবা জাতীয় মেলায় অন্য মন্ত্রীদের দেখেছে, কিন্তু এই মন্ত্রীকে দেখবার সুযোগ ঘটে নি এ যাবত। তাই হাতের কাছ অমন সুযোগখান পেয়ে হেলায় হারাতে চাইল না ওরা। দু'জনে পা চালাল কেঁদুয়াডিহির দিকে।

এখন দুপুর। কেঁদুয়াডিহির ডাঙায় ইতিমধ্যে লোক জমতে শুরু করেছে। মাইকগুলো ঘনঘন হুঁক্‌রাচ্ছে। পুলিশবাহিনীর ছোটাছুটি, ব্যস্ততা ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু কেউই সঠিক বলতে পারছে না, মন্ত্রী কখন আসবেন। কেউ বলে, তিনি দুর্গাপুর হয়ে মোটরে আসবেন। এমন সে মোটর, যাতে বন্দুকের গুলিও নাকি বেঁধে না। কেউ বলছে, তিনি এসে গিয়েছেন। ভৈরবথানের পাশটিতে যে সরকারী বাংলো, সেখানেই খেয়ে ঘুমোচ্ছেন। কে যে ঠিক বলছে, কে যে বেঠিক, সেটা বোঝা মুশকিল। তবে এটা ঠিক, তিনি যখন যে পথেই আসুন, এই মাঠে এসে, এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবেনই। কাজেই সুচাঁদ আর বদন কোটাল ভিড় ঠেলে এগোতে লাগল। মঞ্চের ঠিক সামনেটিতে দাঁড়াবার বাসনা। যাতে মন্ত্রীকে এক্কেবারে পাশ থেকে দেখতে পায়।

মঞ্চের পাশাপাশি পৌঁছুতে হল না। তার আগেই হৈ হৈ করে ছুটে এল একদল পুলিশ। ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল দু'জনকেই। হটো, হটো। দূর হটো। মঞ্চের একশো হাতের মধ্যে কাউকেই দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। কাউকেই নয়। বদন কোটাল তো ধাক্কার চোটে মুখ থুবড়ে পড়েই যাচ্ছিল। সুচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলায় কোনক্রমে সামলে নিল সে।

পুলিশের ধাক্কা খেতে খেতে পেছোচ্ছিল সুচাঁদ আর বদন কোটাল। পেছোতে পেছোতে এক্কেবারে মাঠের মাঝামাঝি জায়গায় চলে গেল ওরা। সেখানে ততক্ষণে লোক জমেছে কয়েক শো। কলকল করছে জমায়েত। চিৎকার, হৈ-চৈ। ঠেলাঠেলি। তার মধ্যেও মুখরোচক গল্প জুড়েছে মানুষ। মন্ত্রীর রূপ, গুণ, খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, হালচাল, বিলাস-ব্যসন নিয়ে নানান্ মুখরোচক গল্প। শুনতে শুনতে তাজ্জব বনে যায় সুচাঁদরা। এই মঞ্চখানা নাকি দু'লাখ টাকা দিয়ে বানানো হয়েছে? সারা শহরে তোরণ বানাতেই নাকি একলাখ টাকা খরচ? রাস্তার দু'ধারে ব্যারিকেড বানাতেও নাকি হাজার পঞ্চশেক? এ ছাড়া খানা-পিনা, রাস্তা মেরামত, জীপ-মোটর-মাইক— বাপ্‌রে, সব মিলিয়ে তাহলে কতলাখ টাকার ব্যাপার? মন্ত্রীর একবেলা থাকবার জন্য সরকারী বাংলোটিকে নাকি আগাপাস্তালা চুনকাম ও রঙ করা হয়েছে। পালটে ফেলা হয়েছে সমস্ত পুরোনো আসবাব। নতুন দামী আসবাব, বিছানা-বালিশ, গদি-মোড়া চেয়ার, কার্পেট-পর্দা-আলোবাতি, পায়খানার প্যান অবধি বদলানো হয়েছে। এসব নিয়ে উপস্থিত জনতা দু'দলে বিভক্ত। একভাগের বক্তব্য, একটা মানুষের ঘণ্টাখানেকের জন্য

আসবার পেছনে খরচ যা পড়ছে, তাতে সারা জেলার সব গাঁয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া যেত। এ জেলার অর্ধেক গাঁয়ের মানুষ যে এখনও পুকুরের জল খায়। অন্য দলের বক্তব্য, দেশের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী বলে কথা! তাঁর জন্য এটুকু ব্যবস্থা না করলে এ রাজ্যের মান থাকে না। হাজার হোক দিল্লীর কাছে মাথা তো হেঁট করা যায় না। সুচাঁদ ভক্তারা এসব কথার অল্পস্বল্পই বোঝে। বেশির ভাগই তাদের বোধগম্য হয় না। তারা শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে এর ওর দিকে তাকায়, আর অপেক্ষা করে, কখন মন্ত্রী আসেন।

বেলা তিনটে নাগাদ কেঁদুয়াডিহির ডাঙায় তিল ধারনের ঠাঁই নেই। মাইকগুলো সজোরে গর্জন করে চলেছে। আচমকা খান-পনেরো গাড়ির এক বিশাল কনভয় এসে থামল মঞ্চের দিকটায়। বহু মানুষ পিলপিল করে ছুটতে লাগল। ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি করে এগোতে লাগল গাড়িগুলোর দিকে। দেখাদেখি সুচাঁদ আর বদন কোটালও ছুটতে লাগল সেদিকে। খানিক এগিয়ে বাধা পেল ওরা। সামনের লোক পিছিয়ে আসছে ক্রমশ। সামনে শয়ে শয়ে পুলিশ লাঠি হাতে ব্যারিকেড তৈরী করে দাঁড়িয়েছে। প্রয়োজনে মৃদু লাঠি চার্জ করে হটিয়ে দিচ্ছে উদাত্ত জনতাকে। জনতার ভীড় থেকে দূরে সরে গেল সুচাঁদরা। মাঠের একেবারে বাইরে চলে এল। ওখানে পুলিশের লাইনখানা নেই। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু পুলিশ ঘুরছে। প্রবল কৌতূহলে ওরা এগিয়ে চলল মন্ত্রীর গাড়ির দিকে।

গাড়িগুলোর প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল ওরা। আচমকা এক পুলিশ এসে খপ্ করে ধরে ফেলল সুচাঁদের হাত।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?'

'উই উদিগে।' সুচাঁদ ভয়ে ভয়ে জবাব দেয়।

'ওদিকে কোথায়?'

'হুই গাড়িটার পাশ।'

'ওখানে কি দরকার? যাও, খবরদার যেন এদিকে না দেখি'।

সুচাঁদ আর বদন কোটাল যেন ছাড়া পেয়ে বাঁচল। প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে এল নিরাপদ দূরত্বে।

মন্ত্রী তখন মঞ্চে উঠে পড়েছেন। মাঝখানের চেয়ারটিতে বসেছেন তিনি। বক্তৃতা শুরু করেছেন অন্য একজন। বেশ রাগী রাগী গলায় সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন তিনি। অত দূর থেকে মন্ত্রীকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। কেমন ছবি-ছবি, পুতুল-পুতুল লাগছিল। অথচ সুচাঁদ আর বদন কোটালের বেজায় ইচ্ছে, মন্ত্রীকে একটিবার কাছ থেকে দ্যাখে। অনেকক্ষণ ধরে ঐ কথাটাই ভাবছিল দু'জনে। উশখুশ করছিল মনে মনে।

মঞ্চ থেকে প্রায় একশো হাত মত জায়গা ফাঁকা রেখে মানুষ বসেছে। সুচাঁদ ভাবল, একেবারে সামনের সারিতে গিয়ে ঝুপ করে বসে পড়লে কেমন হয়? বদন কোটালকে কথাটা বলতেই সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। ছেলেবেলায় যাত্রাগানের আসরে এই পদ্ধতিতে অনেকবারই বসেছে সে। আসর টইটুম্বর। কোথাও তিল ধারনের ঠাঁই নেই। আচমকা আসরের মধ্য দিয়ে ছুটে গিয়ে একেবারে সামনেটিতে বসে পড়া। ছেলেবেলায় এ কম্মো তো বহুবারই করেছে। আজ একবার নেবে নাকি ঐ পদ্ধতিটা?

ভাবতে ভাবতে ফাঁকা জায়গার একেবারে ধারটিতে এসে দাঁড়াল সুচাঁদরা।

সুচাঁদ বলল, 'আয় দৌড় মারি । এক দৌড়েই চইলে যেতে হবেক সামনের সারিতে। বসে পড়বি ঝুপ কর‍্যে ।'

বলতে বলতে দৌড় মারল সুচাঁদ । পিছু পিছু বদন কোটাল । সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ আওয়াজ উঠল পেছনে । পুলিশ বাহিনীর মধ্যে সোরগোল পড়ে গেল । এবং ফাঁকা জায়গার আধাআধি পৌছুবার আগেই একদল পুলিশ পিস্তল উঁচিয়ে ঘিরে ফেলল ওদের । ততক্ষণে ডজনখানেক লাঠিধারী সিপাইও এসে গেছে অকুস্থলে । জাপটে ধরেছে সুচাঁদ আর বদনকে । একজন পিস্তলধারী পুলিশ বলল, 'এ দুটো ছোকরা বার বার মঞ্চের কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করছিল তখন থেকে । একবার তো ভি-ভি-আই-পির গাড়ির একেবারে পাশটিতে চলে গিয়েছিল ।'

সে কথায় সন্দেহে ছোট হয়ে এল অন্যাদেরচোখ । পুলিশের বড়-কর্তা বললেন, 'এদের নিয়ে গিয়ে লক্‌আপে ভরে দাও । পরে দেখা যাবে ।'

শোনামাত্তরই সিপাইরা ওদের হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে গিয়ে চলল কালোগাড়ির দিকে।

সুচাঁদ আর বদন কোটাল খালি কাঁদছিল হাউমাউ করে । কাঁদতে কাঁদতে বলছিল শুধু গুটি কয়েক কথা, 'মোদ্যার ছেইড়ে দ্যান্ আইজ্ঞা । মোদ্যার কুনো দোষ নাই । মোরা লাচগান করে মেডেল পেইয়েছি ।'

একজন সিপাই ওদের ধাক্কা মেরে বলল, 'আগে থানায় চল্, তারপর নাচ কাকে বলে টের পাবি ।'

সুচাঁদ আর বদন কোটালকে নিয়ে কালোগাড়ি দুটো চলল থানার দিকে ।

পেছন থেকে তখন ভেসে আসছিল মন্ত্রীর ভাষণ : মেরা গরীব ভাইয়োঁ, আউর বহিনো— ।

রাজীবের দিগ্বিজয় পর্ব

দুপুর নাগাদ সুনীল এল গজাশিমূল গাঁয়ে ।

সুচাঁদের বন্ধু ছিল এককালে, রাজীব মাস্টারকে ওই প্রথম নিয়ে এসেছিল গজাশিমূল গাঁয়ে । দশরথ ভক্তা ওকে আদর করে বসাল । সুচাঁদ গিয়েছিল জঙ্গলে, একটুবাদে ফিরে এসে সুনীলকে দেখে তো অবাক । দিন কতক আগে, বাঁকুড়াশহরে মন্ত্রীর মিটিং শুনতে গিয়ে থানায় যেতে হয়েছিল সুচাঁদ আর বদন কোটালকে । দু'দিন দু'রাত ওদের আটকে রেখেছিল পুলিশ । ঘণ্টায় ঘণ্টায় জেরা করেছে, মারধরও করেছে । এক সময়, আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই বুঝি ছেড়ে দিয়েছে ওদের ।

সেই তিক্ত স্মৃতিখানি রোমন্থন করতে করতে দু'চোখ কপালে উঠে যায় দশরথ ভক্তার, বাপরে বাপ, শুধু দেখতে যেইতেই হাজতবাস, কিছো চাইলে না জানি কি দুর্গতি হবেক্। তো, আশার কথা, মন্ত্রী নাকি দিল নিংড়ে দুখ জানিয়েছেন । অনেক আশা-ভরসাও দিয়ে গিয়েছেন । গাঁও পিছু এক-এক 'ইনার', পর্যাপ্ত খাদ্য আর প্রচুর সংখ্যায় মাটি-কাটার কাজ। ফিরে গিয়েই নাকি সব মঞ্জুর করে দেবেন তিনি । তা, কতদিন তো হয়ে গেল, কোথায় কুয়ো, কোথায় খাদ্য, কোথায় কাজ !

তো, হাজত থেকে বেরিয়েই তামলিবাঁধ বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে হাঁটছিল সুচাঁদ আর বদন

কোটাল। আচমকা সুনীলের সঙ্গে দেখা। সুনীল ওদের পেট ভরে খাইয়েছিল। মন দিয়ে শুনেছিল ওদের এলাকার দুর্গতির কথা। বলেছিল, শিগ্‌গির যাব তোদের গাঁয়ে। ভাবিস নে, একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। কিন্তু সে যে অত জলদি কথা রাখবে, তা ভাবেনি সুচাঁদ।

সুনীল তার ব্যাগের ভেতর থেকে একতাড়া কাগজ বের করে।

'স্যার পাঠিয়েছেন এসব চিঠি, ছবি, খবরের কাগজের কাটিং...।'

সুনীলকে ঘিরে ধরে গজাশিমুলের মানুষজন। ব্যাকুল-মুখে শুনতে থাকে মাস্টারের কথা। দেখতে থাকে ছবিগুলো।

'ওদেশের শহরগুলোতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, স্যার' সুনীল প্রাঞ্জল করে বোঝাতে থাকে, 'পালাগানের অনেক ক্যাসেট বানিয়ে দিয়েছিল জনসন, বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো সিনেমার মত করে দেখাচ্ছেন। ওঁর বক্তৃতা শুনতে, আর সিনেমায় তোদের নাচ-গান দেখতে, শহরের মানুষ ঝেঁটিয়ে আসছে। ঘন্টার পর ঘন্টা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছে। ওদেশের খবর কাগজগুলো হৈ হৈ করে ছাপছে সে খবর। সঙ্গে স্যারের ছবিও। এই দ্যাখ—।' সুনীল একের পর এক খবর কাগজের কাটিংগুলো মেলে ধরে ওদের সুমুখে। পাতায় পাতায় মাস্টারের রঙীন ছবি, লোকগুলো অবাক চোখে দেখতে থাকে, কাছ থেকে, দূর থেকে পাশ থেকে তোলা রাজীব মাস্টারের বিভিন্ন ভঙ্গিমার ছবি, খবর-কাগজের পাতা জুড়ে। ভুলভুল চোখে দেখতে থাকে গজাশিমুলের মানুষ, তাদের অতি কাছের আপনার জনটি কত দূরে গিয়ে, কী সব করে বেড়াচ্ছে সাহেবদের দেশে, ভাবতে গিয়ে ওদের শীর্ণ বুকগুলো দেমাকে ফুলে ফুলে ওঠে। শুধু মাস্টারেরই নয়, কয়েকটা কাগজে রঙী, কৌশল্যাদের ছবিও ছেপেছে, ওদের পালাগানের কয়েকটি দৃশ্যও রয়েছে।

দশরথ ভক্তা বলে, 'সব ত হইল্যাক বাপ, ইদিগে আমরা যে ইখ্যেনে ভোখে মরি। ও সুচাঁদ, তুই মাস্টারকে লিখে দে বাপ। লেখবি, গজাশিমুলের মানুষ খাদ্য-বিহনে মইর্‌ত্যে বসেছে। তুমি জলদি জলদি ফির্‌্যে আইস।'

সুনীল বলে, 'তাঁর এখনই ফেরার উপায় নেই। আরো তিন-চারটা শহরে বক্তৃতা দিতে হবেক তাঁকে। অন্তত মাসটাক সময় লাগবেক।'

এক মাস। সংশয়ে দুলে ওঠে গজা শিমূলের মানুষ। তদ্দিন কি বাঁইচ্‌বো আমরা!

সুনীল এবার আসল কথাটা ভাঙে। বলে, 'সুচাঁদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই আমি কথা বলেছিল্যাম মিস্ বার্ডের সঙ্গে। ভরসা দিয়েছেন তিনি, খয়রাতি খাদ্য হয়ত হবে না, তবে একটা মাটি-কাটার কাজ খোলা যায় কিনা দেখছেন।'

'কে চায় হে তুমার খয়রাতি!' দশরথ ভক্তা হুমড়ি খেয়ে পড়ে, 'মাটি কাইট্‌বার একটা কাজ পেলে বেঁচে যাই, বাপ। তুই জলদি বেবস্থা কর্।'

ক্যাথি বার্ডের তিন চমক

রাজীব কোলকাতায় পা ছোঁওয়ানর সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাথি বার্ড বলেছিল, 'যাও, একবার গজাশিমূল ঘুরে এস। সেখানে তোমার জন্য অনেক চমক অপেক্ষা করছে।'

'চমক?' রাজীব অবাক চোখে তাকায়।

'তোমার ভিলেন বোধ করি আবার দখল নিয়েছে গজাশিমূল গাঁয়ের।' খুব বিষণ্ণ

মুখে বলে ক্যাথি বার্ড । রাজীবের সারা শরীর নিঃশব্দে কেঁপে ওঠে । সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ক্যাথি বার্ডের দিকে ।

গম্ভীর মুখে ক্যাথি বলে, 'কী করবে বল বেচারার দল ? দারুণ খরায় পুরো এলাকা পুড়ছে, ওদের কাজ নেই, খাবার নেই, মরতে বসেছে সব । আর, ওদের ফ্রেণ্ড-ফিলোসফার অ্যাণ্ড গাইডটি তখন বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে ! রঙলাল ছাড়া ওদের উপায় কি ?'

'খরা হয়েছিল নাকি, ঐ এলাকায় ?' রাজীবের চোখে মুখে উদ্বেগ চাপা থাকে না ।

'তুমি অত দূরে বসে জানবেই বা কি করে ! গোটা জেলাটাই পড়েছিল নিদারুণ খরার কবলে । সে যে কি কষ্ট, তুমি ভাবতেই পারবে না ।'

রাজীবের চোখ-মুখ বদলে গিয়েছে ততক্ষণে । সারা মুখে বেদনার গাঢ় ছায়া. । উদ্বিগ্ন গলায় বলে, 'রঙলাল কি আবার অ্যাডভান্স দিয়েছে ওদের ?'

এতক্ষণে মুচকি হাসে ক্যাথি বার্ড, 'ভয় নেই, অতবড় সর্বনাশটা হতে দিই নি । যাগ্ গে — ।' ব্যাগ থেকে একটা ছাপানো কাগজ বের করে এগিয়ে দেয় রাজীবের দিকে, 'নাও, ধর ।'

'কী এটা ?' রাজীব পড়তে থাকে কাগজটা । একখানা মোটর সাইকেলের চালান ।

ক্যাথি বার্ড মিটি মিটি হাসছিল । বলে, 'ভেবে দেখলাম, দু'দিকের কাজকর্ম সামলাতে গেলে তোমার একটা টু-হুইলার একান্তই দরকার । লাগেজ-ভ্যানে বুক করে দিয়েছি । বাঁকুড়ায় গিয়েই ডেলিভারি পাবে ।' নীল চোখ নাচিয়ে ক্যাথি বলে, 'এবার বল, কত্তোখানি ভালবাসি তোমায় ! তোমার কথা কত ভাবি !'

রাজীব তো হতবাক । প্রাথমিক বিহ্বল অবস্থাটি কাটিয়ে উঠে তাকাল ক্যাথির দিকে। বলল, 'এটা বুঝি তোমার প্রথম চমক ?'

নিঃশব্দে হাসে ক্যাথি বার্ড ।

'আর দ্বিতীয় চমকটা ?'

'সেটা গজাশিমুলে গেলেই দেখতে পাবে ।'

ছ্যাঁদাপাথর পেরোতেই দ্বিতীয় চমকটি অপেক্ষা করছিল রাজীবের জন্য । ছ্যাঁদাপাথর থেকে যে পায়ে চলা শুঁড়ি-পথটা ছিল, সেটা অনেকখানি চওড়া এবং ড্রেস করা । মোটর সাইকেল তো বটেই, একখানা জীপও কষ্টে-সৃষ্টে চলে যাবে ।

গজাশিমুলে পা দিয়েই চোখ একেবারে আটকে গেল রাজীবের । পুরনো আখড়া-ঘরটার কাছাকাছি একটি ছিমছাম নতুন বাড়ি । কাঠের দেওয়াল, লাল টালির চাল, সামনে উঁচু বারান্দা, ছোট্ট বাগান, কাঠের রেলিং দেওয়া পাঁচিল, সুদৃশ্য কাঠের গেট, গেটের মুখে সুন্দর সাইন-বোর্ড, 'গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘ ।' ছবির মত বাড়িখানি বাংলো প্যাটার্নের, চোখ জুড়িয়ে যায় । দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যায় রাজীব । তার বুকের মধ্যে কুলকুল করে বইতে থাকে পুলকের নদী । কী করেছে মেয়েটা, মাত্র দু'তিন মাসের মধ্যে ! একে তো অসাধ্য-সাধন ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না । নাহ্, মেয়েটার ক্ষমতা আছে, মনে মনে স্বীকার করতে হয়ে রাজীবকে । হবেই তো, হাফ্ অব্ ইণ্ডিয়ায় দেশের কালচার‍্যাল মিশনকে নেতৃত্ব দিচ্ছে

যে মেয়ে, তার মধ্যে অসাধারণত্ব তো থাকবেই। মোটর সাইকেলটাকে গেটের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে রাজীব হেঁটে গেল গজাশিমুল গাঁয়ের দিকে।

রাজীবকে দেখে দশরথ ভক্তা বেশ খানিকক্ষণ ভুলভুল করে তাকিয়ে থাকে। ঘোরটা যেন কিছুতেই কাটতে চায় না তার। সহসা সে গলা ফাটিয়ে চেল্লাতে থাকে, 'ওরে, তুয়ারা কে কুথা গেলু, দেইখে যা কে এইসেছে — ।'

ওর চিৎকারে চারপাশ থেকে ধেয়ে আসে সবাই। মুহূর্তে শোরগোল পড়ে যায়। মাস্টার আঁইছে, আমাদ্যার মাস্টার, ফিরে আঁইছে গো — ।

ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখ রাজীবের। তীব্র অপরাধ-বোধে পুড়ছে তার বুক। এমন ঘোর দুর্দিনে সে যে দাঁড়াতে পারে নি মানুষগুলেরা পাশে, সে যে ঠাণ্ডার দেশে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছে আর কাগজে কাগজে ছবি ছাপিয়েছে, এই কারণেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিল না কিছুতেই। তার ওপর গজাশিমুলের আপামর মানুষ যখন এসে ঢুপ ঢুপ প্রণাম করতে শুরু করল, তখন তার লজ্জার সীমা রইল না।

চারপাশে ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে সুহাগী, কৌশল্যা, সরেস্বতী, দাঁড়িয়েছে মাদল মল্লিক, কান্‌চা মল্লিক, বদন কোটাল আরো অনেকে। নেই কেবল সুচাঁদ। কে যেন একটা তালাই এনে পেতে দিল এক চিলতে বারান্দায়। রাজীব বসল। চারপাশে চোখ চারিয়ে খুঁজতে লাগল সুচাঁদকে। রঙীকেও দেখছে না রাজীব। রঙী কেন এখনও গর-হাজির? ভাল আছে তো মেয়েটো?

দশরথ ভক্তা বলে, 'আপনি যে অদ্দুরে থাইক্যেও আমাদ্যার কথা মনে রেইখেছেন মাস্টার — ঠিক সময়ে টাকা না পাঠালে, গজাশিমুলের মানুষের অদ্দিনে মড়াচীরে ঘাস গজাঁই যাইত্তো।'

রাজীবের বিস্ময়ের মাত্রাটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। মুখ দিয়ে বাক্য বেরোচ্ছিল না তার। দশরথ ভক্তার সেদিকে লক্ষ্যই নেই, সে তখন স্মৃতি রোমন্থনে ব্যস্ত। খাদ্য বিহনে, কাজ-কাম বিহনে যখন মরতে বইসেছে গজাশিমুলের মানুষ, তখনই একদিন উই সাদা মেয়্যাটাকে লিয়ে সুনীল এসে হাজির। বলে, মাস্টার টাকা পাঠাই দিছে। উই টাকা দিয়ে একটা ঘর বানাও তুমরা, আর ছ্যাঁদাপাথর থিকে গজাশিমুল তক্ক রাস্তাটাকে ঠিকঠাক কইর‍্যে লাও। রাস্তা হল্যাক, ঘর হল্যাক, সব বানাল্যাক গজাশিমুলের মানুষ, মজুরী পেল লগদা, খেইয়েঁ বাঁচল্যাক।

এইটেই কি ক্যাথির শেষ চমক? নাকি আরও আছে! মনে মনে ভাবছিল রাজীব। মেয়েটাকে যেন প্রতিদিন নতুন করে আবিষ্কার করছে সে। দশরথ ভক্তা বলেই চলেছে। মাস্টারের অপার করুণা নিয়ে আরও অনেকক্ষণ বক্তৃতা না দিয়ে থামবে না সে। কান্‌চা মল্লিক দাঁড়িয়েছিল সামনেটিতে। ওকে দেখে রাজীবের কপালে ভাঁজ পড়ে। কেমন যেন শুকনো, বিষণ্ণ লাগছে ওকে। চোখ দুটি যেন ঈষৎ ছলছল। কান্‌চার মত হৈ-হুল্লোড়ে ছোকরার সঙ্গে ওর বর্তমান রূপকে মেলানো যাচ্ছে না কিছুতেই।

'কি হয়েছে রে কান্‌চা? তোকে এমনটি লাগছে কেন?'

সে কথায় সবাই মুখ ফেরায় কান্‌চার দিকে।

যারপরনাই লজ্জিত হয় দশরথ ভক্তা, 'তুমাকে বইলতে একদম ভুইল্যে গেঁইছি মাস্টার। কান্তো দাদা মোর, চইলে গিছেন।' বলতে বলতে দমকে দমকে কান্না আসে দশরথ ভক্তার

গলা ঠেলে, মুখের ভাষা চাপা পড়ে যায়, শুধু রোদনের ভাষায় কথা বলে চলে সে, প্রকাশ করে চলে তার গাঢ় অন্তহীন শোক ।

সারা জমায়েত পাথরের মতো জমাট বেঁধে গেছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেউ কেউ । স্তব্ধ হয়ে গেছে রাজীবও, এই তো মাস কয় আগে, বিদেশে যাওয়ার প্রাক্কালে, রাজীবের চিবুক নাড়িয়ে ইলচি করেছিল কাস্তো, 'যাও যাও, মাস্টার, তেবে উ'দেশ থিক্যে একটা লাত-বউ লিয়ে ফিরবে ।'

'ঠিক আছে, তোমার জন্যও একটা নিয়ে আসব ।' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল রাজীব ।

'আমার তরে ।' মশকরার ছলেই বলেছিল কাস্তো মল্লিক, 'ফিরে এইস্যে আমাকে দেইখ্‌তে পাও কিনা সিট্যাই ভাব । শুধু-মুদু বিচারি বিধবা হব্যেক ।'

স্তব্ধ হয়ে বসে সেইসব কথাই ভাবছিল রাজীব । ঠাট্টা করে যে কথা বলেছিল কাস্তো, সেটাই সত্যি হল তবে ! ক্যাথি বার্ড বোধ করি জানে না এখবর । জানলে, বলত । এবারে পরপর অনেকগুলি চমক দিয়েছে ক্যাথি । কিন্তু এই চমকটাই, যা ক্যাথি দেয়নি, ছাড়িয়ে গেল সবাইকে । বড় পাঁজর-ভাঙা চমক ।

রাজীব সবাইকে সান্ত্বনা দিতে থাকে । সুচাঁদকে খুঁজে বেড়ায় । একসময় বলে, 'সুচাঁদ কোথায় ? রঙীকেও তো দেখছি নে ?'

সবাই সামলে সুমলে নেয়, ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসে । বলে, 'সে, আইজ্ঞা, গেঁইছে ঝাড়েশ্বর কোটালের ঘর ।'

দশরথ ভক্তা বলে, 'রঙীটার নাকি ভারি অসুখ ।'

'কি অসুখ ?' চমকে ওঠে রাজীব ।

'কে জানে ? ঝাড়েশ্বরিয়া তা কিছো খুইল্যে বলে না । উ নাকি বিছ্না থিকে উঠতেই পারে না ।'

বলতে বলতে সুচাঁদ এল । চোখ-মুখ একেবারে বসে গেছে ওর । বয়েসখানাও যেন বেড়ে গেছে অনেক । শরীরখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে । সারা মুখে, রাজীব লক্ষ্য করে, এক ধরনের চাপা বিষাদ ।

সুচাঁদ বলে, 'কবে ফিরলেন মাস্টারদা ?'

সে কথার জবাব না দিয়ে রাজীব শুধোয়, 'রঙী কেমন আছে সুচাঁদ ?'

'জানব কি কর্যে ? উয়াকে কি চোখে দেখতে পাচ্ছি আমরা ? ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকে সে দিনরাত ।'

'কি হয়েছে তার ?' উৎকণ্ঠায় ভারি হয়ে আসে রাজীবের মুখ ।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকে সুচাঁদ ।

তারপর মৃদুগলায় বলে, 'সিট্যাও জানি নাই । ঝাড়েশ্বরমামু বলে, খেলেই নাকি বমি হইয়েঁ যায় উয়ার । শরীর নাকি দুর্বল, এক ফোঁটা নাকি রক্ত নাই শরীরে । উ নাকি সারাক্ষণ লিদাই থাকে ।' বলতে বলতে সহসা চিকচিকিয়ে ওঠে সুচাঁদের চোখ দুটি ।

রাজীবের চোখ এড়ায় না তা । কারণটাও বোঝে সে । খুব সম্প্রতি রঙীর সঙ্গে সুচাঁদের সম্পর্কের কথাটা, আর কেউ না জানলেও, রাজীবের কিছুই অজানা নেই । রঙীর

অভাবটা এই মুহূর্তে রাজীবও অনুভব করছে খুবই। গজাশিমুল গাওন দলে রঙীই ছিল একাই একশো। যেমন ছিল তার শরীরের বাঁধুনি, তেমনই ঢলঢলে চোখমুখ। বসু-শবরসমাজে এমন নিটোল রূপ সহসা চোখে পড়ে না। আর নাচটা তার, বলতে গেলে, ঈশ্বর প্রদত্ত, যেমন রক্তের মধ্যেই রয়েছে তা। মঞ্চে একাই ঝড় তুলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে মেয়েটা। দলের অন্য মেয়েদের থেকে ও একেবারেই আলাদা। ওর জাতই স্বতন্ত্র। মঞ্চে ওর নাচ-গান দেখে চোখ ফেরাতে পারে না শহুরে মানুষগুলো। রাজীবের কোনই সন্দেহ নেই, রঙী না থাকলে দলটা একেবারেই কানা হয়ে যাবে।

দু'চারটে কথাবার্তা বলে, সুচাঁদকে নিয়ে বেরিয়ে এল রাজীব। পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগল সংস্কৃতি সংঘের নতুন বাড়িটির দিকে।

সুচাঁদ পুতুলের মত হাঁটছিল রাজীবের পাশে পাশে।

ওকে দেখতে দেখতে রাজীব বলে, 'ভাবিস নে সুচাঁদ, রঙীকে আমবা ভাল করে তুলবই। সদরের হাসপাতালে নিয়ে যাব ওকে, দরকার হলে কোলকাতায়। আমাদের ফাণ্ডে টাকা রয়েছে, ভয় কি ?'

সুচাঁদ জবাব দেয় না। কেবল দু'চোখে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা নিয়ে তাকিয়ে থাকে, রাজীবের দিকে।

বাংলো-প্যাটার্নের অফিস ঘরটি বাইরে থেকে দেখলে ভাল লাগছিল, কিন্তু ভেতবে ঢুকে একেবারে তাজ্জব বনে যায় রাজীব। একটা বড়সড় হলঘর, রিহার্সেলের জন্য। মেঝেতে পুরু শতরঞ্চি পাতা। কাঠের দেওয়ালে দামী রঙের প্রলেপ। দেওয়ালে সারি সারি বাঁধানো ফটো। গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘর অজস্র ক্রিয়াকলাপের ছবি সব। ঘরের এককোণে বাদ্যযন্ত্র, হ্যাজাক এবং সাজসরঞ্জামের বাক্সগুলি পরিপাটি করে সাজানো। হলঘরের পাশেই দুটি মাঝারি ঘর। রঙ করা, ঝকঝকে দেওয়াল। ক্যাম্প খাট, আলনা, চেয়ার টেবিল ...। দুটি ঘবের লাগোয়া একটি চানের ঘর। সুচাঁদ বলে, গেস্ট-হাউস। বাইরের লোক এইলে থাইকব্যেক ইখ্যেনে।

দেখতে দেখতে গম্ভীর হয়ে যায় রাজীব। যেন এক অচেনা জগতে প্রবেশ করেছে সে। এ যেন তার নিজস্ব কিছু নয়, যেন অন্যের রচনা করা সংসারে তার আগমন ঘটেছে। কারও প্রতি কোনও বিরূপতা নয়, আসলে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা বোধ তিল তিল গ্রাস করতে থাকে রাজীবকে।

গজাশিমুল গাঁয়ে বজ্রপাত

শতরঞ্চি বিছানো মেঝের ওপর বসল রাজীব। একে একে জুটল সবাই।

রাজীবের মুখখানা এখন ভীষণ গম্ভীর লাগছে। একটু আনমনা। মনের মধ্যে বহু কারণে ঝড় ঝাপটা চলছে। কাস্তো মল্লিকের মৃত্যুটাকে যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সে।

একথা সে কথার পর কাজের কথাটি তুলল রাজীব 'রাজ্য মেলার তো আর দেরি নেই।'

'আমরাও তিয়ার আইজ্ঞা।'

রাজীব একটুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তারপর বলে, 'ঐ পুরনো পালা নিয়ে গেলে এ বছর আর মেডেল মিলবে না। নতুন পালা চাই। নতুন গান। নতুন নাচ।'

'ঝাঁপান-লাচ আর পাতা-লাচ আছে। তা বাদে, বিহা গীত আছে, আষাঢ়িয়া আছে। উগুলান তো পুরানো হয় নাই।'

'একেবারে পুরোনো না হলেও গতবছর প্রায় চার-পাঁচ আসর গান হয়েছে কোলকাতায়। পাটনায়ও দু'চার আসর।' বলতে বলতে রাজীবের চোখে মুখে চিন্তাটা গাঢ় হয়, 'তাছাড়া এবারে মালদা থেকে খুব ভালো গম্ভীরার দল আসছে। মটরবাবু আসছে একদম নতুন পালা নিয়ে। রায়গঞ্জ থেকে শিশিরবাবু নিয়ে আসছে 'হালুয়া-হালুয়ানী'। ওদের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে হলে নতুন কিছু চাই। একেবারে চমকে দেবার মত কিছু। এমন কিছু চাই — ।'

কথা শেষ না করেই ভাবনায় পুরোপুরি ডুবতে থাকে রাজীব। বিড়বিড় করে বলে, 'এবারে মেডেলটা বুঝি গেল!'

মেডেলটা হাত-ছাড়া হবার কথায় চমকে ওঠে সবাই। একেবারে চুপসে যায়। মেডেল যে তাদের জিততেই হবে। গেল মরসুমগুলোতে কোলকাতা আর দিল্লীতে এক নাগাড়ে মেডেল জিতে জিতে এখন গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘের দেশজোড়া নাম। খবর কাগজে ছবি, লেখা। চারদিকে থেকে কত সুখ্যাতি, বায়না। আগে আসর পিছু দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা মিলত। গতবছর থেকে সেটা এক লাফে চার হাজারে উঠে গেছে।

কান্তো মল্লিক শুনে বলেছিল, 'বাপরে! অতো টাকা কি কইর্‌বেক্ গজাশিমুলের মানুষ? মাস্টার বল হে!'

'ওসব আমি কিছু জানি নে।' মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল রাজীব, 'তোমাদের টাকা, কিভাবে খরচ হবে, সেটা ঠিক করবে তোমরাই। আমি ওর মধ্যে নেই।'

সেটা ঠিক। টাকা-পয়সা হাতে ছোঁয় না রাজীব। সবই তুলে দেয় সংঘের সম্পাদক সুচাঁদের হাতে। একটা ছোট কমিটি বানিয়ে দিয়েছে। তাতে কান্তো মল্লিক আর দশরথ ভক্তার মতো প্রবীণরাও রয়েছে। আবার কান্‌চা মল্লিক, বদন কোটালের মতো নবীনরাও। ওরা এক আসনে বসে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে। খরচ-খরচার সিদ্ধান্ত নেয়। রাজীব শুধু প্রয়োজনে পরামর্শ দেয়। শিল্পীদের মজুরী দিয়ে থুয়ে যে টাকা বাঁচে তাই দিয়ে একটা ফাণ্ড তৈরী করা হয়েছে। সেই ফাণ্ডের টাকা থেকে যন্ত্রপাতি কেনা কিংবা সারান হয়। বাকি জমা থাকে দুর্দিনের জন্য। বছরের যে সময়টা নিয়মিত গাওনা হয় না, তখন তা থেকে দাদন দেওয়া হয় প্রত্যেককে। কমিটির মিটিং-এ একমত হয়ে সবকিছু করা হয়। সুচাঁদের মত সৎ আর পরিশ্রমী ছেলে এ যুগে পাওয়া যাবে না। এই বয়েসে বড় বিচক্ষণ হয়ে উঠেছে ছেলেটা। ওর ওপর গাঁয়ের মানুষের অসীম আস্থা। দিনরাত ঐ সব নিয়ে হাড়ভাঙা খাটনি খাটে সুচাঁদ। ফলে এই ক'বছরেই ফাণ্ডে জমানো টাকায়, অসময়ে খয়রাতি দিয়ে রঙলালের কাছ থেকে আগাম দাদন নেওয়াটা বন্ধ করা গেছে। গত এক বছরে গজাশিমুলের একটিও নতুন ছেলে কিংবা মেয়ের নাম রঙলাল তুলতে পারেনি তার লাল খাতায়। সে রকম খবর পেলেই তৎক্ষণাৎ ছুটে গেছে সুচাঁদ। ছুটে গেছে রাজীব। ওদের বাপ-মা'কে বুঝিয়েছে।

ফাণ্ড থেকে কর্জ দিয়ে বন্ধ করেছে রঙলালের মানুষের ব্যবসা। আরও এক ফন্দি রয়েছে রাজীব আর সুচাঁদের মাথায়। প্রতি আসর থেকে পাওয়া টাকার একটা অংশ সরিয়ে রাখবে ওরা। তাই দিয়ে আর একটা ফাণ্ড গড়বে। ঐ ফাণ্ড থেকে ধীরে ধীরে মিটিয়ে দেওয়া হবে রঙলালের যাবতীয় বকেয়া দাদন। যারা দাদনের খাতে এখন আসাম যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে, তাদের ঠেকানো হবে আগে। যারা বর্তমানে আসামে রয়েছে তাদের ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু হবে তারপর। অবশেষে একদিন, পাঁচ দশ বছর বাদে, সমস্ত দেনা মিটে যাবে। তখন রঙলালের গাঁয়ে ঢুকবার পথে এক ঝাঁপ শক্তপোক্ত কাঁটা ফেলে দেওয়া হবে চিরদিনের মত। তখন এ গাঁয়ের একটি প্রাণীও যাবে না আসামের জঙ্গলে কিংবা চা-বাগানে। কাঠ-কুলি কিংবা কামিনের কাজ করতে। সে এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, এক গাঢ়তর স্বপ্ন। এগুলোর সবকিছুই নির্ভর করছে দিল্লী এবং কোলকাতায় সোনার মেডেলটি পাওয়ার ওপর। গজাশিমুলের মানুষ জানে, মেডেল না জিতলে পুরো দলটার কদর কমে যাবে রাতারাতি। তখন আসর পিছু চার হাজার তো দূরের কথা, এক হাজারও দিতে চাইবে না কেউ। বায়নাও কমে যাবে অনেক। ফলে শিল্পীদের রোজগারও কমে যাবে। রঙলালতো তক্কে তক্কে আছেই, বেড়ালের মতো ওত পেতে। সুযোগটি বুঝে সে ফের ঢুকবে গজাশিমুল গাঁয়ে। ফের মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসবে মোড়লের উঠোনে। ভাবতে ভাবতে আনচান করতে থাকে গজাশিমূলের মানুষ। লক্ষ্যে পৌঁছুতে এখনো অনেকখানি পথ বাকি যে।

সুচাঁদের বাপ দশরথ ভক্তা সংঘের সভাপতি। সারাজীবন গজাশিমুলের মানুষগুলোর দুর্দশা নিজের চোখে দেখেছে সে। নিজেও কিছু কম দুর্ভোগ পোহায় নি। পালাগানের দলটা নাম করবার পর, এ গাঁয়ের বত্রিশটা পরিবার ধীর লয়ে পালটে যাচ্ছে। সে ছবিটি নিরন্তর আঁকা চলছে তার চক্ষের সুমুখে।

ঘোলাটে চোখে তাকিয়েছিল দশরথ ভক্তা। একসময় খনখনে গলায় বলল, 'ত মেডেল পেইতে হলে, কী করত্যে হবেক্ বলুন আইজ্ঞা।'

প্রশ্নটা অনেকের মনে ঘাই মারছিল তখন থেকে। সবাই বসে রইল উৎকর্ণ হয়ে। রাজীব ভাবছিল কিছু। থমথম করছিল ওর মুখ। বলল, 'নতুন কিছু দিতে হবে। যা এদেশের মানুষ আগে কখনও দেখে নি। একেবারে চমকে দেবার মত কিছু।'

দশরথ ভক্তা কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'ত আইজ্ঞা, নৈতন কিছো করুন তাইলে। আপনি ত' দলের বিধাতা, আপনিই ত' যন্ত্রী। উয়ারা বটে সব যন্ত্র।'

রাজীব গুম মেরে বসে থাকে খানিকক্ষণ। চেয়ারের হাতলে আঁকিবুকি কাটে নিঃশব্দে। খানিকবাদে মৃদু গলায় বলে, 'করা যায় তেমন কিছু। মাথার মধ্যে খেলছে সেটা। কিন্তু কথাটা বলতে সংকোচ বোধ করছি।'

এমন কথায় গজাশিমুলের মানুষের দুর্ভবানা বেড়ে যায়। কী অমন কথা রে বাপ! মাস্টার তো অমন ভণিতা করে কথা কয় না কখনও। এক মুখ উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে থাকে সবাই। রাজীব ধীরে সুস্থে কথাটা পাড়ে।

'কেবল একটা পালাগানই এবারে বাঁচিয়ে দিতে পারে আমাদের।'

'কুন্ পালাগান?' সমস্বরে চেচিয়ে ওঠে সবাই।

'জলকেলি নাচ।'

আচমকা যেন বাজ পড়ে গজাশিমুলের বসু-শবরদের মাথায় । নিমেষে জমে পাথর হয়ে যায় সবাই । চারপাশের ডুংরীগুলো ফাটতে থাকে তুবড়ির মত, ঝরনাটা প্রলয় গতিতে ছোটে, আকাশ জুড়ে গুরু গুরু গর্জন শুরু হয় । আর সেই সব প্রত্যক্ষ করতে করতে যেন কারো কারো দু'চোখ জ্বলতে থাকে হিংস্র শ্বাপদের মত ।

এই মূহুর্তে সারা সভা স্তব্ধ । একটা শুকনো পাতা পড়লেও বুঝি শোনা যায় । শুধু ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ ... । অনেকক্ষণ ধরে জ্বলতে থাকা হ্যাজাক্‌টা দম হারিয়ে ফেলেছে । নিস্তব্ধ জমায়েতের মধ্যে তার সোঁ-সোঁ দম টানার আওয়াজ । আওয়াজটা সবাইয়ের বুকের হাপরে সংক্রামিত হয় ।

দশরথ বুড়ার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর, মেঘের মত ভারি । রাজীবের এক নম্বর শিষ্য, এই সংঘের দ্বিতীয় কর্ণধার সুচাঁদ ভক্তার মুখখানাও থমথম করছে । মনে হয়, এই মাত্র যেন এদের প্রত্যেককে দশ ঘা' করে চাবুক মারা হয়েছে । রাজীবের চোখে-মুখে অস্বস্তি চাপা নেই । ওর একটি মাত্র বাক্য বড়ই দাগা দিয়েছে এদের, একেবারে ধরাশায়ী করে দিয়েছে ।

অনেক্ষণ বাদে নড়েচড়ে বসল দশরথ ভক্তা । তোবড়ানো গালে অকারণে জিভ বোলাল বার কয়েক ।

বলল, 'বড় কঠিন কথা বইল্‌লেন আইজ্ঞা, বড় লিদারুণ কথা ... ! সে যে আমাদ্যার কৌলিক লাচ মশয় । সে যে বড় শুদ্ধ বস্তু । বড় গুহ্য বস্তু ।'

১৩. আগ্নেয়গিরির শিখরে বসে পিকনিক

সম্প্রতি রাঢ় এলাকায় আকাশের বুক একটুখানি ফেটেছে । শ্রাবণে বৃষ্টি হয়েছিল ভালোই । ডুংরী-জঙ্গল আর টাঁড় জমির মাঝে মাঝে ঢেউ খেলানো বাইদ আর শোল জমিন । ঐসব জমিনে জল জমেছে । আমন চাষের কাজবাজ যথা সম্ভব চলছে। ডাঙা জমিনে জৈষ্ঠ্যের বোনা আউশ-কেলাসের মুখে থোড় এসেছে । নুয়ান ধানের গোছগুলিও লোভনীয় হয়ে উঠেছে ।

ক্যাথি বার্ড, জনসন আর রাজীব সেই সকাল থেকে বেরিয়েছে । মেঠো পথ ধরে হাঁটছে, এই গ্রাম, সেই গ্রাম ।

আজ সকাল থেকে মেঘ ধরেছে আকাশে । মাঝে মাঝে সূয্যিদেব উঁকি ঝুঁকি মারেন, মাঝে মাঝেই ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি । এমন দিনে এদের নিয়ে বেরোতে চায়নি রাজীব । কিন্তু ক্যাথি বার্ড নাছোড়বান্দা । গায়ে চাপিয়েছে রেইনকেট, মাথায় টুপি, পায়ে গামবুট ।

চারপাশে ছোট-বড় ডুংরী । নিবিড় শালের জঙ্গল । খাঁজকাটা অজস্র খুলিয়া-খোঁদল এঁকে বেঁকে চলেছে ছোট-খরসতী কিংবা জোড়-আম নদীর দিকে । ডুংরীর ধারে ধারে গাঁ । পুণ্যাপানি, কানাপাথর, আমঝরনা, ঘটিডুবা, কাঁড়াডুবা ... ।

ক্যাথি বার্ড প্রতিটি গাঁয়ে যেতে চায় । প্রতিটি ঘরে ঢুকতে চায় । হাজারো কৌতূহল তার বুকে । লাখো প্রশ্ন । কথায় কথায় টেপ চালায় । জনসনের ক্যামেরার ফ্ল্যাশবাল্ব ঝলসে ওঠে ।

আম-ঝরনা থেকে বেরিয়ে ঘটিডুবার দিকে যাচ্ছিল ওরা। উঁচালী-নীচালী পথ ধরে, ক্ষেতের সংকীর্ণ আল ভেঙে, অতি কষ্টে এগোচ্ছিল। খুব কষ্ট হচ্ছিল রাজীবের। তার মুখ-চোখ ক্রমশ শুকিয়ে আসছিল। কিন্তু ক্যাথি আর জনসনের মুখে সেই ভোরবেলার তাজা হাসি।

ক্যাথি এক নাগাড়ে কলকলিয়ে চলেছে। জনসন কথা বলে খুবই কম। সে শুধু চারপাশটাকে দু'চোখ দিয়ে গিলছে। মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ছে। ক্যামেরার ভিউ-ফাইণ্ডারে চোখ রেখে শাটার টিপছে।

দুপুর নাগাদ পুণ্যাপানির কাছাকাছি একটা ছোট্ট ঝরনা মত দেখে বসে পড়েছিল ওরা। ক্যাথির ব্যাগে ছিল শুকনো খাবার। তিনজনে মহানন্দে মধ্যাহ্ন ভোজ সেরেছিল ঝরনার পাড়ে বসে।

খেতে খেতে বার বার উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছিল ক্যাথি বার্ড। ইস্, তোমরা কি ভাগ্যবান! এমন সুন্দর দেশে জন্মেছ! নেচার কেমন দু'হাত ভরে দিয়েছে তোমাদের! মনে হচ্ছে, সারা দেশটাই বুঝি একটা বিশাল পিকনিক-স্পট!'

জনসনও মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকে চারপাশের অফুরন্ত প্রকৃতির রূপ! যে ঝরনাটার পাড়ে ওরা বসেছে সেটা বাঁদিকের ডুংরীটা থেকে বেরিয়েছে। খান তিনেক বাঁক খেয়েছে। তারপর একচিলতে ডিহি জমিকে অর্ধ-চক্রাকারে পাক খেয়ে চলে গেছে আম-ঝরনা গাঁয়ের দিকে। ঐ ডিহির ওপর খানকতক বিশাল কালো পাথরের চাঙড় মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। ওরা বসেছে ঐ পাথরগুলোর ওপর। পায়ের তলায় ঝরনা। অসংখ্য পাথরের চাঙড়, ছোট-বড়, সাদা-কালো, কে যেন বিছিয়ে দিয়েছে ঝরনার বুকে। ঐ সব পাথরের খাঁজে খাঁজে তিরতিরিয়ে বয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছ কাকচক্ষু জলের ধারা। ঝরনার ওপারের জমি ক্রমশ উঁচু হয়েছে। খানিক দূরে শুরু হয়েছে পলাশ আর বুনো কুলের ঝোড় দিয়ে ঢাকা উঁচু পাথুরে জমিন। ওটা পেরোলেই ঘন জঙ্গল। জঙ্গলও ধাপে ধাপে উঠেছে। এগিয়েছে ডুংরীগুলোর দিকে। ডুংরীগুলো শুরু হয়েছে আরো পরে। কিন্তু মনে হয় যেন জঙ্গলের মধ্যেই সহসা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ওরা। অত দূর থেকে তাদের পাথুরে শরীরগুলোকে বোঝা যাচ্ছে না। জলভরা মেঘের মত কমনীয় রূপ নিয়ে আধা-বাস্তব, আধা-ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা আকাশের গায়ে চুড়ো ঠেকিয়ে। আকাশের গায়ে হাল্কা মেঘের কালচে ওড়না। ঐ ওড়না ফাটিয়ে কোন্ দিক থেকে যেন একফালি রোদ্দুর ছুরির ফলার মত বিঁধেছে ডুংরীগুলোর ডান দিকে। তার ফলে প্রতিটি ডুংরীর ডান দিকখানা সোনালী আলোয় ঝলসে উঠেছে। কিন্তু বাঁ-দিকখানা কালচে মেঘের মত। দূর থেকে সে এক অসামান্য, দৃষ্টিনন্দন ছবি!

দেখতে দেখতে জনসন বলে, 'তুমি ঠিকই বলেছ মিস বার্ড, সারা দেশখানাই এক বিশাল পিকনিক-স্পট। এই অল্পখানি জায়গাতেও, তাকিয়ে দ্যাখো, প্রায় কয়েকশো ছোট্ট ছোট্ট পিকনিক স্পট ছড়িয়ে রয়েছে। আর দ্যাখো, দ্যাখো, ডান দিক থেকে সূর্যের তেরচা আলো পড়ে প্রতিটি ডুংরীর কেমন একদিকে আলো, অন্যদিকে শেড। আর, দিগন্তের গায়ে মেঘগুলো যেন অভ্রের পাহাড়।'

মন দিয়ে খাচ্ছিল রাজীব। বলে 'আলো-ছায়ার ডুংরীগুলোর এই রূপ দেখে এলাকার মানুষেরা ভক্তিতে আপ্লুত হয়।'

'কেন ? ভক্তির কি রয়েছে এখানে ?'

'ওরা মনে করে, সোনালী আলো আর মেঘের মত কালো শেড মিলে মিশে প্রতিটি ডুংরী যেন রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলনের জীবন্ত দৃশ্য এক একটি। এরা বিশ্বাস করে, এই ভাবে মেঘবরণ কৃষ্ণ এবং তপ্ত কাঞ্চন-গৌরাঙ্গী বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা পাপী তাপী মানুষের সামনে যুগলে হাজির হন। ওরা এই নিয়ে গান বেঁধেছে।'

'তাই নাকি!' ক্যাথি খুট্ করে খুলে দেয় টেপ রেকর্ডার, 'বল বল, শুনি।'

দু'কলি গান গেয়ে শোনায় রাজীব। স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে ঘোরা গান। অর্থটাও বুজিয়ে দেয় প্রাঞ্জল করে।

ক্যাথি বার্ড অবাক হয়ে শুনছিল। বলে, 'সত্যি, তোমরা সব কিছুকে কেমন ধর্ম আর দর্শনের সুতোয় বেঁধে দিয়েছ!'

'সেই কারণেই তোমাদের বিশ্বাসগুলো অমন গাঢ়।' জনসন বলে ওঠে পাশ থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথি বার্ড বলে, 'শুধু গাঢ় নয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে অন্ধও।'

'সেটা হয়তো ঠিক।' রাজীব স্বীকার করে, 'তবে বিশ্বাস যত অন্ধ হয় ততই বোধ করি ভালো।' সঙ্গে সঙ্গে সে কথার তারিফ করে ক্যাথি বার্ড এবং জনসন।

ক্যাথি বলে, 'আমি লক্ষ্য করছি, কোন কিছুকে তোমরা শুধু বিশ্বাসই কর না, তার সমর্থনে ভারি সুন্দর সুন্দর কথা বল। খুব তাৎক্ষণিক আর অকাট্য সব উদাহরণ দিয়ে তোমাদের বিশ্বাসের যৌক্তিকতা সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করে ছাড়।'

'ব্যাজস্তুতি, বুঝতে পারছি।' রাজীব মৃদু হেসে বলে, 'কিন্তু তোমার কথাগুলো কি কমপ্লিমেণ্ট না কি আয়রনিক্যাল, বুঝতে পারছি নে।'

'না, সত্যি বলছি।' ক্যাথি বার্ড কপালের রেখা ওপরে তুলে ব্যাখ্যা করে ব্যাপারটা, 'তোমাদের বিশ্বাসগুলো ঠিক কিংবা ভুল তা জানি নে, কিন্তু তার পেছনে যুক্তি আর উদাহরণগুলো মোক্ষম। এই ধর, দিন কতক আগে, সাউথ ইণ্ডিয়ায় এক নিষ্ঠাবান ঈশ্বর-বিশ্বাসী ব্রাহ্মণকে কথা প্রসঙ্গে শুধিয়েছিলাম, তোমরা অত 'ঠাকুর-ঠাকুর' কর, ঠাকুরকে দেখেছ ?'

মাথা নাড়ল ব্রাহ্মণ, 'না দেখিনি!'

'তবে ? যাকে চোখেই দেখনি, তার অস্তিত্ব সম্পর্কে অত নিঃসন্দেহ হও কি করে ?'

শুনে মৃদু হাসল ব্রাহ্মণ। বলল, 'সব কিছুই কি দেখে বিশ্বেস করি আমরা ? দৃষ্টি-অগোচর অথচ বিশ্বাসযোগ্য কত কিছুই যে আছে এ দুনিয়ায়।'

আমি বলি, 'থাকা উচিত নয়।'

'তাই বুঝি ?' রহস্যময় হাসি হাসে ব্রাহ্মণ, 'তা হলে মা, তুমি যাকে বাবা বলে ডাক, তিনিই যে তোমার বাবা তা জানলে কি করে ? তোমাকে সৃষ্টির কাজে তিনি যখন মগ্ন ছিলেন, তখন তুমি তাকে দেখেছিলে নাকি ? এটা একটা ফ্যালাসি। কিন্তু পয়লা চটকায় কেমন হকচকিয়ে দেয়।'

রাজীব চুপচাপ খাচ্ছিল। বলল, 'আসলে সূক্ষ্ম লজিক আর সূক্ষ্ম ফালাসি বড়ই পাশাপাশি হাঁটে।'

সে কথার জবাব দিল না কেউ । বরং জনসন বলল, 'একটু বেশি কথা বলছি নে কি আমরা ? তার চেয়ে এসো, দেখি । চুপ করে শুধু দেখি ।'

চারপাশের জমিতে চাষের কাজ করছে মজুর-কামিনেরা । হাল চষছে । ধান রুইছে । বারো বছরের বাচ্চা থেকে বাষট্টি বছরের বুড়ো-বুড়ি, সবাই রয়েছে ।

আলপথ ধরে যেতে যেতে আজ সারাদিন ওদের দেখেছে ক্যাথি বার্ড । অন্তত শ'দুয়েক মজুর সারা এলাকাটায় ছড়িয়ে কাজ করছে । হাঁটু-প্রমাণ কাদার মধ্যে কোমর ভেঙে নুয়ে রয়েছে সারবন্দী মেয়েরা । যন্ত্রের মত চলছে দু'হাত । ধান রুইছে ওরা । ক্যাথি বার্ড লক্ষ্য করেছে, ওদের হাত নামক যন্ত্রের অবিরাম ওঠা-নামায় অল্পক্ষণেই ধূসর মাঠগুলো ভরে যাচ্ছে কচি-সবুজ রঙে । সেই সকাল থেকে এক নাগাড়ে কাজ করে চলেছে ওরা । বিশ্রাম নেবার কোনও লক্ষণই নেই ।

খেতে খেতে জনসনই তোলে বিষয়টি, 'এরা তো শুধু কাজই করে যাচ্ছে । বাড়ি যাবে কখন ? খাবে-দাবে না ? বিশ্রাম নেবে না ?'

'ওদের বিশ্রাম নেবার উপায় নেই ।' রাজীব ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'আলে-আলে ছাতা মাথায় মালিকের লোক ঘুরছে, দেখছো না ?'

জনসন দেখেছে বটে । সকাল থেকেই মাঠে মাঠে কাজ করছে মজুররা । আর আলের মাথায় ছাতা বাগিয়ে বসে রয়েছে কিছু লোক । কখনো-সখনো তারা এ-আলে ও-আলে ঘুরে বেড়াচ্ছে । এখন, এই দুপুর বেলায়, ঐ লোকগুলোকে আর বড় একটা দেখা যাচ্ছে না । রাজীব জানায়, ওরা সব মধ্যাহ্নভোজ সারতে গেছে ।

'আর এরা' ? মজুরগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে ক্যাথি বার্ড, 'এরা মধ্যাহ্নভোজ সারবে না ?'

রাজীব অল্পক্ষণ চুপ করে থাকে । তারপর বলে, 'একটা ছোট্ট গল্প শুনবে ? এক ঠিকাদার বনের গাছ কাটাচ্ছে মজুর লাগিয়ে । মজুরদের কাজ দেখাশোনা করছে একজন কাজবাবু । হপ্তা শেষে ঠিকাদারের ম্যানেজার এসে মজুরদের মজুরী মিটিয়ে দিয়ে যায় । ঠিকাদার অধিকাংশ সময় কোলকাতায় থাকেন । কালে-ভদ্রে জেলা-সদরে এসে কয়েকদিন থেকে যান । একদিন দুপুরবেলায় কাজ করতে করতে একজন মজুর বলল, 'সকাল থিক্যে বহুত খাটালি হলো । ইবার চলো হে, দুফরের ভোজনটা সেরে লিয়া যাক্ ।'

ওর কথা শুনে কাজবাবু তো হেসেই খুন । বললেন, 'বল্‌ছু কি রে শালা ? ভোজন সারবি ?'

'সারবো নাই ?' মজুরটি আকাশের দিকে মুখ তুলে জবাব দেয়, 'কত বেলা হলো, খিয়াল আছে সিট্যা ?'

'তা হোক ।' কাজবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'তা বলে ভোজন সারতে চাস তুই ?'

মজুরগুলো কাজবাবুর হাঁসির কারণ বুঝতেই পারে না । তারা ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে ।

'শোন' । হাসি থামিয়ে কাজবাবু বললেন, 'ঠিকাদারবাবু করবেক্ ভোজন । ম্যানেজারবাবু করব্যেক আহার । আমি খাবো । তুয়ারা গিলবি । যাহ্, গিলে আয় জলদি ।'

গল্প শুনতে শুনতে জনসন আর ক্যাথি বার্ড প্রায় হেসে গড়িয়ে পড়ে ।

জনসন বলে, 'তা, এরা কি গিলতেও যাবে না ?'

রাজীব বলে, 'গিলবার জন্য এরা বাড়ি যেতে পারে না । ওদের বাড়ি কত কত দূরে । খুইল্যা-ডুংরী-জঙ্গল পেরিয়ে ।'

জনসন অবাক হয়ে শুধোয়, 'তাহলে এরা খাবেই না ?'

'খাবে । ওরা নিজেদের সঙ্গে যৎসামান্য খাবার এনেছে । আমানির জল, কিংবা মুড়ি খানিকটা কিংবা গোটা কয়েক বাসি রুটি । আলের ধারে বসে এক সময় তাই গিলে ফেলবে ওরা ।'

'জল খাবে কোথায় ?'

'ঐ তো । মাঠে মাঠে কতো জল । জল না থাকলে চাষ হচ্ছে কী করে ? ঐ যে বলদটা জল খাচ্ছে কোঁ কোঁ করে, ওরই পাশে দাঁড়িয়ে আঁজলা ভরে চালিয়ে দেবে চোঁ-চোঁ করে ।'

ক্যাথি বার্ড-এর মুখের হাসি থেমে গেছে । একটু যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ওকে । কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য । পর মুহূর্তে চোখে মুখে ঝলসে ওঠে আলো । বলে, 'যা বল, একটা দিক থেকে ওরা কিন্তু লাকী ।'

রাজীব আর জনসন একসঙ্গে তাকায় ক্যাথির দিকে ।

ক্যাথি বলে, 'ওরা কেমন রোজ রোজ এমন ভরভরাট নেচারের মধ্যিখানে বসে বসে খায় ! রোজই যেন পিকনিক করে ওরা !'

রাজীব চুপ করে থাকে । এমন কথার জবাব খুঁজে পায় না । জনসন বলে ওঠে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে । এখন আমাদের পিকনিকটা তো শেষ হোক । অনেকক্ষণ বসে বসে গ্যাঁজাচ্ছি আমরা । এখনও খান দুয়েক গ্রাম ঘুরতে হবে আমাদের ।'

কলার খোসাখানা ঝরনার স্রোতের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্যাথি বার্ড । বলল, 'আমরা এবার থেকে রোজ রোজ এমনি যেখানে সেখানে বসে যাবো খেতে । রোজই চলবে আমাদের মিনি-পিকনিক । বল, রাজি ?' বলেই একটা সুরেলা গান ধরলো মিস বার্ড । গাইতে গাইতে ঝরনাটা পার হয়ে গেল । গানের তালে তালে তালি বাজাতে বাজাতে পিছু পিছু জনসন ।

সব শেষে বোবার মত হাঁটতে লাগল রাজীব । এদের দেখতে দেখতে প্রায়-দিনই মনে পড়ে যায় কলেজের সহকর্মী ঊষাহরণবাবুর কথা । নিজের বাড়িতে যে মানুষটি মিতাহারী, সাবধানী, সেদ্ধ-টেদ্ধ ছাড়া খান না, তিনিই বিয়ে-শাদির ভোজে গেলে কবজি ডুবিয়ে সবকিছু আকণ্ঠ খান । এদের অবস্থাও খানিকটা ঊষাহরণবাবুর মত । নিজের দেশে এরা বেজায় হিসেবী, প্র্যাকটিক্যাল, যান্ত্রিক, সর্বদাই যেন রেসের ঘোড়ার মত দৌড়ুচ্ছে । নেচার দেখা তো দূরের কথা, বাচ্চাদের একটু আদর করবারও সময় হয় না । অথচ এদেশে এসে কেমন নিজেদের এলিয়ে দেয় এরা, ছড়িয়ে দেয়, কেমন সহসা বেশিমাত্রায় রোমান্টিক হয়ে ওঠে। এদের এই হঠাৎ হঠাৎ বদলে যেতে পারাটা ভাল না খারাপ তাই নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে রাজীবের মনে ।

১৪.সংস্কৃতি নিরন্তর চলমান এক শরীরী, কিংবা বহতা এক নদী

ঐ গুহ্য বস্তুটির সন্ধান অনেকদিন অবধি রাজীবকে দেয়নি গজাশিমুলের মানুষ। রাজীব যখন গজাশিমুলের পুরোপুরি আপনার জনটি হয়ে উঠেছে, তখনও নয়। রাজীব এ জিনিসের সন্ধান পেয়েছে আরও অনেক পরে। ওর সঙ্গে আসাম মুলুকে ঘুরতে ঘুরতে সুচাঁদই এক দুর্বল মুহূর্তে বলেছিল 'জলকেলি লাচের' কথা। তারপর বহু সাধ্য-সাধনার পর একদিন বুড়ো কাস্তো মল্লিক সঙ্গোপনে বলেছিল জলকেলি লাচের উৎপত্তির ইতিহাস। বলেছিল, 'সে বড় গুপ্ত চিজ হে মাস্টার। সে চিজ পঞ্চজনার সাইক্ষাতে দেখাবার লয়। সে লাচ কেবল বাবা কানাইশরের সুমুখেই দেখানো চলে।'

কাস্তো মল্লিক এখন আর নেই। খরার মরশুমে মরে গিয়েছে। কিন্তু তার সেদিনের কথাগুলো আজও বাজে রাজীবের কানে।

'বুঝলে হে মাস্টার, ইসব চিজ দেখতে চাওয়াও পাপ। দেখানোও মহাপাপ।' একটুক্ষণ চুপ থেকে কাস্তো মল্লিক বলে, 'তেবে তুমাকে মুখে বলা চলে। তুমি তো মোদ্যার লিজেদ্যার লোক। তাই অতি সঙ্গোপনে বলতিছি তুমাকে। কিন্তু দেখতে চাইবে নাই। খবরদার!'

তারপর ধীরে ধীরে, এক অলৌকিক কাহিনী ভারি আবেগময় গলায় বর্ণনা করেছিল কাস্তো মল্লিক। তৃতীয় প্রাণী ছিল না সেখানে।

জানেন বোধ লেয়, মোদের বসু-শবরজাতের মূল বসতি ছিল তামাজোড় গাঁয়ে। সে গাঁয়ের চারপাশে পাহাড়-ডুংরী, বন। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে সুবর্ণরেখানদী। সেই গাঁয়ে, মোদের বসু-শবর জাতের মধ্যে, একবার জনম্ লিয়েছিলেন স্বয়ং ব্রজরাজ কানাই। সে কু-ন্ যুগের কথা আইজ্ঞা! তো, কি উঁয়ার ভোবন ভুলানো রূপ! কি উঁয়ার জ্যোতি! কি সুমধুর কণ্ঠ! বাঁশিতে কি অমিয়া মাখানো সুর! শবরজাতে অমনটি আর দ্বিতীয়টি দেখে নাই কেউ। তো, উঁয়াকে দেইখে যোবতী মেয়াদের পরান উচাটন। মোহন বাঁশির সুরে হিয়া পাগলপারা। মেয়ারা সব সুবর্ণরেখা লদীতে সিনান করতে যায়। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হইয়্যে যায়। সইন্ঝা হয়। তখন উয়ারা ঘরে ফিরে। কী করে অতোক্ষণ উই নির্জন লদীর ধারে? মুরুব্বিদের মনে ঘাই মারে সন্দেহ। খোঁজ্ খোঁজ। সুলুক সন্ধান লিয়ে দ্যাখ্। হায় বাপ! সুবর্ণরেখা লদীর পাড়ে গিয়ে মুরুব্বিদের চোখের পাত্নি আর পড়ে না। লদীর এক-কোমর জলে উদোম মেয়েরা খাড়া রয়েছে সব। লদীর পাড়ে ঝাঁকড়া মউল গাছ। তার ডালে ডালে মেয়াদের অঙ্গের বসন ঝুলছে। আর উই গাছের মগডালে চড়ে বসে রয়েছে মোদের উই কানাই। বাঁশি বাজাচ্ছে আকুল সুরে। মুরুব্বিরা তো রেগে কাঁই। কলঙ্কিনী মেয়াদের কু-নামে যে ভরে গেল জগৎ সংসার। তো, মুরুব্বিরা করলেক কি, উই কানাইকে গাছ্ থিক্যে নামিয়ে এনে সক্কলে মিলে পিটালেক দম্মে। পিটাঁই পিটাঁই গাঁ ছাড়া করলেক উয়াকে।

হবি তো হ', সেই বচ্ছর থিক্যে তামাজোড়ে হল্যাক লিদারুণ খরা। সুবর্ণরেখা শুকাঁই গেল কাঠের পারা। জোড়ে বিলে শুধ্ বালি। গাছে পাতা নাই, বনে ফল-পাকুড় নাই, ক্ষেতে ঘাস নাই, হা-হা করে মরতে লাগল্যাক তামাজোড়ের মানুষ। হেনকালে মোর ঠাকুদ্দার

ঠাকুদ্দা স্বপন দেখলেক্। ব্রজরাজ কানাই স্বপনে বললেক্, মোকে মেরেছিস তুয়ারা। সেই কারণে এই খরা। তেবে উপায় কি ঠাকুর ? উপায় আছে। আমার পূজা কর তুয়ারা। সুবর্ণরেখা লদীর ধারে মউলগাছের তলায়। যোবতীরা জলকেলি করে আরাধনা করুক ব্রজরাজের। তেবে সব শান্তি হবেক। বরষা হবেক। ফসল ফলবেক। আর উই যোবতীরা জীবন অন্তে স্বর্গে যাবেক।

পূজা হলো খুব আড়ম্বর করে। মউল গাছের তলায় 'জলকেলি' নৃত্য করলেক্ উই কলঙ্কিনীর দল। তিনদিন বাদে সহসা ঈশান কোণে কিট্টো ঠাগ্রের মতোন কালোপানা মেঘ। আগাশ ফাইট্যে বরষা। অমন বরষা বাপের জনমে দেখে নাই তামাজোড়ের মানুষ। সে বচ্ছর জমিনে হল হাতি-ঠেলা ধান। গাছে গাছে অফুরন্ত ফল-পাকুড়। মৌচাকে ভরা মৌ। গাইয়ের ব্যাঁটে অঢেল দুধ।

সাতদিন বাদে ব্রজরাজ কানাই ফের স্বপন দেখালেক। মুই তুয়াদ্যার ঘরে কানাই শবর্ হয়ে জনম লিয়েছিলাম্। এখন মোর বসবাস পাহাড়ে। মোর নৈতন নাম হল, কানাইশর জীউ। যে পাহাড়ে মোর অবস্থান, তার নাম হবেক্ কানাইশর পাহাড়। তুয়ারা লিয়ম করে আষাঢ় মাসের তৃতীয় শনিবারে পূজা দিবি মোকে।

সেই থেকে কানাইশর জীউর পূজা চলছে আষাঢ় মাসের শনিবারে। বিশাল মেলা বসে। আর উই রাতে মেয়্যারা লদীর পাড়ে 'জলকেলি' নৃত্য করে। সেই থেকে আইজ্ঞা উই লাচ মোদের কৌলিক লাচ। সে লাচের অনেক নিয়ম। সে গানের ভাষা দৈবভাষা। সে গানের সুর বেঁধেছিল স্বয়ং ব্রজরাজ। সে লাচগান কি সর্বসমক্ষে দেখানো যায় ?

অবাক হয়ে শুনছিল রাজীব। লোকসংগীত আর লোকনৃত্য বুঝি সর্বত্র এমনি করে মানুষের ধর্ম আর সংস্কারের মোড়কে বাঁধা পড়ে গেছে যুগ যুগ ধরে। সেইজন্যই বুঝি হাজার ঝড় ঝাপটায়ও মানুষ এগুলোকে পরম সঙ্গোপনে রক্ষা করে চলেছে পরম সম্পদের মত। ভারি অবাক লাগে রাজীবের, সুদূর বৃন্দাবনের গোপিনীদের বস্ত্র হরণের কাহিনী কি করে অত দূরে এই এলাকার একটি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির মধ্যে এভাবে ঢুকে পড়েছে। বৃন্দাবনের গোপিনী এখানে কলঙ্গিনী শবরকন্যা। কদম্ব বৃক্ষ এখানে মউল গাছ। কৃষ্ণ এখানে কানাইশবর বা কানাইশর। ভারি অদ্ভুত। সংস্কৃতি কি তাহলে নিরন্তর চলমান এক শরীরী কিংবা বহমান এক নদী !

'আমরা চাষ করি আনন্দে, মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে' — সাবাস কবি !

চারপাশে সারবন্দী নুয়ে থাকা মানুষ। মাঝখান দিয়ে আলপথ ধরে চলেছে ওরা তিনজন। সূর্যদেব পাটে বসেছেন। গুটিয়ে এনেছেন নিজেকে লাল চাকির মধ্যে। দূরে দূরে ডুংরীগুলোকে লাগছে যেন একপাল হাতি। চারপাশে দিগন্তজুড়ে নিবিড় জঙ্গলগুলোকে ভারি রহস্যময় লাগছে। মনে হচ্ছে একপাল ধূসর হাতি যেন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সহসা দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে গিয়েছে।

জঙ্গল আর ডুংরীর ঘেরাটোপের মধ্যে খানিকটে করে চাষের জমিন, উঁচালা-নীচালী, ঢেউ খেলানো।

আজ সারাদিনই প্রায় ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরছে। মুনিষ-কামিনগুলো ভিজতে ভিজতে কাজ করে চলেছে অবিশ্রাম।

হাঁটতে হাঁটতে জনসন বলে, 'এ দেশের মানুষের খাটবার ক্ষমতা খুবই বেশি।'

'কি করে বুঝলে ?' রাজীব শুধোয়।

'আমরা সকাল বেলায় যাবার সময়ে এদের কাজ করতে দেখেছিলাম। এখন ফেরবার পথেও দেখছি, ওরা কাজ করে চলেছে।'

রাজীব জবাব দেয় না।

জনসন তাকায় রাজীবের দিকে। বলে, 'কিছু বললে না যে ?'

'কী বলি বল ?' রাজীব মৃদুগলায় জবাব দেয়, 'আসলে ক্ষমতায় নয়, এ দেশের মানুষ পশুর মত খাটে নেহাতই বাধ্য হয়ে। নইলে, ঠাণ্ডা দেশের চেয়ে গরমের দেশের মানুষের খাটবার ক্ষমতা বেশি হবার কথা নয়।'

'দিনভর খেটে ওরা কতো মজুরী পাবে ?'

'এটা একটা প্রশ্ন বটে।' রাজীব বলে, 'এদের মজুরী পাওয়ার ব্যাপারটা বেশ মজার।'

'কি রকম ?'

'তোমায় আগেই জানিয়ে রাখি, এককালে এ অঞ্চলে মজুরী দেওয়ার একটা সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। মজুর-কামিনরা দিনভর পশুর মত খাটত মালিকের ক্ষেতে-খামারে। মালিকের গরু-বলদ-কাঁড়াগুলোকে খাওয়াত দাওয়াত। বিনিময়ে, সারাদিন ধরে বলদ কাঁড়াগুলো যে মলত্যাগ করতো ঐ গোময়গুলি ছিল মজুরটির খোরাকী।'

'মানে ?' জনসন অবাক বিস্ময়ে তাকায়, 'তুমি বলতে চাও, মানুষ গোময় খেত ?'

ক্যাথি বার্ড খুট করে টিপে দেয় টেপ রেকর্ডারের সুইচ।

রাজীব বলে, 'না। গোময় খাবে কেন ? অমৃতের পুত্ররা কখনও গোময় খায় ? আসলে, ঐ গোময়গুলো ধুলে কিছু অজীর্ণ শস্যদানা মিলত। ওগুলোই ছিল মজুরটির খোরাকী। এখন অবশ্য এ অঞ্চলে সে ব্যবস্থাটা নেই। কিন্তু প্রতিবেশী রাজ্যের কোথাও কোথাও বহাল তবিয়তে এ ব্যবস্থা বেঁচে রয়েছে এখনও।'

হাঁ করে তাকিয়েছিল জনসন। বলে, 'ঐগুলো মানুষ খেত কিংবা খায় ?'

'খায় মানে ? অমৃতজ্ঞানে খায় এবং বিনা মূল্যে নয়, মালিক যথারীতি ঐ অজীর্ণ শস্যের দাম কেটে নেয় মজুরী থেকে।'

'যাহ্। তুমি বাড়িয়ে বলছ। ঐ বস্তু মানুষে খেতে পারে ?'

'পারে না ? বেশ। পরীক্ষা হয়ে যাক্। তোমাকে দিনের পরদিন না খেতে দিয়ে, হাড়ভাঙা খাটনি খাটিয়ে, তারপর সন্ধ্যে নাগাদ ধরে দিই ঐ বস্তু। দেখি, তুমি খাও কি না।'

'যাগ্ গে।' এতক্ষণে মুখ খোলে ক্যাথি বার্ড, 'এ'তো গেল খোরাকী। ওরা মজুরী পেত না ?'

'মজুরী ? সে তো আগাম নিয়ে বসে আছে।'

'কবে ?'

'তার কি কোনও ঠিক আছে ? বিশ দিন আগেও হতে পারে । পঞ্চাশ কিংবা একশো বছর আগে হলেও অবাক হবার কিছু নেই । ও নিজে, কিংবা ওর বাপ অথবা ঠাকুদ্দা, কেউ না কেউ মজুরী বাবদ আগাম দাদন নিয়ে বসে রয়েছে ।'

ব্যাপারগুলো কেমন রূপকথার মত লাগছিল জনসনের কানে । দেখে মিটিমিটি হাসতে থাকে রাজীব । বিতাং করে বোঝাতে থাকে রাঢ় এলাকার দাদন প্রথার কাহিনী ।

গেরস্থ অর্থাৎ মাইন্দারের নিয়োগকর্তাকে বাঁকুড়ায় বলে, 'গলা' । শুধু নিয়োগকর্তা বললে কিঞ্চিত কম বলা হয় । 'গলা'রা পারতপক্ষে মুনিষ-মাইন্দারদের জন্ম-জন্মান্তরের ভাগ্য বিধাতা ।

'গলা'দের কাছে মজুর দু'ধরনের । 'ভাতুয়া মজুর' এবং 'দিনমজুর' । দু'জাতের মজুরের ক্ষেত্রে দাদনের ব্যবস্থাও পৃথক । 'ভাতুয়া মজুর' হল তারাই, যারা 'গলা'র বাড়িতে বারোমাস তিরিশ দিন অষ্টপ্রহর থাকে । শুধু সে-ই নয় । 'গলা'দের ঘরে একে একে তার ছেলে-নাতি-পুতি—প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাঁধা পড়ে যায় । একজন একটিবার দাদন নিয়ে 'ভাতুয়া মজুর' হয়ে ঢুকলে, সে ঋণ তার পরবর্তী দশ প্রজন্মও শোধ দিতে পারে না । এ দেশে এখনো একটি শিশু 'ভাতুয়া মজুরে'র ঘরে জন্ম নিয়েই আবিষ্কার করে, সে তার জন্মের অন্তত পাঁচবছর আগে থেকে 'গলা'র খাতায় বাঁধা পড়ে গেছে । সে এক জটিল অঙ্ক । ছেলেটির যখন আঠারো বছর বয়েস, তখন তার বাপ মারা গেল 'গলা'র দুয়োরে খাটতে খাটতে । তার রেখে যাওয়া ঋণের হিসেব কষতে বসলো মালিক । দেখা গেল, মৃত্যুর পর তার তেইশ বছর খাটনি বাকি রয়ে গেছে । সেটা অনিবার্যভাবেই বর্তাবে তার ছেলের ওপর । ভেবে দ্যাখ, আঠারো বছর বয়েসে একজনের মাথায় তেইশ বছরের খাটনি চাপল । এর ওপর তার নিজের নামে যে দাদন, সেটা তো আছেই । সুদে-মূলে বেড়ে সেটা যে আরও কত বছর হয়েছে, তা একমাত্র 'গলা'ই জানে । আর জানেন ঈশ্বর । ঈশ্বব তো সদাই নীরব । 'গলা'ও তথৈবচ ।

'দিন মজুর'দের দাদনের অঙ্কটি আরো মজার । আশ্বিনে ক্ষেত-মজুরের পেট কাঁদে শকুনের বাচ্চার মত । তখন সে দাদনের জন্য ছোটে 'গলা'র দুয়োরে । তখন ধানের মণ পঞ্চাশ টাকা । সেই দামে একমণ ধান দাদন নিল মজুরটি । অঘ্রাণ-পৌষে সে দাদন শোধ হবে তখনকার ধানের দামের ভিত্তিতে । দৈনিক মজুরী একসের ধান । অঘ্রাণ-পৌষে ধানের দাম পঁচিশের বেশি নয় । এবার বল দেখি, আশ্বিনে এক মণ ধান দাদন দিয়ে ঠিক দেড় থেকে দু'মাস বাদে কতগুলো 'ম্যান্ ডেজ' পাবে ঐ মালিক ?

জনসনের প্রায় ভিরমি খাবার জোগাড় । কিন্তু ক্যাথি বার্ড একবার ধাঁধাটা শুনেছিল রাজীবের কাছে । সে চটপট জবাব দেয়, 'আশি ম্যান্ ডে'জ ।'

'এক মণ ধানের বদলে এইট্টি ম্যান্-ডে'জ !' জনসনের দু'চোখ কপালে উঠে যায় ।

মুচকি হেসে রাজীব বিতাং করে শোনায়, অকালে ধান ধার দেওয়া অর্থাৎ 'বাড়ি' প্রথার অঙ্কটা ।

শুনতে শুনতে দর্শনের ছাত্র জনসন যেন দার্শনিক হয়ে ওঠে । বিড়বিড় করে বলতে থাকে, 'ধন্য, ধন্য তোমাদের দেশ ! ধন্য তোমাদের সিস্টেম !'

'আচ্ছা, এই যে এরা সকাল থেকে কাজ করছে—,' ক্যাথি বার্ড শুধোয়, 'বাড়ি ফিরবে কখন ?'

'ওদের বাড়ি ফেরার সময়টা বোধ করি তুমি জান ।' রাজীব বলে, 'তুমি যখন সন্ধ্যের পর ক্যাম্পের মধ্যে বসে বিয়ার খাও, তখন দূর থেকে কোরাস গান গাইতে গাইতে চলে যায় দলে দলে মানুষ । শুনতে পাও না ?'

'পাই তো !' ঝল্সে ওঠে ক্যাথি বার্ড-এর চোখ মুখ, 'মনে হয় যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে কোনও অলৌকিক সুর ! আমি কতোবার ঐ মিস্টিক্ সুর আমার টেপ-রেকর্ডারে ধরে রাখতে চেয়েছি । ওগুলো তবে এরাই গায় ?'

'ঠিক তাই । সন্ধ্যের আঁধারে কালো কালো শরীর মিশিয়ে এরাই গাইতে গাইতে ঘরে ফেরে রোজ ।'

'হাউ ফ্যান্টাস্টিক ! হাউ মারভেলাস' আলপথে হাঁটতে হাঁটতে উচ্ছ্বসিত ক্যাথি বার্ড আচমকা আঁতকে ওঠে, 'হে যীশু ! আলের ওপর বাচ্চা । দ্যাখো, দ্যাখো, এক্কেবারে কচি জ্যান্ত বাচ্চা !'

রাজীব ছিল খানিকটে পেছনে । আলের ওপর পাতায় ছাওয়া ছাতাখানা দূর থেকেই দেখেছিল সে । আন্দাজ করেছিল তখনই ।

বলে, 'হ্যাঁ । অবাক হবার কিছুই নেই । এ সময়টা আলে অমন অনেক বাচ্চাই দেখতে পাবে তুমি ।'

'কেন ?'

'বা-রে ! কচি বাচ্চা বাড়িতে রেখে মায়েরা খাটতে আসবে কি করে ? সারাদিন ওকে দেখবে কে ? তাছাড়া বাচ্চাকে নিজের স্তন থেকে দুধ খাওয়াতে না পেলে বাঁচবে ঐ শিশু ?'

'লয় অইজ্ঞা । এসব হল এ শালীদ্যার কাজ কামাইয়ের লছনা । উই বাহানায় বারে বারে আইলের ধারে গিয়ে বসা যায় । বাচ্চার ব্যাঁতে (মুখে) মাইখান্ সেঁধ করিয়ে, মালিকের কাজটিতে যতক্ষণ ফাঁকি মারা যায় !'

ক্ষেতের অপর আল থেকে কথা বলছিল লোকটি । রাজীব এতক্ষণে নজর করল ওকে ।

বলল, 'তুমি বাঞ্ছারাম কুচলান্ না ?'

'আইজ্ঞা ।'

'কেমন আছ, বাঞ্ছারাম ?'

'উই একরকম আছি আইজ্ঞা । দিনকাল খোব খ্যারাব ।'

ক্যাথি বার্ড ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে । সামনে সরু আলের ওপর ছেঁড়া চটে ওর পথরোধ করে ঘুমিয়ে রয়েছে মাস কয়েকের বাচ্চাটি । হাত-পা' নেড়ে গায়ের ন্যাক্ড়া ফেলে দিয়েছে মাটিতে । মাথার ওপর পাতায় ছাওয়া ছাতাটি রয়েছে বটে । তাও চারপাশ থেকে বৃষ্টির ছাঁট লেগে বারো আনাই ভিজে গিয়েছে । ক্যাথি বার্ড লক্ষ্য করে, বাচ্চাটি ঘুমন্ত অবস্থায় তিরতির করে কাঁপছে । তার গায়ের কচি রোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে শীতে ।

এতক্ষণে যেন বিষণ্ণ দেখাল ক্যাথি বার্ডকে । বড় অসহায় । বিপন্ন । বাচ্চাটিকে টপকে সে যেতেও পারছে না । আবার অমন দৃশ্যখানি বেশিক্ষণ সইতেও পারছে না স্নায়ু ।

হঠাৎ ব্যাপারটা নজরে পড়ে বাঞ্ছারামের। দু'হাতে ছাতা বাগিয়ে আলপথে ছুটতে ছুটতে ক্যাথি বার্ড-এর পাশটিতে এসে দাঁড়ায়। বাঘের ঝাপট নেয় বাচ্চার মায়ের দিকে তাকিয়ে, 'এই শালী সুঁদরী, বেইছে বেইছে মাইন্ষের চলাফেরা করবার আইলে ছা'কে শুয়াঁইছিস ? সরা'—সরা' জলদি।'

নুয়ে থাকা সুঁদরী প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। টাটিয়ে ওঠা কোমরে সাড় ফেরায়। তারপর হাঁটু-প্রমাণ কাদা চটকাতে চটকাতে আসে আলের পাশটিতে। চট সমেত তুলে নেয় বাচ্চাকে। ক্যাথি বার্ড পা' বাড়ায়।

বাঞ্ছারাম শুধোয়, 'এই বিষ্টি-বাদ্লার দিনে কুথাকে বারাইছেন মাস্টারবাবু ?'

'গেছলাম, এই এঁদের গাঁ' দেখাতে।'

'তাই বলে এই বাদ্লার দিনে ?'

'ওঁরা বাদ্লার দিনেই যেতে চাইলেন যে !'

ওয়াটার-প্রুফ কোটে ওদের সর্বাঙ্গ মোড়া। মাথায়ও ওয়াটার-প্রুফ টুপি। পায়ে গাম বুট। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওদের পোশাক-আশাক দেখছিল বাঞ্ছারাম।

বলল, 'এঁদের একদিন লিয়ে যাবেন বাবুর মহালে। আমি বইলে রাখব বাবুকে।'

'যাব একদিন।' বলেই দ্রুত পায়ে হাঁটা দেয় রাজীব।

দু'পা এগিয়ে ক্যাথি বার্ড বলে, 'এইভাবে ভিজে আলের ওপর শুইয়ে রেখেছে বাচ্চাকে ? সারাদিন ভিজছে। নিউমোনিয়া ধরবে যে !'

'ধরতে পারে।' রাজীব নিস্পৃহ গলায় বলে, 'তার চেয়েও রেডি'লি যারা ধরতে পারে, তারা পাশাপাশি খালে-খোঁদলে লুকিয়ে রয়েছে।'

ক্যাথি বার্ড ও জনসন জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

'আমি সাপের কথাই বলছি।'

'মাই গ—ড় !' দু'কানে হাত চাপা দেয় মিস বার্ড, 'সাপে যদি কামড়ায় ?'

'কামড়াতেই পারে। সাপেরা তো আর মানুষের বাচ্চাদের চুমু খেতে শেখেনি ?'

ক্যাথি বার্ড জবাব দেয় না। হাত দিয়ে ক্রশ আঁকে শুধু।

হাঁটতে হাঁটতে জনসন শুধোয়, 'আচ্ছা, প্রফেসর, এরা যে সারাদিন ধরে না খেয়ে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করে চলে মালিকের ক্ষেতে, এদের রোগ-অসুখ হয় না ?'

'সেটা কী করে বোঝা যাবে, বল ?' তেতো গলায় জবাব দেয় রাজীব, 'রোগ হয়েছে কিনা সেটা বলতে পারে ডাক্তার। ডাক্তার এরা চোখেই দেখে নি।'

'অতো বাঁকা বাঁকা জবাব দিচ্ছ কেন বল তো ?' সহসা ক্ষেপে যায় ক্যাথি বার্ড, 'তোমার কথার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, তোমার আসল রাগটা আমাদেরই ওপর। যেন ওদের এই অবস্থায় জন্য আমি কিংবা জনসনই দায়ী।'

'তা নয়।' বলতে বলতে হেসে ফেলে রাজীব, 'আসলে, এ দেশের এই মানুষগুলোর দুঃখ কষ্টের পরিমাণটা তোমরা আন্দাজও করতে পারবে না। তোমাদের প্রশ্নগুলোর সোজা-সাপটা জবাব দিলে তার কণা মাত্র বোঝানো যাবে না। আসলে, এসব জিনিস বুঝতে হয় বুকের মধ্যে। প্রশ্নোত্তরে বোঝাও যায় না, বোঝানোও যায় না। ভেবে দ্যাখ, ভোরের

আলো না ফুটতেই কিছু অনাহারী-অর্ধাহারী মানুষ ছুটতে ছুটতে এসে কাজ শুরু করল অন্যের ক্ষেতে। সারাদিন প্রায় অভুক্ত থেকে, রোদে-জলে হাড়ভাঙা খাটনি খেটে নামমাত্র খোরাকী নিয়ে ফিরে গেল তাদের ডোরায়। ঐ খোরাকীতে তাদের পেটের এককোণও ভরল না। পরেরদিন ভোরে ফের ছুটল মালিকের ক্ষেতে। এইভাবে সারাদিন। দিনের পর দিন। সারা জীবন। পুরুষানুক্রমে। কল্পনা করতে পার ব্যাপারটা ? মা'তো হওনি। হলে বুঝতে। নিজের দুধের বাচ্চাকে রোদ-বৃষ্টি আর সাপ-খোপের হাতে সঁপে দিয়ে দিনভর একহাঁটু কাদায় কোমর ভেঙে নুয়ে থাকা—ঘণ্টার পর ঘণ্টা যন্ত্রের মত দু'হাত চালিয়ে যাওয়া—কি এক অমানুষিক ব্যাপার !'

রাজীব থামে। উত্তেজনায় বুঝি অল্প হাঁফাতে থাকে।

ক্যাথি বার্ড মুখে কুলুপ এঁটে হেঁটে যায় খানিক। তারপর বলে, 'তুমি যেভাবে বললে, তাতে পাষাণও গলে যাবে। কিন্তু প্রফেসর, সারাদিনের ঐ খাটনির পর খালি পেটে ওরা গান গেয়ে গেয়ে ঘরে ফেরার এনার্জি পায় কোত্থেকে বল তো ? আমার তো ভারি অবাক লাগে।'

'অবাক আমারও লাগে।' রাজীব আত্মস্থ গলায় বলে, 'ঐসব পাষাণ শিলার বুকে কোথায় যে লুকিয়ে থাকে অন্তহীন চঞ্চলা ঝরনার উৎস, কে জানে ? এই জন্যেই বুঝি মানুষ জাতটাকে 'অমৃতের পুত্র' বলা হয়েছে আমাদের শাস্ত্রে। এই জন্যেই বুঝি সব প্রাণীকে পেছনে ফেলে আসতে পেরেছি আমরা।'

রাজীবের শেষের কথাগুলো বুঝি কানে গেল না ক্যাথি বার্ড-এর। সে বিড় বিড় করে বলল, 'যাই বল, আমার মনে হয় ওদের শারীরিক কষ্টটাই সব নয়। আমার তো এমন জীবনের প্রতি অপরিসীম লোভ হয় মাঝে মাঝে। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি এমন নেচারের সঙ্গে মিশে থাকা। সন্ধ্যের আঁধারে মিস্টিক সুর তুলে ঘরে ফেরা—! ওহ্, তার একটা আলাদা চার্ম আছে !'

ক্যাথি বার্ড-এর কথায় সহসা ভীষণ রাগ হয়ে যায় রাজীবের। বহুকষ্টে রাগটাকে গিলে ফেলে সে।

পরিহাসের ভঙ্গিতে বলে, 'হ্যাঁ, শুধু তুমি কেন, তোমার অনেক আগেই আমাদের দেশের একজন সেরা কবি গান বেঁধে গিয়েছেন ওদের নিয়ে। সে গান শুনলে আমারও মনে হয়, কলেজের চাকরি ছেড়ে, সিংহবাবুদের ক্ষেতে নেবে পড়ি খাটতে। ক্ষেতের মধ্যে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি রোদে-জলে খাটবার মধ্যে না জানি কত আরাম !'

নৈশ বাতাসে বুনো ফুলের গন্ধ

কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর রাত।

হাতিলাদা ডুংরীর মাথায় মায়াময়ী গোল চাঁদ। ছড়িয়ে দিয়েছে নরম জ্যোৎস্না চারপাশের ডুংরী জঙ্গলে। দূর থেকে ভেসে আসে ঝরনার অবিরাম কুলুকুলু আওয়াজ ...। আর দূরে, আদিবাসী গ্রাম থেকে ভেসে আসে দ্রিমি ... দ্রিমি মাদলের বোল, মেয়েলি কণ্ঠে টানা টানা আদিম সুর ...।

ওরা বসেছে ভালুকমুড়া ডুংরীর চুড়োয়, ফিতের চেয়ারে। বসে বসে বিয়ারের গ্লাসে

চুমুক দিচ্ছে নিঃশব্দে ।

ডুংরীর মাথা থেকে ছোট-খরসতিয়ার খাতটুকু দেখা যায় । ডুংরীর ধারে ধারে, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে । এখন, এই জ্যোৎস্না-ধোওয়া রাতে অতখানি উঁচু থেকে ছোট-খরসতিয়া যেন একটি বিশাল আঁকাবাঁকা কালো সর্পিনী, জ্যোৎস্না তার শরীরে পড়েছে, চকচক করছে শরীর ।

ক্যাথি বার্ডরা ফিরে যাবে আগামীকাল । সেই উপলক্ষে আজ সন্ধ্যেয় 'ক্যাম্প-ফায়ার' । সকালে জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটা তিতির মেরেছিল জনসন । রোস্ট বানিয়ে নিয়েছে । ঐ দিয়ে আজ তিনজনের নৈশভোজ ।

কেমন উন্মনা লাগছিল ক্যাথিকে । মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে, নিষ্পলক তাকিয়ে থাকছে হাতিলাদা ডুংরীর মাথায় গোল চাঁদখানার দিকে । আজ কথা বলছে কম ।

একসময় মুখ খোলে ক্যাথি বার্ড, 'আজ পূর্ণিমা, না ?'

মাথা দুলিয়ে সায় দেয় রাজীব, 'আজকের সন্ধ্যেয় সারা এলাকা জুড়ে লক্ষ্মীপুজো হচ্ছে ঘরে ঘরে ।'

'লক্ষ্মী কে আছেন ?' পাশ থেকে বলে ওঠে জনসন ।

'গডেস অব ফরচুন । সম্পদের দেবী । আজ রাত্তিরে লক্ষ্মীর পুজো করলে, গেরস্থের ঘর ধন-সম্পদে ভরে যাবে ।'

'এমনি এমনি ভরে যাবে ? অটোমেটিক্যালী ?' ঢুলুঢুলু চোখে শুধোয় জনসন । কাল সকালে এই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে, সেই আনন্দে কিংবা দুঃখে সে আজ বিকেল থেকে পান করতে শুরু করেছে । এখন কিঞ্চিৎ বেসামাল অবস্থা তার ।

'সেই রকমই তো বিশ্বাস ।' রাজীব মৃদু হেসে বলে, 'আজ ঘরে ঘরে জেগে থাকবে সম্পদকামী মানুষের দল । গভীর রাতে স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁর ধনের পশরা নিয়ে ঘুরবেন গেরস্থের দোরে দোরে । ডাক দেবেন গেরস্থকে, 'কো-জাগো-রে ?' জেগে থাকা গেরস্থরা জবাব দেবে 'হাম্ জাগে রে ।' অমনি তার দুয়োরে নামিয়ে দেবেন ধন সম্পদের পসরা । যারা ঘুমোবে, তারা পস্তাবে ।'

'ঘুমোবে কেন ? সবাই জেগে থাকলেই তো পারে । তাহলে আর একজনও গরীব থাকে না তোমাদের দেশে ।' বলতে বলতে হেসে ওঠে জনসন, 'সত্যি, কত বিচিত্র ধরনের বিশ্বাস বুকে নিয়ে বেঁচে রয়েছ তোমরা !'

ক্যাথি চোখের ভাষায় নিরস্ত করে জনসনকে । ভাবটা যেন, ধর্ম নিয়ে কোনও চটুল মন্তব্য করো না । ইণ্ডিয়ানরা ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা-তামাশায় খুব আহত হয় ।

কথার মোড় সম্পূর্ণ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয় ক্যাথি বার্ড । বলে, 'প্রফেসর, তুমি কখনও প্রেমে পড়েছ ?'

হঠাৎ এমন প্রসঙ্গহীন কথায় রাজীব বিস্মিত হয় । সেটা বুঝতে পেরে ক্যাথি বলে, 'এমন উছলে পড়া জ্যোৎস্নার মধ্যে জঙ্গলবেষ্টিত ডুংরীর চুড়োয় বসে, কথাটা হঠাৎই মনে হল আমার । আশা করি তুমি এটাকে অনধিকার চর্চা বলে ভাববে না ।'

'আরে না, না, অত সঙ্কোচ করছ কেন ?' বলেই সহসা চুপ করে যায় রাজীব । সুতপার মুখখানি বহুদিন বাদে বুকের মধ্যে ভেসে ওঠে । একটা অপরাধবোধে পুড়ে যেতে থাকে

বুক। অনেকদিন চিঠি লেখা হয়নি সুতপাকে । বাইরের জগৎ থেকে নিজের মধ্যে ডুব মারে রাজীব । সুতপার সঙ্গে একান্তে কিছু অসংলগ্ন কথা চলে তার ।

ক্যাথি বোধ করি লক্ষ্য করে রাজীবের এই ভাবান্তর । বলে, 'প্রফেসর, কি হল ? শরীর-টরীর খারাপ নয়তো ?'

'শরীর ঠিকই আছে ।' ধীর গলায় জবাব দেয় রাজীব, 'আসলে খুব ক্লান্ত বোধ করছি । একটু বিশ্রাম পেলে ভালো হত । ভাবছি, কিছুদিন এসব ছেড়ে-ছুড়ে নির্ভেজাল বিশ্রাম নেব ।'

'কি বলছ, প্রফেসর !' ক্যাথি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে, 'এখন বিশ্রাম নেবে কেমন করে ? সামনেই তোমার রাজ্যমেলা, তাছাড়া 'মল্লভূম ফোক রিসার্চ সেণ্টার'-এর বার্ষিক সম্মেলন রয়েছে । খুব জমজমাট করে করতে হবে সেটা । একটা ফোক-ফেয়ার করবার ইচ্ছে রয়েছে । তোমাকেই তো সব দায়িত্ব নিতে হবে ।'

'কিন্তু আমি যে আর এক নাগাড়ে এমন দৌড়তে পারছি নে মিস বার্ড । একটু রেস্ট না নিলে— ।'

'কাম অন, প্রফেসর —।' মুখের কথা কেড়ে নেয় ক্যাথি বার্ড, 'তুমিই তো বলেছিলে, তোমাদের শাস্ত্রে বলেছে চরৈবেতি, চল—চল— । কেবল ইন্‌সেসেণ্ট, নন-এণ্ডিং অ্যাডভ্যান্সমেণ্ট ! বল নি ? রেস্ট নেবার জন্য একটুখানি থামলেই, তোমার আগে সময় যাবে এগিয়ে । তুমি পড়ে যাবে সময়ের পেছনে ।'

এমন গম্ভীর মুখে কথাগুলো বলছিল ক্যাথি, রাজীব না হেসে পারে না । বলে, 'এ হল, আমার অস্ত্রেই আমাকে বধ করা । গুরু-মারা-বিদ্যেটি রপ্ত করেছ ভালো ।'

'গুরু-মারা-বিদ্যে ?' ক্যাথি বার্ড গলা চড়িয়ে বলে, 'আচ্ছা, একটা বছর তুমি রাজ্য কিংবা জাতীয় মেলা থেকে অফ্ হয়ে যাও, দ্যাখ, পরের বছর নিজের জায়গাটি ঠিক ঠিক খুঁজে পাও কিনা ।'

চুপ করে শুনতে থাকে রাজীব । ভাবতে থাকে ।

'সবাই প্রাণপণে দৌড়ুচ্ছে, প্রফেসর । তোমার ক্লান্তির জন্য কেউ তার চলার গতি কমাবে না ।'

'কিন্তু আমি তো এই ইঁদুর-দৌড়ে সামিল হতে চাই নি ।' রাজীবের গলা থেকে ঝরে পড়ে তীব্র আক্ষেপ, 'আমি তো একটা বুনো ফুলকে হাজির করতে চেয়েছিলাম সভ্য-সমাজে । একটা অসহায় সম্প্রদায়ের হাতে-পায়ের শেকল একটুখানি ঢিলে করে দিতে চেয়েছিলাম । তার বেশি কিছু নয় ।'

'ঠিকই । কিন্তু ভেবে দ্যাখ, গুটিপোকা কেবলমাত্র মনের পুলকে একটুখানি তন্তু বয়নের খেলায় নামে । কিন্তু এক সময় সে-ও বন্দী হয়ে যায় স্বরচিত স্বর্ণ-তন্তুর ঘেরাটোপে । দম আটকে মরে ।'

অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসেছিল জনসন । এমন গুরু-গম্ভীর আলোচনায় সচরাচর সে রা' কাড়ে না । তার ওপর আজ সে সামান্য বেসামাল ।

সহসা বলে ওঠে 'গুটিপোকা কি আছে ?'

'সিল্ক-ওয়ার্ম ।' সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয় ক্যাথি বার্ড ।

'আই নো' । বেশ মাতব্বরী গলায় বলে জনসন, 'ওরা যে সুতো বোনে তা দিয়ে সিল্ক শাড়ি তৈরি হয় । সিল্কশারি'জ আর ওয়াণ্ডারফুল থিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড । আই হ্যাভ্ পারচেজড্ টু পিসেস অব সিল্ক-শারি'জ ফ্রম ভিষ্ণুপুর । হোয়াট দে কল ইট ? বালুচারী ।'

'তুমি সিল্ক-শাড়ি নিয়ে কি করবে ?' ক্যাথির চোখে বিস্ময় ।

'ফর মাই ডার্লিং ।' বোকা বোকা হাসে জনসন, 'শী ইজ ভেরি ফণ্ড অব ইণ্ডিয়ান শারি'জ ।'

রাত গাঢ় হয়ে আসে । শন শন হাওয়া বয় । হাতিলাদা ডুংরীর মাথায় চাঁদটা অনেকখানি উঠে যায় । চারপাশের জঙ্গল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে দুধেল জ্যোৎস্না । বাতাসে ভেসে আসে বুনো ফুলের গন্ধ ।

রাজীব উঠে দাঁড়ায়, 'চলি । রাত হল । তোমাদেরও কাল সকালে রওনা হতে হবে ।'

ক্যাথি এবং জনসনও উঠে দাঁড়ায় ।

ক্যাথি বলে, 'তাহলে ঐ কথাই রইল । ফোক-সার্ভের কাজটা যাতে পুরোদমে শুরু করা যায়, সেটা দেখো । অন্য ব্যাপারগুলোও মাথায় রেখো । আর, 'জলকেলি নাচ'-এর ব্যাপারটা ফাইন্যাল হলে, আমিই যেন সে খবরটা সবার আগে পাই ।' শাঁখের মত হাতখানি রাজীবের দিকে এগিয়ে দেয় ক্যাথি বার্ড, 'বেস্ট অব্ লাক ।'

'থ্যাঙ্ক য়্যু ।' রাজীব দুধ-সাদা জ্যোৎস্নার মধ্যে ক্যাথির হাতখানা আলতো ছোঁয় । তারপর ডুংরীর চূড়ো থেকে ধাপে ধাপে নেমে আসে সমতলে ।

কোত্থেকে যেন ফুলের গন্ধ তীব্র হয়ে ধেয়ে আসে । বুনো ফুলের গন্ধ । উগ্র মিষ্টি সুবাসে ভরে গেছে বাতাস । জ্যোৎস্না কেটে কেটে এগিয়ে চলে রাজীব গেস্ট-হাউসের দিকে । হিম পড়ছে, ভিজে গেছে পায়ের তলার ঘাস । বাতাসেও ভেজা ভেজা ঠাণ্ডা আমেজ ।

অফিস-ঘর থেকে সামান্য তফাতে যে ছোট্ট টিলাখানি, তার ওপর বসে রয়েছে একজোড়া ছায়ামূর্তি । টিলার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায় রাজীব । কারা বসে রয়েছে ওখানে, অত রাতে, এমন মায়াবী চাঁদের আলোয় ! মূর্তি দুটি পাথরের মত স্থির । রাজীবের দিকে পেছন ফিরে নিস্পন্দ ।

ধীরে ধীরে ছায়া মূর্তি দুটি অস্পষ্ট অবয়ব পায় রাজীবের চোখে । ওদের চিনতে পারে রাজীব । সুচাঁদ আর রঙী ।

মৃদু হাসি খেলে যায় রাজীবের ঠোঁটের কোণে । নিঃশব্দে রাস্তাটুকু পার হয়ে যায় । সুচাঁদ আর রঙী জানতেও পারে না ।

রঙীর কূটনৈতিক অসুখ ও রাজীবের আসল অসুখ

এর অগেও রাজীব 'জলকেলি' নাচের প্রসঙ্গ তুলেছে দশরথ ভক্তার কাছে । কাস্তো মল্লিক তখন বেঁচে । কাস্তো মল্লিক যে ওকে এ ব্যাপারে কিছু বলেছে, সেটা ঘুণাক্ষরেও ভাঙেনি দশরথ ভক্তার কাছে । শুধু বলেছে, 'বড় দেখতে সাধ হয় । একটিবার শুধু দেখাও না নাচটা । কাকপক্ষীতেও টের পাবে না, কথা দিচ্ছি ।'

দিনের পর দিন সেধেও দশরথ ভক্তাকে একচুল নড়াতে পারেনি রাজীব । শেষে হতাশ

হয়ে বলেছে, 'আচ্ছা, নেচে-গেয়ে না দেখাও, অন্তত মুখে একটু ব্যাখ্যা কর না নাচের ধরনটা। মুখে বলতেও কি দোষ আছে ?'

'আছে আইজ্ঞা ।' দশরথ ভক্তার কপালের বলিরেখায় গভীর ভাঁজ পড়ে, 'তবে আপনি লেহ্যৎ মোদ্যার আপনার জন । বারবার জাপটাঁই ধরছেন । না বলে পারল্যম্ নাই । শুনুন তেবে—।'

দশরথ ভক্তা আবেগ মথিত গলায় ব্যখ্যা করতে থাকে 'জলকেলি' নাচের স্বরূপ ।

আষাঢ় মাসের তৃতীয় শনিবারে গহীনরাতে খরসতিয়া লদীর পাড়ে হরেক উপচারে ব্রজরাজের পূজা হয় । পূজান্তে সব পুরুষ চলে আসে ওখান থেকে । লদীর পাড়ে থাকে শুধু যুবতী মেয়েরা । উয়ারা তখন লাচতে শুরু করে ব্রজরাজের সুমুখে । লাচতে লাচতে শরীরের এক একটি বস্ত্র তিয়াগ করতে থাকে । এক সময় পুরোপুরি উদোম হয়ে যায় । ঐ অবস্থায় উয়ারা হরেক মুদ্রায় লাচে এবং গান গায় । রাতভর চলে সে লাচ-গান । কেবল মেয়েরা ছাড়া আর কাকপক্ষীতেও দেখতে পায় না সে লাচ । শুনতে পায় না সে গান । আর শুধু দেখেন, শোনেন ব্রজরাজ কানাইশর । শবর-কন্যার লাচে তুষ্ট হন তিনি । আকাশে মেঘ জমে, সুশীতল হাওয়া বয়, সুবৃষ্টি ঝরেপড়ে বসমন্তার বুকে ।

শুনতে শুনতে রাজীবের সারা শরীর এক অচেনা উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে থর থর করে । অহো ! নিজের হাতে অক্লান্ত মেহনত করে দিনের পর দিন সে খুঁড়ে চলেছে কালো মানিকের খনিটি । স্তরের পর স্তর । দিনের পর দিন । ঐ তো দেখা যায় রাজা-মহারাজার স্বপ্নের হীরেটি ! ঐ তো জমাট অন্ধকারের বুকে শতচক্ষু জ্বেলে তাকিয়ে রয়েছে রাজীবের দিকে ! ঐ তো !

রাজীব ভেবে পায় না । অর্ধ-উলঙ্গ এই উপজাতির মধ্যে কেমন করে লুকিয়ে রয়েছে এক অচেনা সংস্কৃতির ধারা ! কেউ কোনদিন যার সামান্যতম হদিশ পায়নি ! রাজীব মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, এ জিনিস লোকচক্ষুর সামনে তুলে আনতেই হবে । জগতের সামনে ঘটাতে হবে এর প্রোজ্জ্বল প্রকাশ । নইলে, রাজীবের জীবনটাই বৃথা । বৃথাই লোক-সংস্কৃতির জন্য তার শর্তহীন প্রাণ নিবেদন ।

সেদিন প্রায় মাঝরাত অবধি বসে বসে দশরথ ভক্তাকে বোঝাতে লাগল রাজীব । অনেক উদাহরণ দিল । পুরস্কার বিহনে গজাশিমুলের মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের নিখুঁত ছবি আঁকল । কিন্তু গজাশিমুলেব মানুষ তাদের সিদ্ধান্তে অটল । বিশেষ করে প্রবীণরা একচুল নড়তে চায় না ।

অবশেষে, মধ্যরাতে ক্লান্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় রাজীব । বিধ্বস্ত গলায় বলে, 'তোমাদের ভালোর জন্যই এতসব বলা । তোমাদের কল্যাণের জন্যই । রঙলালের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে হলে সর্বস্বপণ করতে হবে । তোমরা রাজিও ছিলে একদিন । কিন্তু আজ, যখন গজাশিমুলের নাম ছড়িয়ে পড়েছে সারা দুনিয়ায়, যখন গজাশিমূল সংস্কৃতি সংঘের পালাগান বুক্ করতে লাইন পড়ে যায়, যখন আর্থিক স্বচ্ছলতার মুখ সবে মাত্তর দেখতে শুরু করেছে গজাশিমুলের মানুষ, যখন রঙলালের খাতায় এক একটি করে পাতা খসতে শুরু করেছে, তখনই সব পণ্ড করে দিতে চাও । ফিরে যেতে চাও পুরোপুরি আগের অবস্থানে । আমার আক্ষেপটা এখানেই ।' অল্প হাঁফাতে থাকে রাজীব । ধীরে ধীরে দম নিতে থাকে । তারপর

মৃদুগলায় বলে, 'এরপর সংঘের পালা-গানের জন্য বায়না কম হবে, আয়-উপায় কমে যাবে। সুযোগ বুঝে ফের খাতাটি নিয়ে গাঁয়ে ঢুকবে রঙলাল। খাতার সঙ্গে একে একে বেঁধে ফেলবে সবাইকে। হাতে বাঁধবে, পায়ে বাঁধবে, সর্বাঙ্গে দেবে শেকল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেডেল না পেলে ধীরে ধীরে এ সমস্তই ঘটবে।' প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে রাজীব। কথা বলতে পারে না সে।

'কিন্তু উইটা যে মোদ্যার শেষ সম্পদ আইজ্ঞা।' দশরথ ভক্তার গলা শান্ত অথচ সুদৃঢ়।

'সেটা আমি জানি।' মুখের কথা কেড়ে নেয় রাজীব, 'কিন্তু জান না ? সংসারের চরম বিপদে এয়োস্ত্রী রমণীরা তাদের হাতের নোয়া বিক্রি করেও সংকট-নদী পার হয়। জান না সে কথা ? আচ্ছা চলি।' রাজীব উঠে দাঁড়ায়। পায়ে পায়ে হাঁটাতে থাকে গেস্ট হাউসের দিকে। বিড় বিড় করে বলতে থাকে, 'তোমাদের ভাগ্য, তোমাদেরই গড়বার কথা। যদি গড়ে নিতে না পার, ভবিষ্যতে পস্তাবে তোমরাই। আমার কি ?'

পেছনে পেছনে সুচাঁদ এল অনেকখানি। দাওয়া থেকে মাঠে নাবল দু'জনে।

নবমীর চাঁদ উঠেছে হাতিলাদি ডুংরীর ওপরে। একটু যেন ম্লান। চারপাশের পিয়াশাল আর কুসুমগাছের পাতা দুলছে। কেমন ছবির মত লাগে সব। কেমন অপার্থিব।

সুচাঁদ বিড়বিড় করে বলে, 'মন খারাব করো না মাস্টারদা, ধৈর্য ধর। আমি ফের বোঝাব বুড়াদ্যার।'

রাজীবের খুব তেতো লাগছে এখন। মাথার মধ্যে কোথায় যেন প্রবল যন্ত্রণা। এক ধরনের পরাজয়বোধ যেন তিল তিল গ্রাস করছে তাকে। সুচাঁদ চুপটি করে হাঁটছে পাশে। পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল না রাজীবের। শুধোয়, 'রত্তীর খবর কিছু জানিস রে, সুচাঁদ ? কেমন আছে সে ?'

সে কথায় খানিকক্ষণ গুম মেরে থাকে সুচাঁদ। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে। বলে, 'ঘরেই আছে।'

রাজীব দু'চার পা নিঃশব্দে হাঁটে। তারপর যেন নিজেকেই শোনায়, 'বড় ভাল ছিলো মেয়েটা। অমন রূপসী মেয়ে, অমন গুণী, আর মিলবে না।' আক্ষেপ আর হতাশা যেন গলা থেকে ঝরে ঝরে পড়তে থাকে রাজীবের। বলে, 'কী রোগে যে ধরল মেয়েটাকে।' বলতে বলতে উষ্মা জমতে থাকে। বলে, 'আর ঝাড়েশ্বরটাকেও বলিহারি। কতো সাধ্যি-সাধনা করলাম। কিন্তু কিছুতেই মেয়েটাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে দিল না। হাসপাতালেও ভর্তি করতে দিলে না। কু-সংস্কার মানুষকে কেমন নিঃশেষে মারে, দ্যাখ।'

সুচাঁদ জবাব দেয় না। নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে রাজীবের পাশে পাশে। হাঁটতে হাঁটতে গেস্ট হাউসের সামনেটিতে এসে দাঁড়াল দু'জনে। হঠাৎ রাজীব ঘুরে দাঁড়াল সুচাঁদের দিকে। বলল, 'বাঁকুড়ার হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয়তো এখনো ভাল হয়ে যায় মেয়েটা। তুই ওর বাপকে রাজি করাতে পারিস নে ? টাকার তো কোনও অভাব নেই। সংঘের ফাণ্ড থেকে ওর চিকিৎসার যাবতীয় খরচ মেটানো হবে। তুই দেখবি একটি বার ?'

চাঁদের ঘসা আলোয় মুখ তুলে তাকায় সুচাঁদ। মৃদু গলায় বলে, 'সেটা বোধ করি সম্ভব নয়।'

'কেন ? কেন বল্ ? তুই তো ওকে ভালবাসিস । আমি জানি । আমি দেখেছি । বহুবার । অমন ভালো খুব অল্প পুরুষই বাসতে পারে । তবে বল্, কেন সম্ভব নয় ? বল্ ?'

'উয়ার বাপ রাজি হলেও, রঙলাল রাজি হবেক নাই ।'

সরাসরি ঘুরে দাঁড়ায় রাজীব । সুচাঁদের চোখে সোজাসুজি চোখ রাখে, 'মানে ?' সুচাঁদের দু'চোখ ভারি করুণ হয়ে ওঠে ।

ভারি গলায় বলে, 'উয়ার কুনো রোগ-ব্যধি হয় নাই আইজ্ঞা

ভীষণ চমকে ওঠে রাজীব । চোখের চশমাখানা ধাঁ করে খুলে ফেলে চোখ থেকে । আবছা আলোয় সুচাঁদ ভক্তাকে যেন মূর্তিমান রহস্য বলে মনে হয় ।

'রঙীর কোনও রোগ-ব্যাধি নেই ?'

'লয় আইজ্ঞা । রঙলাল উয়াকে আসাম লিয়ে যাবেক । সেই সুবাদে কত টাকা যেন আগাম দিয়েছে ঝাড়েশ্বর মামুকে । আরো দিবেক লিয়ে যাবার টাইমে । রঙলালের কড়া হুকুম, যদ্দিন না রঙী আসাম যাচ্ছে, তদ্দিন উয়ার ঘরের বাহার হওয়া বন্ধ । আর এসব কথা যেন কাকে-পক্ষীকে না টের পায় ।'

'তুই জানলি কি করে ?'

'কোজাগরী পূর্ণিমার রাইতে সক্কলের লজর এড়াই, উ আইছিল আমার পাশ । খুলে বল্যেছে সব ।'

কথাগুলো যেন হেঁয়ালী ঠেকে রাজীবের কানে । এও কি সম্ভব ? এক-গ্রাম মানুষের সামনে একটা মেয়েকে কিনে বন্দী করে রেখেছে এক আড়কাঠি ! এই জন্যেই বুঝি ঝাড়েশ্বর কোটাল সেদিন রোগের অছিলায় কিছুতেই রঙীর সাথে দেখা করতে দিল না । কী করেই বা দেবে, রাজীবের এতক্ষণে বোধগম্য হয়, রঙী তো রঙলালের হাতে ঝাড়েশ্বর কোটালের ঘরে বন্দী ।

আবছা আলোয় সুচাঁদের দিকে তাকায় রাজীব । অপরিসীম ব্যথায় টলোমলো একখানি মুখ । নিষ্ফল আক্রোশে যেন নিরন্তর এক দহন চলছে অন্তর্লোকে । রাজীব এই মুহূর্তে কোন সান্ত্বনা দিতে পারে না সুচাঁদকে । পরম মমতায় ওর কাঁধে হাত রাখে । মৃদু গলায় বলে, 'তুই ভাবিস্ নে সুচাঁদ । আমি ব্যাপারটা দেখছি । একটা কোনও উপায় হবেই ।'

হিম ঝরছে আকাশ থেকে । কুয়াশায় ভরে যাচ্ছে চারপাশ । ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে ডুংরীগুলোর শরীর ।

সুচাঁদকে বিদায় দিয়ে এক সময় গেস্ট হাউসের পথ ধরে রাজীব । তখন তার বুকের মধ্যে এক অস্থির বাজনা বেজে চলেছে ।

১৫. এক বিপন্ন নাবিক ও তার বৈঠা

দুপুর নাগাদ রাজীব পৌঁছুল গজাশিমুল গাঁয়ে । মোটর সাইকেলখানা অফিস ঘরে রেখেই সে চলল দশরথ ভক্তার বাড়িতে ।

দশরথ একগাল হেসে বলে, 'সুচাঁদ ত ঘরে নাই আইজ্ঞা । সব দল বেঁধে গেইছে ভালুকমুড়ার জঙ্গলে ।'

রাজীবের আর তর সইছিল না । 'জলকেলি' নাচ নিয়ে ক'দিন ধরে মনটা বেজায় আনচান । সুচাঁদ কথা দিয়েছে, সে মুরুব্বিদের অনুমতি আদায় করবার আপ্রাণ চেষ্টা করবে । কদ্দুর কী করতে পারল, কে জানে ! এদিকে রাজ্যমেলার দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে । রাজধানীর লোক-সংস্কৃতি মহল উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে, এ মরসুমে রাজীব নতুন কিছু উপহার দেবে কিনা । কোলকাতায় গেলেই সবাই ঘিরে ধরছে ওকে । গেল হপ্তায় কোলকাতা গিয়েছিল রাজীব । ক্যাথি বার্ডের সঙ্গে দেখা হল না । 'দ্য ফোক' পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যাটি বেরিয়েছে । জনসন কপিখানা রাজীবের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'তুমি আমার মনে ক্রমশ ঈর্ষার উদ্রেক করে চলেছ ।' কপিখানা উল্টে পাল্টে দেখেই জনসনের এ হেন মন্তব্যের কারণটা বোধগম্য হয় রাজীবের । এবারের সংখ্যাটি বিশেষ 'বসু-শবর সংখ্যা' হিসাবে বেরিয়েছে । সারা পত্রিকা জুড়ে শুধু রাজীব আর তার দলটিকে নিয়ে হবেক আলোচনা, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় শুধু ওদেরই ছবি । জনসন রাজীবের যে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিল, সেটাও ছাপা হয়েছে হাফডজন ছবি সহকারে । এ সবকিছুই রাজীবের মানসিক চাপটা বাড়িয়ে দেয় । পিছু হটবার কোনও অবকাশই দেয় না । এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকলেও তাড়া লাগায় চারপাশ থেকে, রাজীব, নতুন কিছু চাই, এক্কেবারে অভিনব, অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় কিছু । মাঝে মাঝেই ছুটে আসে ক্যাথি বার্ড কিংবা তার চিঠি : প্রফেসর, হারি আপ, এগিয়ে চল, চরৈবেতি, থেমো না । এক্সটেণ্ড অ্যাণ্ড গ্লোরিফাই ইয়োর হরইজন্ । দেশ-বিদেশ থেকে অহরহ আসছে অসংখ্য চিঠিপত্র, ফটোগ্রাফ, পত্র-পত্রিকা, পরামর্শ, প্রত্যাশা, অনুরোধ উপরোধ... মাঝে মাঝে ক্লান্ত মনে হয় রাজীবের । অন্তরঙ্গ মহলে সে কথা ব্যক্তও করেছে সে । কিন্তু কে শোনে কার কথা ! রেসের ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিয়ে হাততালি দিচ্ছে গোটা রেসকোর্স..., মাঝপথে ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে গেলে দর্শক শুনবে ? দর্শকরা তো কোন্ দূরের কথা, পিঠের ওপর নিয়তি[illegible]ত বসে রয়েছে যে জকি, সেওকি শুনবে ?

রাজীবের মধ্যেও তো সেই জকিটা রয়েছে । অন্যদের থেকে বেশি তাড়া যেন তারই । কে এমন ভেতর থেকে অবিরাম তাড়া লাগাচ্ছে রাজীবকে ? রাজীব চিনতে চায় তাকে, বুঝতে চায় । মানুষের মনের মধ্যে একজন অর্থের কাঙাল থাকে, একজন নাম-যশ প্রতিষ্ঠার কাঙাল, একজন পর্যটক বাস করে, সে শুধু ডিঙিয়ে যেতে চায়, অতিক্রম করে যেতে চায় এক একটি সীমা রেখা, এক-একটি হার্ডল, এমনি এমনি, শুধু অকারণ পুলকে...। ব্যাপারটা রাজীব খুব ভাল ভাবে উপলব্ধি করেছে দীঘার সমুদ্রে ঢেউ ভাঙবার সময় । তিন-চার জনায় মিলে ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলা, শুধু এগিয়ে চলার আনন্দ, একের পর এক ঢেউ, সামনের ঢেউ, আরো সামনের ঢেউখানা ...। একবার মহা বিপদে পড়েছিল তিনজনায় । এগোতে এগোতে এমন জায়গায় পৌঁছেছিল, যেখানে ঢেউ নেই, শুধু ছলাত ছলাত জল, সামুদ্রিক পাখি, উদ্দাম হাওয়া আর দিগন্তহীন আকাশ, চারপাশে লবণাক্ত জলরাশি ...। ফিরতে গিয়ে পদে পদে দিক ভুল হওয়ার দরুন, একঘণ্টা বাদেও দিক নেই, দিগন্ত নেই, স্থলভাগের লেশ নেই, ঢেউ নেই ... । শেষ মুহূর্তে একখানা জেলে ডিঙি এসে বাঁচিয়েছিল ওদের । আসলে, এগিয়ে চলার মধ্যে একটা উত্তেজনা কাজ করে, ভেতর থেকে সেই উত্তেজনাটা কেউ বাড়িয়ে

দেয় । সে সম্ভবত কোন অর্থলিপ্সু, যশলিপ্সু কিংবা পর্যটক মানুষ নয়, খুব সম্ভব বুকের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে থাকে এক অস্থির শিল্পী, সে বাঁশ-খড়. মাটি-রঙ, একত্র করে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রতিমা গড়তে ভালবাসে... । কিংবা ক্যাথি বার্ড একদিন অবাক হয়ে শুধিয়েছিল, প্রফেসর, এই যে, একটি ছোট্ট গ্রামের একটিমাত্র 'ফোক'কে অতখানি গুরুত্ব দিচ্ছ এবং তার জন্য নিজেই খর্ব করছ বিশ্বজোড়া খ্যাতির অমন অমূল্য সুযোগগুলি, এর মনস্তত্ত্ব কি ? সবই কি ঐ 'ফোক'টিকে ভালবেসে ? তা তো বটেই । তা ছাড়া আর কি ! আমার অন্য কোনই প্রত্যাশা নেই ওদের থেকে । তখন বলেছিল বটে । কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক ভেবে বুঝতে পেরেছে রাজীব, কেবল অন্ধ ভালবাসাই নয়, আরও কিছু কাজ করছে এই পুরো লড়াইটাকে ঘিরে । একটা দায়িত্ববোধ, গজাশিমুলের মানুষগুলোর প্রতি । রঙলালের লাল খাতা থেকে তিল তিল করে উপড়ে এনেছে মানুষগুলোকে । এখন যদি তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে অন্যতর কোনও ভূমিতে, তবে কি গতি হবে ঐ মানুষগুলোর ! তারা আর স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারবে না রঙলালের কাছে । রঙলাল বেজায় হাসবে । ওর হাসির পিচকিরি আর থামতে চাইবে না । সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসতে থাকবে থানার বড়বাবু, পুণ্যাপানির অঘোর রায়, পচাপানির সিংহবাবুরা । এদের সঙ্গে রাজীবের সরাসরি কিছু হয়নি বটে, তবে এটা বুঝতে কোনই অসুবিধে হয় না, গজাশিমুলের বত্রিশটি পরিবারের এই তিল তিল বন্দীত্ব-মুক্তি তারা মোটেই পছন্দ করছে না । গজাশিমুলের মানুষগুলি আবার আধোবদনে রঙলালের খাতায় ফিরে গেলে ওরা হেসে আকুল হবে । সবাই টিটকিরি দেবে রাজীবকে, কালেজকা মাস্টার, খুলেছিল লাচের দল ! রঙলাল বুক ফুলিয়ে বলবে, কেমন ? বলেছিলাম না ? এ দেশে লেচে লেচে পেট ভরে না, বরং লাচতে লাচতে পেট বিলকুল খালি হয়ে যায় । আর, গজাশিমুলের এই অবোধ মানুষগুলো প্রজন্মকাল জুড়ে বলে বেড়াবে, সুখে-দুঃখে আমরা, গজাশিমুলের বসু-শবররা, ভালই ছিল্যম, একটা শহুরে 'কাঁকড়া' এস্যে আমাদ্যার পথে বসাঁই দিয়ে গেল । আমরা উয়ার লেগে সবংশে মল্ল্যম। সারা জীবন ওদের তীক্ষ্ণ তর্জনীর লক্ষ্য হয়ে থাকতে হবে রাজীবকে । সুতপা, শুধু গজাশিমুলের জন্যই যার সঙ্গে রাজীবের দূরত্বটা তিল তিল বাড়তে বাড়তে প্রায় অনতিক্রম্যতার পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেও কি কুলকুলিয়ে হাসবে ? সম্ভবত না, খুব, খুবই কষ্ট পাবে সুতপা, খুব অকৃত্রিম কষ্ট হবে তার । কাজেই, আর পিছু ফেরার উপায় নেই রাজীবের । এক ঠাইথেমে থাকবারও উপায় নেই । তাকে অবিরাম এগিয়ে যেতে হবে, জয় করতে হবে একের পর এক শৃঙ্গ, ভাঙতে হবে একের পর এক ঢেউগুলি । তার মানে, শুধু দায়িত্ববোধের তাড়নাই নয়, অন্য কোনও বিপন্নতাও কাজ করছে, যার ফলে, একটা মামুলি বন্দরে অন্তত ওদের পৌঁছে না দেওয়া অবধি, বৈঠাকে ক্রিয়াশীল রাখতেই হবে রাজীবকে ।

ভাবতে ভাবতে অস্থিরতা যত বেড়ে যায়, ততই রাগ জমে, পুঞ্জীভূত হয় তীব্র অসূয়া... । যাদের জন্য এই অহরহ ভাবনা রাজীবের, রঙলাল এবংতার সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে চড়া বাজি ধরে বসে আছে, সেই গজাশিমুলের মানুষগুলোর কিন্তু কোন দিকেই হুঁশ নেই । তলিয়ে যাবার ভয় কাবু করে না তাদের, বরং সামান্য বিপর্যয় বুঝলেই নিরাপদ আশ্রয় পেতে চায় রঙলালের লাল খাতায় । অনেক সময় সেটা ঠাহর করে উঠতেই জল অনেকখানি বয়ে যায় । আসলে, অনেক ভেবে চিন্তে বুঝেছে রাজীব, রঙলাল ওদের অধিকাংশেরই অভ্যাসে, সংস্কারে, ঢুকে

গিয়েছে । সেটাই পুরাতন, অভ্যস্ত পথ, তাই স্বচ্ছন্দ । নতুন পথ চিরকালই প্রাথমিক পর্বে অস্বাচ্ছন্দকর, সকলের কাছে । আর এই মানুষগুলো তো যুক্তি বুদ্ধি খাটিয়ে চলে কম, প্রায়শই চলে আবেগে, সংস্কারে, সনাতনী বিশ্বাসে... ।

নতুন পালাগান ছাড়া জয় করা যাবে না আর একটি শৃঙ্গ, অথচ গজাশিমুলের মুরুব্বিরা কিছুতেই দিচ্ছে না মত, কি এক ধর্মের মোড়কে পুরে ঐ হীরক খণ্ডটি লুকিয়ে রাখতে চায় মনুষ্য চক্ষের আগোচরে । এ সময়ে সুচাঁদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন, সুচাঁদ কথাও দিয়েছে । আর,তার কাছ থেকে একটি আশাব্যাঞ্জক সংবাদের জন্য কয়েক হপ্তা জুড়ে চাতক পাখির মত তাকিয়ে রয়েছে রাজীব উদগ্রীব প্রতীক্ষায় ।

কোলকাতা থেকে ফিরেই রাজীব শোনে, সুচাঁদ এসেছিল বাঁকুড়ায় । রাজীবকে না পেয়ে চিঠি রেখে এসেছে : মাস্টারদা কথা আছে, জলদি আসবে । রাজীব তিলমাত্র দেরি না করে ছুটে এসেছে । সুচাঁদের মুখ থেকে একটা সুসংবাদ শোনার জন্য মনটা আকুলি-বিকুলি করছে ওর ।

দশরথ ভক্তা বলে, 'বুস মাস্টার, টক্‌চান জিরাও । সুচাঁদরা অল্পক্ষণ বাদেই ফিরবেক ।'

কিন্তু রাজীব বসে না । তর সয় না যেন তার । এলোমেলো পা ফেলে সে হাঁটতে থাকে ভালুকমুড়া জঙ্গলের দিকে ।

মৃগয়াভূমিতে উল্লাস

ভালুকমুড়া ডুংরীটাকে ঘিরে রেখেছে যে জঙ্গলটা, ওটার নামই ভালুকমুড়ার জঙ্গল । কিছুদিন আগে অবধি ক্যাথি আর জনসন তাঁবু খাটিয়ে বাস করছিল ঐ ডুংরীর চুড়োয় । গজাশিমুল গ্রাম থেকে জঙ্গলটার দূরত্ব মাইলটাক । জঙ্গলটাকে চিরে, ডুংরীর গা ঘেঁসে বয়ে চলেছে ছোট-খরসতিয়া ।

ঝরনার শব্দটা ভেসে আসছিল দূর থেকে । শব্দটাকে নিশানা করে হাঁটতে থাকে রাজীব । গত কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে যে টিলাটার ওপর পাশাপাশি বসেছিল সুচাঁদ আর রঙী, ওটাকে ডাইনে রেখে পা চালায় সে । উজ্জ্বল হেমন্তের দুপুর । দিগন্তের গায়ে রাশি রাশি তুলোর পাহাড় ।

জঙ্গলের কাছাকাছি পৌঁছেই একটা অস্পষ্ট কোলাহল কানে এল রাজীবের । জঙ্গলের ভেতর থেকেই ভেসে আসছে কলরব । একটুক্ষণ কান পেতে শুনল রাজীব । তারপর দ্রুত গতিতে জঙ্গলে ঢুকল ।

অল্প হাঁটতেই সুচাঁদকে দেখা গেল । পাশাপাশি রঘুনাথ, কানচা, বদন, গজাশিমুল গাঁয়ের আরও দশ-বিশটা ছোকরা । সবাইয়ের হাতে লাঠি-বল্লম, তীর-কাঁড়. উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে মুখ । রাজীবের উপস্থিতিকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না কেউই । সামনে একটা বিশাল তেঁতুল গাছ । গাছটাকে বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়িয়েছে সবাই । সকলের দৃষ্টি ঐ গাছের চুড়োয় স্থির ।

রাজীব ওপরের দিকে তাকাল । তখনই পুরো ব্যাপারটা বোধগম্য হল তার । ঠেলু (হনুমান) শিকারে মেতেছে ছোকরার দল । ঠেলুর মাংস অতি উপাদেয়, কিন্তু ধরা ভারি কঠিন । বেজায় চালাক ঠেলুর জাত । কোন ক্রমে, সামান্যতম বিপদের আঁচ পেলেই, আর থাকে

না। গাছের ডালে ডালে ঝুলে-লাফিয়ে মুহূর্তে হাওয়া হয়ে যায় পুরো এলাকা থেকে। দু'তিন দিন, তেমন বিপদ বুঝলে দু'এক হপ্তাও এ তল্লাট মাড়ায় না। খুব সন্তর্পণে আটঘাট বেঁধে তাই ঠেলু শিকারে নামতে হয়, নইলে দৌড়োদৌড়ি, লম্ফ-ঝম্ফ, পরিশ্রমটাই বৃথা।

কতক্ষণ ধরে এরা ঠেলু শিকার পর্ব শুরু করেছে কে জানে, তবে রাজীব দেখল, সারা তল্লাট জুড়ে একটাও হনুমানের লেশমাত্র নেই। কেবল একটা দশাসই হনুমান বসে রয়েছে তেঁতুল গাছটার মগডালে। অর্থাৎ, রাজীবের বুঝতে কষ্ট হয় না, বহুক্ষণ জঙ্গল জুড়ে দাপাদাপি করছে ছোকরার দল এবং অবশেষে পুরো দল থেকে একটিকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পেরেছে। দলের মধ্যে যে ছিল শৌর্যে-বীর্যে, প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তারই এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। ভয়ে-আতঙ্কে কাণ্ডজ্ঞানহীন।

রাজীব দেখে, মৃত্যুভয় ফুটে উঠেছে হনুমানটির চোখে-মুখে। সারা শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে। তেঁতুলের ঘন ডালপালার আড়ালে শরীরখানি লুকিয়ে ফেলবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে প্রাণীটি। ঘাড় ঘুড়িয়ে বার বার দেখে নিচ্ছে চারপাশে, কোন্ দিক থেকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে মৃত্যু, অথবা বাঁচবার পথ কোনদিকে খোলা রয়েছে কিনা।

রাজীব পায়ে পায়ে এগোচ্ছিল। সেটা বুঝতে পেরে গাছের তলা থেকেই চেঁচিয়ে ওঠে সুচাঁদ, 'এগাবেন নাই, মাস্টারদা। বেজায় ক্ষেইপ্‌ছে ঠেলুর পো। যে কুনো মুহূর্তে ঝাঁপ মারবেক, যে কুনো দিকে।'

রাজীব থমকে দাঁড়ায়। কথাবার্তায় যেটুকু সময় সামান্য অন্যমনস্ক হয়েছিল সুচাঁদেরা, সেই সময়টুকুর সদব্যবহার করতে ছাড়ে না হনুমানটি। লাফ মারতে যায় অল্প তফাতে কুসুম গাছটিকে নিশানা করে। কিন্তু তার আগেই রঘুনাথের অব্যর্থ তীর এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয় ওর বুক। একটা করুণ আর্তনাদ তুলে, ডালে-পালায় ঝড়-ঝড় আওয়াজ তুলতে তুলতে ওর বিশাল শরীরখানা আছড়ে পড়ে মাটিতে। তুমুল উল্লাসে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ছুটে যায় সবাই। শিকারের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়ায়। অসহনীয় ক্লান্তিতেও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সকলের চোখ। হনুমানের লাশটাকে বাঁশে ঝুলিয়ে গাঁয়ের দিকে রওনা দেয় ওরা। রাজীব জানে, ওরা মাঝ রাস্তা অবধি পৌঁছুবার আগেই গ্রাম থেকে ছেলে-মেয়ে দলে দলেছুটে আসবে, চারপাশ থেকে একেবারে ঘিরে ফেলবে শিকারীদের। তারপর ওদের সম্মিলিত বাহিনী রীতিমত কলরব করতে করতে শোভাযাত্রা সহকারে গাঁয়ে ঢুকবে। এবং ঠেলুর মাংস ভাগাভাগি করে নিয়ে আজ সারা গাঁ জুড়ে জমে উঠবে বিশাল ভুরিভোজ।

এক ফাঁকে ভীড় কেটে বেরিয়ে এল সুচাঁদ, এগিয়ে এল রাজীবের দিকে।

শুধোল, 'কোলকাতা থিকা কবে ফিরল্যে, মাস্টারদা ?'

'ফিরেছি রে, দু'তিন দিন আগে। এসেই তোর চিঠি পেলাম। তুই বাঁকুড়ায় গিয়েছিলি কেন ?'

'সরকারী দপ্তরে কিছো টাকা পাওনা রয়্যেছে না ? এক বচ্ছর হয়্যে গেল, খালি ঘুরাচ্ছে। ভাবল্যম, যাই একবার, যদি টাকাটা পাই।'

রাজীবের মন নেই এসব কথায়। তার সর্ব ইন্দ্রিয় উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে সুচাঁদের মুখ থেকে আসল কথাটি শোনার জন্য।

এক সময় প্রতীক্ষার অবসান ঘটায় সুচাঁদ। বলে, 'একটা সুখবর আছে

মাস্টারদা ।'

রাজীব আকুল আগ্রহে তাকিয়ে থাকে সুচাঁদের মুখের দিকে ।

'শেষমেশ মুরুব্বিদ্যার মত মিলছে । 'জলকেলি নাচ, দেখানোতে উয়াদ্যার কোনও আপত্তি নেই ।'

রাজীব পারলে জড়িয়ে ধরে সুচাঁদকে, 'তুই সত্যি বলছিস, সুচাঁদ ? আহ্-!'

'তেবে দুখান্ শর্ত আছে ।'

'শর্ত ?' সামান্য ভুরু কুঁচকে তাকায় রাজীব । এমনিতেই সুচাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় দ্রব হয়ে গিয়েছে সে । এই যে মুরুব্বিদের অনুমতি পাওয়া গেল, এর পেছনে রয়েছে সুচাঁদের নিরলস প্রয়াস । সুচাঁদই দিনের পর দিন পাথর কুরে কুরে সুড়ং ফুটিয়েছে মুরুব্বিদের অন্তরে । ছেলেটার তুলনা নেই, রাজীবকে স্বীকার করতেই হয় মনে মনে ।

হাঁটতে হাঁটতে শর্তগুলো শুনল রাজীব । এক, আসরে যতদূর সম্ভব আব্রু রেখে দেখাতে হবে 'জলকেলি নাচ' । দুই, প্রতিবার গাওন সেরে ফিরে এসেই কানাইশর জীউর পূজা দিতে হবে । এবং তার যাবতীয় খরচ বহন করতে হবে সংস্কৃতি সংঘকে ।

দু'টো শর্তই তৎক্ষণাৎ মেনে নিল রাজীব । একেবারে উদোম হয়ে নাচবার প্রশ্নই ওঠে না । সেটা নেহাতই, অশ্লীলতার প্রদর্শনী হবে । তবে 'জলকেলি নাচ'-এর মহিমার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যতখানি বস্ত্রত্যাগ প্রয়োজন, তা তো করতেই হবে । আর দ্বিতীয় শর্তটা তো কোনও শর্তই নয় । কানাইশর জীউর পুজোতে কতই বা খরচ ।

সহসা রাজীব অনুভব করে তার সারা শরীর জুড়ে টগবগে ঘোড়ার ফুর্তি । খুশিতে যেন নাচতে ইচ্ছে করছে তার । ভোরের হাওয়ার মতো ফুরফুরে হয়ে উঠেছে মন । অনেকক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারল না সে । সুচাঁদের পাশে পাশে নিঃশব্দে হেঁটে এল অফিস - ঘর অবধি ।

মৃগয়াভূমিতে আরও এক রক্তাক্ত শিকার

ঠা ঠা করছে দুপুর । জঙ্গলের মাঝে মাঝে জেগে থাকা ডুংরীগুলো নিঃশব্দে পুড়ছে । দূরবর্তী ঝর্নার এক ঘেঁয়ে আওয়াজ ভেসে আসে ।

সুচাঁদ বলে, 'আপনার জন্যে একটা মুরগি আনি মাস্টারদা । আর কৌশল্যাকে পাঠাই দিচ্ছি, রেঁইধ্যে-বেইড়ে দিয়ে যাবেক । আজ ত আমাদের ফের অন্য চিজের ভোজ ।'

'না-রে-।' সুচাঁদকে হাত নেড়ে থামায় রাজীব, 'এ বেলা তেমন কিছু খাব না । আমার সঙ্গে পাউরুটি রয়েছে, ডিম ভেজে নেব । ও নিয়ে তুই ভাবিস নে । তার বদলে, তুই দ্যাখ্ দিকি, ঐ নাচখানা কত জলদি দেখতে পারি আমি । ওটা না দেখা অবধি তো ও বিষয়ে এক চুলও এগোনো যাবে না । হ্যাঁরে-।' রাজীব সহসা অধীর হয়ে ওঠে, 'আজ রাতেই দেখা যায় না ? দ্যাখ্ না একটু চেষ্টা করে । আমার মনের অবস্থাটা তুই বুঝতে পারছিস তো ?'

ধীরে ধীরে মাথা দোলায় সুচাঁদ । রাজীব লক্ষ্য করে, তার মনে এই মুহূর্তে পুলকের বন্যা বয়ে গেলেও, সুচাঁদের মুখখানি মলিন । ম্লান হাসির অন্তরালে গাঢ় বিষাদ ।

'সুচাঁদ !' রাজীব দু'পা এগিয়ে এসে সুচাঁদের পিঠে হাত রাখে, 'তুই খুশি হোস নি ?'

সুচাঁদ মাথা দোলায় ।

'তুই দেখিস, এই পালাগান করে তোদের বিশ্বজোড়া নাম হবে । তোরা বিদেশে যাবি । তোর আনন্দ হচ্ছে না ?'

'হচ্ছে ।' খুব ধীর গলায় জবাব দেয় সুচাঁদ, মুখের বিষাদ কমে না একতিল ।

'তবে এমন শুকনো মুখ কেন তোর ? বল ।' বলতে বলতে সহসা যেন খেয়াল হয় রাজীবের । মৃদু হেসে বলে, 'বুঝতে পেরেছি । তুই নিশ্চয়ই রঙীর ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিস ? ভাবিস নে, রঙীর ভাবনা আমার । ওকে ছাড়া এ পালাগান হবেই না । ওকে আমরা রঙলালের খপ্পর থেকে ছাড়িয়ে আনবই ।'

'কী করে ছাড়াই আনবেন, মাস্টারদা ?' সুচাঁদ ধরা গলায় বলে ওঠে, 'উয়ার কাপড়-চুপোড় কাচা সারা ।'

একটু যেন চমকে ওঠে রাজীব, 'কেন ?'

'রঙলালের সাথ চলে যাচ্ছে উ ।'

'কবে ?'

'খুব জলদি । দু-এক দিনের মধ্যেই ।'

রাজীব খানিকক্ষণ বজ্রাহতের মত স্থির হয়ে যায় । ঝাড়েশ্বর যে রঙীকে বেচে দিচ্ছে, সে খবর সুচাঁদই ওকে দিয়েছিল কিছুদিন আগে । কিন্তু রঙলাল যে এত জলদি জাল গুটিয়ে ফেলবে সেটা ভেবে উঠতে পারে নি রাজীব । তা ছাড়া, ঐ পালাগানটা নিয়ে এমন একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হল, মন-মেজাজ একেবারেই ভালো ছিল না ওর । এক সময় তো সে সংস্কৃতি সংঘের পালাগান-টান ছেড়ে পুরোপুরি মল্লভূম ফোক রিসার্চ সেন্টার নিয়েই থাকবে, ঠিক করে ফেলেছিল । খুব হতাশ লাগছে এই মুর্হূতে । রঙীর ব্যাপারে কি খুব বেশি দেরী করে ফেলল সে !

'তোরা ঝাড়েশ্বরকে কিছু বলিস নি ?'

'কতবার গেল্যম উয়ার পাশ, একা একা , দল বেঁইধে, কত কইর‍্যে বুঝাল্যম্ ।'

'কি বলে ও ?'

'উ কি বলবেক ? এক হাজার টাকা লিয়েছে রঙলালের থিক্যে । বলে, কাম কইর্‌তে পাঠাচ্ছি মেয়াকে, তুয়ারা বইল্‌বার কে ?'

কয়েক মুহূর্ত পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে যায় রাজীব । বলে, 'তোরা রঙীকে বুঝিয়ে বলিস নি ?'

'উয়াকে পাব কুথা ? দিনরাত ঘরের মধ্যে আটক কইর‍্যে রেখেছে । আমাদেরকে উয়ার পাশ ভিড়ত্যে দিচ্ছে নাই ।'

শুনতে শুনতে রাজীবের কপাল টান টান হয়ে ওঠে । চোখে-মুখে তীব্র রোষ ।

বলে, 'আমরা থানায় যাব । রঙলালের নামে মামলা করব ।'

'সে পথ বন্ধ করে দিয়েছে রঙলাল ।' তীব্র হতাশা ঝরে পড়ে সুচাঁদের গলা দিয়ে, 'ঝাড়েশ্বর মামুকে থানায় লিয়ে গিয়ে পুলিশের সাইক্ষাতে লিখাপড়া করে লিয়েছে রঙলাল । মেয়া তার স্বেচ্ছায় যাচ্ছে কাজ কইর্‌তে, ঝাড়েশ্বর মামুও উয়াকে স্বেচ্ছায় পাঠাচ্ছে ।'

ধীর গলায় কথা বলছে সুচাঁদ, রাজীবের মনে হয়, বুঝি ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে

মাটিতে। ভিজে যাচ্ছে রুক্ষ মাটির বুক।

কপালের রগ দুটো সজোরে টিপে ধরে রাজীব। ঐ অবস্থায় চুপ করে বসে থাকে অনেকক্ষণ। সুচাঁদ দাঁড়িয়ে থাকে পাথরের মূর্তির মত।

এক সময় মুখ তোলে রাজীব।

খুব ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'তুই ভাবিস নে, রঙী যাবে না, কিছুতেই না। যা করবার করছি আমি। তুই 'জলকেলি নাচ'টা যত জলদি সম্ভব দেখাবার ব্যবস্থা কর্।'

ধীর পায়ে চলে যায় সুচাঁদ। রাজীব ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। কপালের শিরাগুলো দুশ্চিন্তায় কাঠ হয়ে যায়। তীরে এসেও তরী কি এমনি ভাবেই ডুবে যাবে!

ক্যাথি বার্ডকে রাজীবের চিঠি

প্রিয় মিস বার্ড,

তুমি আমাকে একদিন বলেছিলে, প্রফেসর চৌধুরী, আশাভঙ্গের তুল্য বেদনা আর এ পৃথিবীতে কিছুই নেই। বলেছিলে, ওতে পাঁজরগুলো ভেঙে যায় মড়মড় করে, যদিও ঐ মড়মড় আওয়াজখানি শুনতে পায় না চারপাশের মানুষ। আমি আজ এক নিদারুণ আশাভঙ্গের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। প্রতি মূর্হুতে আমার পাঁজরগুলো, একটি-একটি, মড়মড় আওয়াজ না করেও ভাঙছে। তুমি আরও বলেছিলে, তৃষ্ণার্ত মানুষ যদি জলাশয়ের পাশে গিয়েও কোন জটিল কারণে মুখ এবং জলের মধ্যে সংযোগ ঘটাতে ব্যর্থ হয়, তবে তার অন্তর্গত রক্তের মধ্যে যে তীব্র অস্থিরতার সৃষ্টি হয়, সে অস্থিরতার তীব্র অভিঘাতে শরীরের মধ্যে জন্ম নিতে পারে এক ভয়ঙ্কর জীবন্ত প্রতিশোধপ্রবণ আগ্নেয়গিরি, যার লাভা-কেন্দ্র একটিমাত্র হলেও জ্বালামুখ অসংখ্য। একেবারে জলের পাশটিতে পৌঁছে গেছি আমি, কিন্তু জলের শরীরে ঠোঁট ছোঁয়াতে পারছি নে কিছুতেই। মিস বার্ড, আমি জ্বলছি। ব্যাপারটা খুলেই বলি।

'তোমাকে 'জলকেলি নাচ' সম্পর্কে আগের চিঠিতে লিখেছিলাম। চিঠিখানা ছিল সংক্ষিপ্ত। ঐ চিঠিতে তোমার মন ভরে নি নিশ্চয়ই। আসলে, 'জলকেলি নাচ'-এর পুরো ব্যাপারটা খুব বেশি জানা ছিল না আমার। কেবল ঐ নাচের উৎপত্তি এবং ধরন সম্পর্কে যেটুকু জেনেছিলাম, সেটাই জানিয়েছিলাম তোমাকে। ইতিমধ্যে আমি ঐ নাচ দেখলাম, মিস বার্ড, আমি স্বচক্ষে দেখলাম! ঐ ঝরনাটার ধারে, মউল গাছ দিয়ে ঘেরা জায়গাটিতে ভর-ভরন্ত দুধ-জ্যোৎস্নায়, দীর্ঘ দেড়ঘণ্টা ব্যাপী আমি দেখলাম সেই অপার্থিব নাচ! সে নাচের তাল, মুদ্রা, প্রতি অঙ্গ- বিভঙ্গ, সে গানের সুর... তাকে ভাষা দিয়ে বোঝাই, এমন ক্ষমতা আমার নেই। তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ঐ জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে অন্তত কিছু সময়ের জন্য এই সৌরমণ্ডলের থেকে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল আমার। কোন্ অপার শূন্যে কোন্ মহাজাগতিক আকর্ষণে আমি নিরালম্ব ভেসে বেড়িয়েছি, একখণ্ড তুলোর মত, ভারহীন, আকাঙ্ক্ষাহীন, স্মৃতিহীন, নিরপেক্ষ হয়ে,— এক অনন্ত সৌরভের জগতে। বিশ্বাস কর, মিস বার্ড, আবেগমথিত একজন মানুষের উথলান ফেনার মত বাক্যপুঞ্জ নয়, আমার সেই সময়ের অনুভবটুকু নিতান্ত অক্ষম বাক্যবন্ধ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম মাত্র। তোমারও হবে, একদিন, তেমনই অনুভূতি, হবেই। নেচেছিল কৌশল্যা, একাদশী, মউলী, পার্বতী আর সোহাগী। মাত্র পাঁচজন। দর্শক হিসেবে ছিল দশরথ ভক্তা, ওর বউ আর আমি। মাত্র পাঁচজনে সেদিন সারা বনভূমিকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। দশরথ ভক্তার বউ বলে, ওরা কম পক্ষে পঁচিশ-

তিরিশ জন, অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে নাচে । পুরো কম্পোজিশনটা একটিবার কল্পনা কর দেখি !

স্বচক্ষে দেখলে তোমার কেমন লাগবে আমি জানি না । এদেশের ফোকের প্রতি তোমার অকৃত্রিম আগ্রহ ও অকপট নিষ্ঠা থাকলেও এই দেশ, তার মাটি-মানুষ,তার প্রকৃতি আর দর্শনের সঙ্গে তোমার সে অর্থে কোনও আত্মীয়তা নেই । দেখে, তুমি হয়ত মুগ্ধ হবে, কিন্তু কতখানি আপ্লুত এবং একাত্ম হবে বলতে পারি নে, কিন্তু এই দেশের মাটি-জল-হাওয়ায় পুষ্ট একজন মানুষ হিসেবে, আমি একেবারে আবেগহীন হয়েই বলছি, আমি এক আশ্চর্য হীরক খনির সন্ধান পেয়েছি । কেবল নাচে-গানেই অভিনব নয়, এই 'জলকেলি' নাচের পরতে পরতে লোকায়ত শিল্পের যে নান্দনিক প্রয়োগ এবং পাশাপাশি এর যে দার্শনিক ব্যঞ্জনা,তা এক কথায় অবিশ্বাস্য । নাচের প্রতিটি মুদ্রায়, গানের প্রতিটি কলিতে, সুরের মীড়ে মীড়ে লুকিয়ে রয়েছে এমন এক অনাস্বাদিত পুলকের অবিরল উৎস এবং এর আবেদন এত গভীর, দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে হতবাক হয়ে যেতে হয় । আমি দেখেছি, নিতান্তই খণ্ডমাত্র, তাতেই শিহরিত । শুধু এর নান্দনিক দিকই নয়, লোকায়ত উপাদানই নয়, এই নাচ আরও একটি ভাবনার দরজা হাট করে খুলে দিয়েছে । এই সম্প্রদায়টিকে আমরা আদিম অরণ্যচারী বলেই জানি । ওরাও নিজেদের সেই রকমই জানে । কিন্তু ভেবে দ্যাখ, এমন গভীর বৃষ্টি-ভাবনা কাজ করছে যাদের লোকায়ত নৃত্য-গীতের মধ্যে, তারা কৃষিজীবী না হয়ে যায় না । এর সঙ্গে, স্মরণ কর ওদের 'আষাঢ়িয়া' নাচের কথা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এককালে এরা অবশ্যই কৃষিজীবী ছিল । কারা এদের কাছ থেকে কেড়ে নিল কৃষির জমি, কবে এবং কেন, এটা অবশ্যই আগামী দিনের গবেষণার বিষয় হতে বাধ্য ।

কিন্তু যে কারণে এই চিঠির অবতারণা তা হল, প্রায় তীরে এসে ডুবতে বসেছে আমার নৌকোখানা । কারণ, বহু মেহনতে যদি বা এই পালাটি মঞ্চস্থ করবার অনুমতি আদায় করা গেল মুরুব্বিদের কাছ থেকে, ইতিমধ্যে ঘটে গেছে আরও এক মর্মন্তুদ বিপর্যয় । রঙীকে সম্ভবত পাওয়া যাচ্ছে না এই পালাগানে । কারণ, রঙীর বাপ চড়া দামে ওকে রঙলালের কাছে বেচে দিয়েছে । ব্যাপারটা এত গোপনে ঘটেছে যে আমরা কিছু বুঝতেই পারি নি আগে । রঙী এখন তার নিজের বাড়িতেই নজরবন্দী । অথচ রঙী ছাড়া আমি এই পালাগান মঞ্চস্থ করবার কথা ভাবতেই পারি নে ।

ব্যাপারটা নিয়ে আমি থানায় গিয়েছিলাম খবর করতে । কিন্তু তোমাকে তো বলেছি, এ দেশের পুলিশ এবং প্রশাসন তার নিজস্ব দর্শনে চলে । কাজেই, যদি একটি দরিদ্র অসহায় মেয়ে বিক্রি হয়ে চালান হয়ে যায়, তাতে এ দেশের কারোরই সামান্যতম মাথাব্যথার কারণ ঘটে না । থানা, সুতরাং, আমাকে পাত্তা দেয় নি । বরং আমাকে 'উগ্রপন্থী' আখ্যা দিয়ে 'আটক-আইনে' ফাটকে পুরবে বলে ভয় দেখিয়েছে । দেখছি, আরও ওপরে গিয়ে কিছু করা যায় কি না । এ ব্যাপারে সব চেয়ে বড় সমস্যা হল, ঝাড়েশ্বর কোটাল, রঙীর আইনগত অভিভাবক সে, কিছুতেই রঙলালের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করতে রাজি নয় ।

অন্য একটা পন্থাও ভেবেছি । দেখা যাক । তেমন প্রয়োজন হলে, হয়ত তোমার সাহায্যও চাইব । আপাতত 'জলকেলি' নাচের সুস্বাস্থ্য কামনা করে একগ্লাস স্যাম্পেন পান করেই সন্তুষ্ট থেকো ।

১৬ রঙী এখন অন্য গান গায়

ঝাড়েশ্বর কোটালের উঠোনে পা' দিতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল রাজীব। বারান্দা থেকে ভেসে আসছে মিহি গানের সুর। সন্ধ্যার আঁধারে রিনরিন করে ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। কেউ একা একা গান গাইছে অন্ধকারে বসে। কোনও মেয়ে। খুব সম্ভব রঙী। সন্ধ্যের দিকে বন্দী-জীবন থেকে একটুখানি মুক্তি পেয়েছে বুঝি। আহা! কি সুন্দর গলাটি রঙীর। কতদিন সাধেনি। তবুও কত মিঠে। বরং আগের চেয়ে অনেক ভালো লাগছে যেন ওর গান।

বেড়ার আড়ালে থমকে দাঁড়াল রাজীব। দূর থেকে ভেসে আসছে গানের কলিগুলো:

ফাঁকি দিয়ে ডিপুঘরে ঢুকালি
হা যদুরাম, কুথা লুকালি—।
ভোখেতে পেট জ্বলে—
কোড়া খেইয়েঁ পিঠ জ্বলে—
ঘরের লেইগ্যে আন্তর জ্বলে খালি
হা যদুরাম, কইরলি চতুরালি।

রাজীব নিবিষ্ট মনে শুনতে লাগল গানের কথাগুলো। অঘ্রাণের সন্ধ্যেবেলা, সঙ্গে নিয়ে আসে হিম-বাতাস। চারপাশের জঙ্গল-ডুংরী শীতল হয়ে আসছে দ্রুত। শিশির জমছে ঘাসের ডগায়, গাছ-গাছালির পাতায় পাতায়।

কাছে গেলেই থেমে যাবে গান, রাজীব জানে। অথচ অমন মিঠে গলার গানখানি পুরোপুরি শুনতে ইচ্ছে করে। তাছাড়া, রঙীর গলায় এ গানের স্বতন্ত্র তাৎপর্য রয়েছে। এ আসাম মুলুকে পাচার হয়ে যাওয়া কুলি-কামিনের বুক ভাঙা গান। ওদের প্রতারিত জীবনের কথা। বসু-শবররা যেমন মৌচাক-ভেঙে মধু নিংড়ে বের করে, ঠিক তেমনি। আসাম মুলুকে গিয়ে এ ধরনের বেশ কয়েকটি গান শুনেছিল রাজীব। তার থেকে কিছু কিছু লিখেও এনেছিল। আসাম মুলুকে কুলি-কামিন চালান করা নিয়ে একটা পালাগান বাঁধবার ইচ্ছে ছিল রাজীবের। গানগুলি সংগ্রহ করেছিল সেই উদ্দেশ্যে। সময়ে সে ইচ্ছেটা হয়তো পূরণ হবে। কিন্তু রঙী এ গান জানল কি করে? কেমন করে শিখল এ সুর! সে তো কোনদিন আসাম-মুলুকে যায়নি। আসাম-মুলুক থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরেও আসেনি কোনও মেয়ে? তবে? ভাবতে ভাবতে বিস্ময়ে ডুবে যেতে থাকে রাজীব।

রঙী গাইছিল : কাজবাবু সাঁঝ ব্যালায়
শরীলখানা ছিঁড়্যে ফ্যালায়,
সর্দার এইস্যে করে ছেনালি—,
হায় যদুরাম,
ফাঁকি দিয়্যে কুন্ নরকে পাঠালি।।

বিস্ময়ের ঘোরটা পুরোপুরি ছিল রাজীবের, আচমকা মস্তিষ্কের কোষে কোষে কে যেন বাতি জ্বালিয়ে দিল শত শত। রাজীবের দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল হীরক খণ্ডের মত।

সুচাঁদ! সুচাঁদই শিখিয়েছে এ গান। সকলের অন্তরালে, কোনও মউল গাছের তলায় কিংবা ডুংরীর ছায়ায় বসে এক এক পংক্তি ধরে ধরে শিখিয়েছে। আরও গভীরে গিয়ে ভাবে

রাজীব । আসলে ছবি এঁকেছে সুচাঁদ, রঙীর মনের মধ্যে আসামের কুলি-জীবনের যন্ত্রণার ছবি । যাতে রঙী স্বপ্নেও আসাম-মুলুকে যাওয়ার কথা না ভাবে ।

এক সময় থামল গান । রাজীব বেশ খনিকক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল । দুয়োরে শালের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে রঙীও বসে রইল নিশ্চল হয়ে । সন্ধ্যের আঁধারে যেন এক পাথরের খোদাই করা মূর্তি ।

একটুখানি অপেক্ষা করে ঝাড়েশ্বর কোটালের উঠোনে ঢুকল রাজীব । গলা চড়িয়ে হাঁক পাড়ল, 'ঝাড়েশ্বর— আছ নাকি ?'

সহসা পাথরের খোদাই মূর্তি নড়ে চড়ে উঠে দাঁড়াল । অন্ধকারে থেকে সেটা দেখতে পেল রাজীব । মূর্তিটা চটপট উঠে পালাতে চাইছিল ভেতরে । টের পেয়েই রাজীব পেছন থেকে বলে উঠল, 'কে, রঙী নাকি ?'

'হুঁ' । বড় মিহি গলা রঙীর ।

যেন এক টিয়েপাখি মৃদু শিস্ দিল । রাজীব বুঝল, রঙীর বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলাতো বন্ধই, ঘরের মধ্যেও বেশি জোরে কথাবার্তা বলা নিষেধ ।

জবাব দিয়েই সাত-তাড়াতাড়ি পালাতে চাইছিল রঙী । পা' বাড়িয়েছিল দরজার দিকে । তার আগে মৃদু গলায় ধমক দিল রাজীব, 'থাম্ । কথা আছে ।'

রাজীবের গলায় অন্য কিছু ছিল । রঙীর পা'দুটো কে যেন পুঁতে দিল শুকনো মাটিতে । পায়ে পায়ে রঙীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাজীব । শুধোল, 'ঝাড়েশ্বর কই রে, রঙী ? বাড়ি নেই ?'

'আছে ।' অস্পষ্ট গলায় জবাব দিল রঙী, 'ভিতর বাগে শুয়্যে রয়েছে । জ্বর আঁইছে ।'

রাজীব পায়ে পায়ে দাওয়ায় উঠল ।

বলল, 'আলো-টালো থাকলে জ্বাল্ । ঝাড়েশ্বরকে ডাক্ । আমার কিছু কথা আছে ওর সঙ্গে । সুচাঁদও আসছে ।'

ধীর পায়ে ভেতরে ঢুকে গেল রঙী । খানিকবাদে একটা ডিবা-লম্ফ জ্বেলে নিয়ে ফের বেরিয়ে এল বাইরে।

ডিবা লম্ফের নাচুনি আলোয় রঙীকে অল্পক্ষণের জন্য দেখল রাজীব । অল্প চমক খেল । ধীরে ধীরে ওর সারা শরীরে দৃষ্টি বোলাল । নাহ্, শরীরের কোথাও রোগ-ব্যাধির লেশমাত্র নেই বরং সুন্দর চালতাফুলি মুখখানি আরওসুন্দর হয়েছে । সারা অঙ্গে একটা বাড়তি জৌলুস । যৌবনের ভারে যেন নুয়ে পড়তে চায় তনুলতা । সুচাঁদের কথাটিই ঠিক তাহলে । রঙীর কঠিন অসুখ বলে যে রটনাটা করেছে ওর বাপ, সেটা সর্বৈব মিথ্যা । রঙী ভালোই আছে । বরং রঙলালের দেওয়া বাড়তি টাকায় খেয়ে দেয়ে নিজেকে আরও একটুখানি ফুটিয়েছে ।

কেবল মুখখানিতে সীমাহীন বিষাদের ছাপ । চোখদুটো যেন বন্দী, খাঁচার পাখি । ঠোঁটদুটো শুকনো ।

রাজীবের চাউনিতে বিব্রত বোধ করে রঙী । লম্ফখানা ঢপ্ করে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে পালায় ঘরের মধ্যে । নিজেকে লুকিয়ে ফেলে বাঁশের কপাটের আড়ালে ।

রাজীবের ঠোঁটের কোণেও একচিলতে বিষণ্ণ হাসি । রাজীব যখন এ গাঁয়ে পা' দিয়েছিল,

তখন রঙী ছিল নিতান্তই কিশোরী। অধিকাংশ সময় গায়ে ছৈতার আঁচল আলতো জড়িয়ে কিংবা উদোম গায়ে ঘুরে বেড়াত। সেই মেয়ে ওর চোখের সুমুখে ডাগর হল। ডুরে শাড়ি পরল। পুরুষ্টু হল তার পায়ের গোছ। ভরাট হল চোখের কোল। পালাগানের দলে নাম লেখাল সে। দাপটের সঙ্গে নাচতে লাগল বিশ্বভুবন। সে সব ছবি আজও রাজীবের চোখে ভাসে।

কিন্তু এই মাস কয়েকের ব্যবধানে তার যেন এক নতুন রূপ। তার শরীরের প্রতিটি প্রত্যঙ্গ, তার হাঁটাচলা, দৃষ্টিপাত, এমন কি গায়ের গন্ধও বুঝি বদলে গিয়েছে। এ যেন এক নতুন রঙী, যার দিকে বেশিক্ষণ সাবলীল ভাবে তাকিয়ে থাকা যায় না। সহজ ভাবে কথা বলতে গেলেও বুঝি একধরনের অস্বস্তি আড়াল থেকে সর্বদা খোঁচা মারে। বোঝা গেল, রঙী যুবতী হয়েছে। এবং মেয়েরা বুঝি কিশোরী থেকে হঠাৎই যুবতী হয়ে যায়। কাউকে কোনও প্রস্তুতির সুযোগও দেয় না। আগে হলে পলায়নরতা রঙীর বাম হাতখানা খপ করে ধরে ফেলা যেত। চুলের বিনুনীতে হ্যাঁচকা টান মেরে ধমকানো যেত। কিন্তু রাজীব বুঝতে পারল, আজ সেটা একেবারেই অসম্ভব। কারণ, রাজীবের চোখে আজকের রঙী একেবারেই অচেনা।

বার দুই গলা ঝাড়ল রাজীব। তারপর যথাসম্ভব মার্জিত গলায় বলল, 'রঙী, তোর বাবাকে ডাক একটি বার।'

ডিপুঘরের পাহারাদারী করে ঝাড়েশ্বর কোটাল

কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরোল ঝাড়েশ্বর কোটাল। পেছনে রঙী। তার হাতে একখানা পুরোনো তালাই। তালাইখানা পেতে দিয়ে সে ফের ঢুকে গেল ঘরে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল কপাটের বাজু ধরে।

রাজীব বসল। ঝাড়েশ্বরও অল্প দূরে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসেছে। খক্ খক্ করে কাশছে অবিরাম। জ্বরের প্রকোপে ঘন ঘন শ্বাস টানছে সে। বুকখানা ওঠানামা করছে হাপরের মত। মাঝে মাঝে এক ধরনের বিজাতীয় আওয়াজ বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে।

একটুবাদেই সুচাঁদ এল। সুচাঁদকে দেখা মাত্রই রঙী নিমেষের মধ্যে চলে গেল কপাটের আড়ালে। তালাইয়ের এককোণে বসে একটা বিড়ি ধরাল সুচাঁদ।

ডিবা-লম্ফের আলোটা নাচছিল। নাচুনি আলোটা মাঝে মাঝে লাফ মারছিল আকাশের দিকে। চারপাশের বস্তুগুলো ছায়া সমেত দুলছিল।

ডিবার ম্লান আলোয় চারপাশটা নিবিষ্ট মনে দেখছিল রাজীব। চারপাশে এক জরাজীর্ণ অবস্থা। কোনও ছিরি-ছাঁদ নেই। সবকিছুই ভারি নোংরা আর আগোছালো। মাথায় ওপর চালখানা ফুটো। পশ্চিমের চালের খানিকটে খড় উড়ে গিয়ে বাতা বেরিয়ে পড়েছে। খুঁটিগুলোও ঝরঝরে। উঠোনের এক কোণে একখণ্ড গরুর হাড় এনে ফেলেছে বোধ করি কুকুরে। বাঁদিকে জীর্ণ ঢেঁকিশাল। কে যেন পুঁটলির মত বসে রয়েছে ঢেঁকিতে ঠেশ দিয়ে। বিড় বিড় বকছে একনাগাড়ে। চিনতে দেরী হল না রাজীবের। ঝাড়েশ্বরের বউ। আজ দশ বছর পাগল। সারাদিন এক ঠাই বসে ভুট ভুট করে। নাওয়া খাওয়ার ঠিক থাকে না। থাকে না কাপড়-চোপড়ের সাড়।

চারপাশটা নজর করলেই মালুম হয়, ঝাড়েশ্বর কোটালের সংসারের জরাজীর্ণ অবস্থাটা।

রাজীব জানে, আজও এদের দু'বেলা পেট ভরে ভাত জোটে না। ঝাড়েশ্বরের চার মেয়ে প্রথম দুটি গেছে রঙলালের সঙ্গে। তার মধ্যে মেজটির কোনও খোঁজ নেই। বড়টি চা-বাগানে বেশ্যাবৃত্তি করে। তার বদলে দু'বেলা শুধু খেতে পায়। রাজীব আর সুচাঁদই এসব খবর এনেছিল বছরটাক আগে। খবরটা ঝাড়েশ্বরকে একেবারে বুড়িয়ে দিয়েছে। বিকেলের দিকে জ্বর আসছে রোজ। সঙ্গে আরও হরেক উপসর্গ। ইদানিং বউয়ের মত সেও মানুষের সঙ্গে কথা বলা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। মেয়েদের নিয়ে কেউ সহানুভূতি জানাতে এলে ইঁদুরের মত ঢুকে পড়তে চায় স্বরচিত গর্তে। মানুষ দেখলেই একখানা আড়াল খোঁজে। বউটা সেদিক থেকে বেঁচে গিয়েছে বলতে হবে। অমন মর্মান্তিক খবরটা তার মগজ অবধি এখনও পৌঁছয় নি। ভগবান সেদিক থেকে করুণাই করেছেন তাকে।

বছর পাঁচেক আগে, যখন সবে পালাগানের দলখানা গড়ছে, তখনই ঝাড়েশ্বরের মেজো মেয়ে রূপমতীকে দলে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল রাজীব। বড় মেয়ে আসাম মুলুকে চলে গিয়েছিল তার আগে। তো, রূপমতীকে পালাগানের দলে পাঠাতে রাজী হয়নি ঝাড়েশ্বর কোটাল। কারণ রঙলালের কাছ থেকে রূপমতীর বাবদ কিস্তিতে কিস্তিতে অনেক টাকাই দাদন নিয়েছিল সে। একদিন শেষরাতে রূপমতীকে শিকর‍্যা পাখির মত ছোঁ মেরে উড়ে গিয়েছিল রঙলাল। রাজীব ঠেকাতে পারেনি। তখন থেকেই সে জানত, রঙীর বাবদ আগাম দাদন করে রাখবে রঙলাল। কারণ রঙলাল সর্বদাই আসলি চিজের ব্যাপারী। মাল চিনতে তার ভুল হয় না।

এখন রঙীর বয়েস বিশ ছুঁই ছুঁই। লাচনহাটির পাত্রটি ভেগে যাবার পর রঙলাল বেশ উঠে পড়ে লেগেছিল রঙীকে তখনই আসাম-মুলুকে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু বুঝিয়ে সুঝিয়ে, অল্প স্বল্প টাকা দিয়ে রাজীবকে বহু কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছিল যাওয়াটা। পালাগানে কখ্খনো রঙীকে না নিয়ে যেত না দল। সর্বদা ভয় ছিল, তাদের সামান্যক্ষণের অনুপস্থিতির সুযোগ নিতে পারে রঙলাল। রঙীকে নিয়ে আচমকা হাওয়া হয়ে যেতে পারে সে। সুচাঁদের ওপর ছিল রঙীকে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখবার ভার। সে দায়িত্ব সুচাঁদ নিষ্ঠার সাথে পালন করে গেছে। তখন অবধি অবশ্যি গজাশিমুলের মানুষ ঘুণাক্ষরেও জানত না সাবিত্রী-রূপমতী বাতাসীদের জীবনের করুণ কাহিনী। রঙলাল আজ বহু যুগ ধরে ওদের সুখের বাখান দিয়ে গেছে বানিয়ে বানিয়ে। ওদের লেখা 'নকল খত' এনে ধরে দিয়েছে। চা-বাগানের ঘসা বিবর্ণ ফটো দেখিয়েও কম বোকা বানায় নি। রংচটা ফটোর মধ্যে আধচেনা আদলের মেয়েকে দেখলেই মনে হত, এই বুঝি মোদ্যার সাবিত্রী-রূপমতী, বাতাসী কিংবা সুফল। সবচেয়ে বড় কথা, রঙলাল সর্বদা কিছু পয়সা গুঁজে দিত এদের হাতে। বলত, তুমাদের লেড়কা-লেড়কীরা পাঠিয়েছে তাদের মাইনা থেকে। অভাবের সংসারে ঐ গুটিকতক টাকাই একেবারে কাত করে ফেলত এদের।

আজকের অবস্থা অবশ্যি স্বতন্ত্র। আজ গজাশিমুলের মানুষের ভুল ভেঙেছে। ভেঙেছে এক সর্বনাশা বুক ভাঙা খবরে। এ এমনই এক খবর, যা চিৎকার করে বলা যায়না আত্মীয়-কুটুমদের। বলা যায় না যে, অভাবের জ্বালায় রঙলালের ফাঁদে পড়ে, কিছু দাদনের বিনিময়ে নিজের ছেলে-মেয়েদের আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি এক ভিনদেশী আড়কাঠির সঙ্গে। সে পিচাশ মেয়াগুলানকে লিয়ে গিয়ে কুন দূরের হাটে বিকে দিয়েছে। ছেইলাগুলাকে পাঠাই দিছে

আসামের জঙ্গলে হাতির সাথে কাঠ বইবার কাজে। মেয়াগুলান এখন কুন আঁধার নর্দমায় পড়ে পড়ে চক্ষের জলে বুকে ভাসাচ্ছে। এসব কাহিনী বলা যায় না অন্যকে। বুকের ব্যথা বুকে চেপেই দিন গুজরান করতে হয়।

সুচাঁদের সঙ্গে একটুখানি প্রাথমিক কথা সেরে নেয় রাজীব। তারপর গল্প জোড়ে ঝাড়েশ্বরের সঙ্গে।

কথা যা বলবার রাজীবই বলছিল। ঝাড়েশ্বর কোটাল কেবল হুঁ-হাঁ করে মাথা নাড়াছিল। অনেক বুড়ো হয়ে গেছে ঝাড়েশ্বর কোটাল। সুচাঁদের মনে হয়, চোখের কোটর যেন আরো অনেক গভীরে ঢুকে গেছে মানুষটার। এক সময় রাজীব বলল, 'শুনেছ তো, এবারে রাজ্যমেলায় নতুন পালাগান যাচ্ছে।'

ঝাড়েশ্বর শুনেছে কিনা কে জানে। কিন্তু আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে থাকে সে।

রাজীব বলে, 'ঐ পালটার জন্য তোমাদের রঙীটাকে তো আমাদের চাই।'

ঝাড়েশ্বর অল্প চমক খায় রাজীবের কথায়। দু'চোখে চাপা উৎকণ্ঠা। বলে, 'উয়ার ব্যারাম ধরেছে আইজ্ঞা। আজ দু'তিন মাস। ঘরের বাহার হতে পারে না।'

'ওটা ঠিক নয়।' রাজীব আর ভনিতাটাকে বাড়তে দিতে চায় না, 'ওকে তুমি রঙলালের সঙ্গে আসামে পাঠানোর ফন্দি এঁটেছ। সেই বাবদ দাদনও নিয়েছ রঙলালের কাছে। বল, ঠিক কিনা? একদম মিছে বলবে না আমায়।'

রাজীবের গলায় বুঝি কিছু ছিল। ঝাড়েশ্বর কোটাল পয়লা চটকায় একদম ভেঙে পড়ল। মাথা নীচু করে বসে রইল সে।

'কবে যাচ্ছে ও?' রাজীব শুধোয়।

'আঁইছে শুক্কুর বার।'

'কথাবার্তা একদম পাকা?'

ধীরে ধীরে মাথা দোলায় ঝাড়েশ্বর।

সুচাঁদ ধীরে ধীরে মুষড়ে পড়ছিল। সে বার বার দৃষ্টিখানা চারাচ্ছিল কপাটের কাছাকাছি। এলোপাথাড়ি খুঁজছিল কাউকে। রাজীবের দৃষ্টি এড়ায়নি সেটা। ওর কপালের শিরা টান টান হয়ে ওঠে।

ঝাঁঝালো গলায় বলে, 'এরপরও তোমরা ঘরের মেয়েকে অমন আতান্তরে পাঠাবে? আশ্চর্য। এর চেয়ে তো নিজের হাতে খুন করে ফেলতে পার। সারাজীবন বাঁচার নামে এমন দগ্ধে মরবার চেয়ে বরং সেটাই ভাল শতগুণে।'

সে কথার জবাব দেয় না ঝাড়েশ্বর কোটাল। তাকে কেমন অবসন্ন দেখাচ্ছিল। তার হাত-পা যেন এক অদৃশ্য রশিতে টেঁসে বাঁধা। তার যেন নড়বার চড়বার জো নেই। আসলে, রঙলালকে মনে মনে ভারি ভয় করে সে। ঠিক রঙলালকে নয়, তার ঐ লাল খাতাটাকে ভয়। ঐ লাল খাতাটার মধ্যে রয়েছে এক রহস্যময় ভয়াল জগৎ। সেখানে কালো রঙের অজস্র সাপের বাস। রঙলাল খাতা খুলে একটিবার মেলে ধরলেই তারা লক্ষ ফণা তুলে দাঁড়ায়। ঝাড়েশ্বরের দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ লাল খাতার অসংখ্য আঁকি-বুকির জোরে রঙলাল যখন যা খুশী তাই করতে পারে। থানা-পুলিশ, আপিস-কাচারীও ওর হাতের মুঠোয়। রঙলালের হাতের সামান্য ইশারায় এ গাঁয়ের যে কোনও মানুষ যে কোনও মুহূর্তে চলে যেতে পারে

ফাটকের আড়ালে । সেদিন সারা গাঁয়ের ব্যাপার ছিল বলে এতটা পথ ভেঙে এসেও খালি হাতে ফিরে গেছেন বড়বাবু । কিন্তু একা ঝাড়েশ্বর কোটালকে ঝাড়শুদ্ধ নিকেশ করতে রঙলালের দু'দণ্ডের মামলা ।

এসব কথা বুঝি সব ঠিকঠাক গুছিয়ে বলা যায় না মাস্টারকে । ঝাড়েশ্বর কোটালও ব্যাপারটা পুরোপুরি বোঝে না । কিন্তু তার এই তিনকুড়ি বচ্ছর উম্বরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে সে এটুকু বুঝেছে যে, তাদের বন্ধনটা বড় শক্তপোক্ত । তাদের অসহায়তাও অনেক গভীরে। রঙলালের গোঁসা হলে কেমন করে যেন তা চারিয়ে যায় চারপাশের গাঁয়ের বাবুদের মনে। থানার বড়বাবু, উপেন চৌকিদার, পুণ্যাপানির অঘোর রায় , পচাপানির সিংহবাবু, ছ্যাঁদাপাথরের সন্তোষ তুঙ্গ কিংবা জগৎ তশিলদারের মনেও । গোঁসা হয় তাবত আপিস-কাচারীর, বনের বীটবাবুর, সবাইকে ঝাড়েশ্বর চেনে না, কিন্তু ঝাড়েশ্বর যেন উপলব্ধি করেছে, এদের যে কোনও একজনের রোষে পড়লে এদের সবাইয়ের চোখ দিয়ে নীরবে আগুন ঠিকরাতে থাকে । এ এক রহস্য !

ঝাড়েশ্বর কোটাল দেখেছে, রঙলালের, অঘোর খানের, চৌকিদার উপেন সিং-এর, তশিলদার জগৎ কুচলানের কিংবা থানার বড়বাবু, বনের বীটবাবু এদের নিজেদের মধ্যে নানা বৈষয়িক বিষয়ে ঝগড়া রয়েছে বহুকাল ধরে । এমনিতে নানা মামলা-মোকদ্দমায় নিয়ত মত্ত ওরা । কিন্তু গজাশিমুলের বসু-শবরদের ব্যাপারে সবাই এককাট্টা । সত্যি ! এ এক আজব সুতো । চোখে দেখা যায় না এমনই সূক্ষ্ম । কিন্তু মোটা রশির চেয়েও তার বাঁধন কায়েমী।

'শোন ।' রাজীব স্পষ্ট গলায় বলে, 'রত্তীর আসামে যাওয়া বন্ধ করতে হবে ।'

ঝাড়েশ্বর কোটাল যেন হুঁশে ফিরে আসে । একটুক্ষণ কী যেন ভাবে । বলে, 'সিট্যা কি কইরে হব্যেক্ মাস্টার ? রঙলাল তো নাই ছাড়বেক্ ।'

'ক্যানে ? ছাড়বেক নাই ক্যানে ?' সুচাঁদ পাশ থেকে বলে ওঠে, 'তুমার মেয়াকে তুমি না পাঠালে কার কি বলবার আছে ?'

'তুই বি যে মাস্টারের পারা অবুঝ হলিরে সুচাঁদ ।' ঝাড়েশ্বর কোটাল অধৈর্য হয়ে ওঠে, 'মেয়াটা কি আর মোর আছে রে ? যেদিন থিক্যে দাদন লিয়েছি, লাল খাতায় তুলেছি উয়ার নাম, সেদিন থিক্যে উ আর মোর লয় হে ।'

'সে সব আমরা বুঝব।' রাজীব চোয়াল শক্ত করে বলে, 'রঙলালের সঙ্গে বোঝাপড়া করব আমরা । তুমি শুধু মতটা দাও।'

আকাশের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে ঝাড়েশ্বর । বিড় বিড় করে বলে, 'সে হয়না মাস্টার। রত্তীর নামে অনেক টাকা লিয়েছি রঙলালের থিক্যে । এই সেদিনও দিয়েছে এক কাঁড়ি টাকা। এখন রত্তীকে না পাঠাল্যে উ কি ফের ছাড়ে !'

প্রায় হাল ছেড়ে দেয় রাজীব । সুচাঁদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কি করি বল্ ? তোরা যে অনেক শেকলে বাঁধা ! অনেক যুগ ধরে । এবং তার অনেকখানিই যে স্বেচ্ছাবন্ধন । নইলে রঙলালকে একবার দেখবার সাধ ছিল আমার ।'

অকস্মাৎ অন্ধকার উঠোনে ছায়া পড়ল কার । রাজীব শুধোয়, 'কে ?'

ছায়া মূর্তিখানি এসে দাওয়ার পাশ ঘেঁসে দাঁড়ায় । রঙলাল।

রঙলালের বেতাল নাচ

রঙলালকে দেখে চমকে উঠল রাজীব ।

'নমস্তে মাস্টারজি ।' রঙলাল বিনয়ে গদগদ হয়ে হাসে, 'কি নসিব হামার । আপনার মত আদমীর দর্শন পেলাম ।'

রাজীবের মুখের সবগুলো পেশী কঠিন হয়ে উঠেছে ততক্ষণে । রঙলালকে দেখে ব্যস্ত হয়ে ওঠে ঝাড়েশ্বর । কোথায় যে বসাবে, কী যে করবে, ভেবে পাচ্ছে না যেন ।

একখানা চাটাই টেনে নিয়ে অল্প তফাতে বসে রঙলাল । বলে, 'কি রে ঝাড়েশ্বর । রঙীর তবিয়ত আচ্ছা তো ?'

ঝাড়েশ্বর কোটালের যেন সাপের ছুঁচো-গেলা অবস্থা । চুপটি করে বসে থাকে সে ।

রাজীব ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'জবাবটা আমিই দিচ্ছি রঙলাল । রঙীর শরীর ভালই আছে, এবং সে তোমার সঙ্গে যাচ্ছে না ।'

রঙলাল স্থির দৃষ্টিখানি থাপনা করে রাজীবের চোখে । লুকোচুরির প্রয়োজনই বোধ করে না সে । রাজীবের কথায় তীব্র ব্যঙ্গ ঝরে পড়ে তার গলা দিয়ে । চেঁচিয়ে ডাকপাড়ে রঙীকে, 'ওরে ও রঙী— । তোর দিমাগ্ যে ঘন বদলাচ্ছে রে । কাল বললি, যাবি । আজ শুনছি যাবি না, এদিকে তোর তরে পাছাপাড় শাড়ির অর্ডার দিয়ে এলাম যে! তুই হামাকে আর কত কাঁদাবি রে বেটি ?'

'বাজে কথা বন্ধ কর রঙলাল ।' রাজীব তীব্র ধমক দিয়ে ওঠে, 'রঙী যাবে না । এ গাঁয়ের আর একটি মানুষও যাবে না তোমার সঙ্গে । তোমার মানুষ-চালানী ব্যবসা এবার শেষ হবে ।'

'আরে ছোঃ ছোঃ ।' রঙলাল থুক্ করে থুথু ফেলে মাটিতে, 'ইয়ে বুরা পেট যদ্দিন থাকবে, দুনিয়ায় কামের আদমির অভাব হোবে না মাস্টারজি । এ গেরামে নাই মিলবে, তো দুসরা গেরামে মিলে যাবে । ফালতু এ গেরামের আদমি ভুখা মোরবে ।'

'যাতে না মরে সেটা আমরা দেখছি ।' দাঁতে দাঁত চেপে বলে রাজীব ।

'আপনি ?' রঙলাল কালচে দাঁতে হাসে, 'আপনি এ গেরামের সব আদমির পেট ভরাবেন ?'

'হুঁ, ভরাবো ।'

'আলাদিনের চিরাগ-টিরাগ কুছু পেয়েছেন নাকি মাস্টারজি' ? গলা খাটো করে বলে রঙলাল।

রঙলালের কথায় পিত্তি জ্বলে যায় রাজীবের । তাও যথাসম্ভব শান্ত গলায় জবাব দেয়, 'হ্যাঁ পেয়েছি । তুমি এখন হটো দেখি এ গাঁ থেকে ।'

'জরুর হটবো মাস্টারজি ।' খড়কে দিয়ে পরম আয়েসে দাঁত খোটাতে থাকে রঙলাল, 'লেকিন বহুত দাদন দিয়েছি এ গেরামে । সে সব আদায়-উশুল হলে আমি জরুর চলে যাবো ।'

রাজীব ভেতরে ভেতরে একটু দুর্বল বোধ করছিল । সারা গাঁয়ের সমস্ত মানুষের ঋণ ! সে যে অনেক টাকা ! তাও গলা নামিয়ে রাজীব বলে, 'সব টাকা ফেরত পাবে তুমি । একটু সময় লাগবে । কিন্তু রঙীকে তুমি এ যাত্রা নিয়ে যেতে পারবে না ।'

রঙলাল রসিকের মত হাসে । বলে, 'রঙীকে আপনি বড় পেয়ার করেন জানি । লেকিন হামার সাথে ভি ওর পেয়ার কম নয় । ওর সাথে হামার নামে-নামে মিল । উ রঙী আছে, হামি রঙলাল আছি ।' বলতে বলতে মুখচোখ কঠিন হয়ে ওঠে রঙলালের । বলে, 'ছুঁড়ীর বাপটা সেই পাঁচশাল আগে থেকে দাদন লিতে শুরু করেছে । এ যাবত বহুত রুপেয়া ফেলেছি উ শালীর তরে । এই তো সেদিনও দিয়েছি হাজার রুপেয়া । রুপেয়া দরিয়া-কী-পানি না আছে মাস্টারজি । উ শালীকে আসাম লিয়ে যেতে না পারলে বরধন সাহাব হামাকে টিশমিস কোরবে ।'

ঠিক দরজার পাশটিতে বসেছে রাজীব । অন্ধকারে ঘরের ভেতরটা দেখা যায় না । তবুও রাজীব নিশ্চিত জানে, দরজার আড়ালে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে রঙী । ওদের প্রত্যেকটি কথা মনযোগ দিয়ে শুনছে । তার বুকের ওঠানামা, নিঃশ্বাসের শব্দ, ডুরে শাড়ির খসখস আওয়াজ যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে রাজীব ।

রঙলালের ভাষা শুনে লজ্জায় চোখ নাবিয়েছে সুচাঁদ । রাজীব একবার আড়চোখে তাকায় ঝাড়েশ্বরের দিকে । তারপর থমথমে গলায় শুধোয়, 'কত টাকা দিয়েছ তুমি রঙীর বাবদ ?'

'সে বহুত রুপেয়া মাস্টারজি ।'

'ভণিতা কোর না ।' রাজীব আচমকা ধমক দেয় রঙলালকে, 'কত টাকা, ঠিক ঠিক বল ।'

'কিঁউ ?' রঙলালের ভ্রূজোড়া ধনুকের মত বেঁকে যায় । সুর্মাপরা চোখের পাতায় চাপা বিস্ময়, 'আপনি শোধ দিবেন সে-রুপেয়া ?'

'বাজে বকো না রঙলাল,' রাজীবের চোখে মুখে ক্রোধ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে, 'যা জিজ্ঞেস করছি, জবাব দাও ।'

মাথা চুলকে হাসতে থাকে রঙলাল । বলে, 'হিসাব কোরতে হোবে মাস্টারজি । ইয়াদ মে কি সব কুছু থাকে ?'

'হ্যাঁ, হিসেব করেই বল । এখনই ।'

'আপনার মর্জি হলে সেটাই হোবে মাস্টারজি ।' মাথাটা সেলাম করার ভঙ্গিতে অল্প নোয়ায় রঙলাল, 'এক মামুলী লেড়কীর হিস্যা নিয়ে তো আপনার মত খানদানী আদমীর সাথে আমি ঝোগড়া কোরতে পারি না ।'

বলতে বলতে রঙলাল লাল খাতাখানা বের করে ঝুলি থেকে । পাতা উল্টে উল্টে হিসেব করতে বসে বিড় বিড় করে । রাজীবরা পুতুলের মত বসে থাকে ।

খানিকবাদে মুখ তোলে রঙলাল । বলে, 'সুদে আসলে মোট চার হাজার ছ'শো রুপেয়া হোল ।'

চমকে ওঠে ঝাড়েশ্বর কোটাল এবং সুচাঁদ । চার হাজার ছ-শো —টাকা । রঙলাল তামাশা করছে না তো ?

রঙলালের চোখের ওপর চোখ রাখে রাজীব । তারপর পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে গুনতে থাকে ।

ঝাড়েশ্বর কোটাল আর সুচাঁদের চোখে বিস্ময় । সীমাহীন বিস্ময় রঙলালের চোখেও ।

মোট চার হাজার ছ'শো টাকা রঙলালের হাতে ধরিয়ে দেয় রাজীব। বলে, 'এবার একখানা রসিদ লিখে দাও। আর তোমার লাল খাতা থেকে রঙীর নামটা আমাদের সামনে কেটে দাও।'

রঙলাল যেন খাতা বন্ধ করতেও ভুলে গেছে। এক গভীর বিস্ময় ও সীমাহীন হতাশায় যেন তিল তিল ডুবে যাচ্ছে। সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে রাজীবের দিকে নিষ্পলক।

শীতের রাত দ্রুত গাঢ় হয়ে আসে। কনকনে হাওয়ায় কাঁপিয়ে দেয় শরীর। কিন্তু রাজীব লক্ষ্য করে, ঝাড়েশ্বরের ঐ বেয়াড়া কাশিখানা যেন কোন্ মন্ত্রবলে সেরে গেছে, বারো আনা, এরই মধ্যে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গেছে সে।

রসিদখানা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় রাজীব। দেখাদেখি পুতুলের মত সুচাঁদও। ধীর পায়ে উঠোনখানি অতিক্রম করে ওরা। পেছনে, লম্ফের আলোয়, ছাই রঙের দেওয়ালে বেতালে নাচতে থাকে রঙলালের ভূতুড়ে ছায়াখানি।

ক্যাথি বার্ডকে কষা-মাংস চাখবার নিমন্ত্রণ

সুচাঁদের মনের মধ্যে তোলপাড় চলছে এখন। এক ধরনের অচেনা আনন্দে ভরে গেছে বুক। আনন্দটাকে ঠিক ধরতে পারছে না। কিন্তু কোন্ উৎসমুখ দিয়ে তা যেন এই মুহূর্তে সমস্ত শরীর উপচে বেরিয়ে পড়তে চায় বাইরে। মনে হয়, কোনও অচেনা পাখি অবিরাম শিস্ দিয়ে চলেছে বুকের কোন্ গহীন প্রদেশে।

সুচাঁদ দুয়োর পেরিয়ে পা' বাড়িয়েছে উঠোনে। রাজীব এগিয়ে গিয়েছে আগড় অবধি। অকস্মাৎ ডানদিকে চোখ পড়তে চমক খেল সুচাঁদ। রঙী। ঢেঁকিশাল থেকে অল্প তফাতে লম্ফখানি বাঁ-হাতে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আলো দেখাবার ভঙ্গিতে। তার চালতাফুলী মুখখানি যেন বর্ষায় স্নান করেছে এই মাত্র। আর ঐ শ্রাবণের জল-টলোমলো মুখখানির মধ্যিখানে একজোড়া দোয়েলের মত চোখ।

হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় সুচাঁদ। পায়ের ছন্দটা যেন এলোমেলো হয়ে যায় সহসা।

'কি রে সুচাঁদ ?' অন্ধকার পথে হাঁটতে হাঁটতে শুধোয় রাজীব, 'তুই খুশী তো ?'

জবাবে সুচাঁদ সহসা রাজীবের হাতখানি শক্ত করে চেপে ধরে।

রাজীব দাঁড়িয়ে পড়ে পথের ওপর।

মৃদু অথচ গাঢ় স্বরে বলে, 'রঙলালের খাতা থেকে উপড়ে এনে রঙীকে তোর হাতে তুলে দিলাম। দেখিস্, যেন বিয়ে করে নোলক পরিয়ে টাঙিয়ে দিস না রান্নাঘরের পেরেকে। এখন অনেক কাজ তোর। এখন অনেক পথ হাঁটতে বাকি।' একটু থামে রাজীব। আত্মস্থ গলায় বলে, 'রঙীর মধ্যে কী যে আছে, সে তোরা বুঝতে পারিস নি এখনও। আমি ওকে চিনেছি। আমার কথামতো চললে একদিন ওর জন্যই সারা দুনিয়া চিনবে তোদের সংঘকে।'

সুচাঁদ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এই মুহূর্তে সারা শরীর জুড়ে যেন ময়ূরের নৃত্য শুরু হয়েছে ওর।

মৃদু গলায় বলে, 'তুমি যেমনটি চালাবে, ত্যামনটি চলবেক মাস্টারদা। তুমার মতই সবাকার মত।'

রাজীব মনে মনে খুশী হয় সুচাঁদের কথায়। রঙীকে নিয়ে যে এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে ওর।

বাইরে সাঁ-সাঁ করছে নিশুত রাত। ধেয়ে আসছে উত্তুরে হাওয়া। শুকনো পাতা উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। টুপটুপ শিশির পড়ছে। অবিরাম ঝরে পড়ছে পাতা। গভীর জঙ্গল থেকে ভেসে আসে নিশাচর প্রাণীর শিকার-প্রাপ্তির উল্লাস কিংবা শিকার ফসকানোর ক্রোধ। রাজীবের ঘুম আসে না কিছুতেই।

অফিস ঘরের গেস্ট-হাউসে বসে সেই রাতেই ক্যাথি বার্ডকে চিঠি লিখল রাজীব। আজকের সন্ধ্যার পুরো ঘটনাটা জানাল, সবিস্তারে। খবরটা পেয়ে ক্যাথি যে কি পরিমাণে খুশী হবে, আগাম অনুমান করতে পারে রাজীব। রাজীব লিখল : এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, সাফল্য যেন চারপাশ থেকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরতে চাইছে আমাকে। খুব শিগ্‌গির 'জলকেলি নাচ' এর রিহার্সেল শুরু করছি। সময় থাকলে একবার এসে চেখে যেও। আমাদের দেশে মাংস কষতে কষতে 'কষামাংস' খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে।

১৭.আর একটি শৃঙ্গ জয় করে রাজীব

ক্যাথি বার্ড-এর চিঠি এসেছে আজ।

লিখেছে : সেদিন 'জলকেলি-নাচ'-এর রিহার্সেল দেখে মুগ্ধ, অভিভূত। ভালুকমুড়া ডুংরীর কোলে, ছোট-খরসতিয়া নদীর পাড়ে, জ্যোৎস্না-ধোওয়া রাতে বুড়ো মহুলগাছের তলায় এক অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ নাচ দেখবার পর, সত্যি বলছি প্রফেসর, আমি কয়েকদিন ঘোরের মধ্যে ছিলাম। এখনও যেন চোখ মুদলে মাদোল-চাঙ আর মলের আওয়াজ শুনতে পাই। দূরের ঝরনার শব্দের সঙ্গে ঐ আওয়াজ মিশে গিয়ে এক অপার্থিব শব্দ তরঙ্গ, — এখনও নিঃসঙ্গ হলে আমার শিরায় শিরায় বয়ে যায়। সত্যি প্রফেসর, তুমি একের পর এক দিগন্ত রচনা করে চলেছ। কী বলে যে অভিনন্দন জানাই তোমায়! কোন্ বাক্যবন্ধ দিয়ে যে প্রকাশ করি কৃতজ্ঞতা!

এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। বসু-শবর-ফোক নিয়ে তোমার বক্তৃতামালা খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অনেকেই তোমার খোঁজ নিচ্ছে। ঠিকানা চাইছে। শিগ্‌গির ওদেশ থেকে আবার নেমন্তন্ন পাবে তুমি। 'ইস্ট-ওয়েস্ট ফোক ফাউণ্ডেশন'-এর বার্ষিক সভায় খুব সম্ভব তোমাকে একটি পেপার পড়তে বলা হবে। এ এক দুর্লভ সম্মান! শুনলেই হিংসে হয়। আরও অনেক অনেক ভালো খবর অপেক্ষা করছে তোমার জন্য। সাক্ষাতে বলব সে সব। শুধু দেখো, জগৎ-জোড়া নাম পেয়ে এই অভাগিনীকে যেন ভুলে যেও না। তোমরা পুরুষরা সব পার, বাবা!

জনসন নিরাপদেই পৌঁছেছে। 'দ্য ফোক' পত্রিকার জন্য পাঠানো তোমার প্রবন্ধ, রঙী আর সুচাঁদের সাক্ষাৎকার এবং ফোটোগ্রাফগুলো ঠিক ঠিক পেয়েছি। যথাসময়েই ছাপা হবে।

'মল্লভূম ফোক-রিসার্চ সেন্টারে'র কাজকর্ম আশা করি ভালই চলছে। তোমার ওপর

আমার অগাধ আস্থা। 'গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘ'-এর লোক হলেও, 'মল্লভূম ফোক সেন্টার'-এর প্রতি তুমি বিমাতৃসুলভ আচরণ করবে না, এ বিশ্বাসও আমার আছে। আসলে, দুটোই তো তোমার হাতেরই রচনা। সঙ্গোপনে বলি, আমার গোপন ইচ্ছে, দুটো সংস্থা কালক্রমে মিলেমিশে এক হয়ে যাক, এবং তুমিই হও তার কর্ণধার। ফোক-সার্ভের কাজটা শুরু হয়েছে কি ? শুরু হলে কদ্দুর এগিয়েছে ? দরকার মনে করলে, তুমি দু'চার জন বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ করতে পার। এলাকার শিক্ষিত যুবকদেরও এ কাজে লাগাতে পার। এসব কাজে টাকার কোন অভাব হবে না, তাতো তুমি জানই। আমরা চাই, এ বছরের শেষ নাগাদ প্রাথমিক পর্যায়ে সার্ভের কাজটা শেষ হয়ে যাক। আদিবাসীদের জন্য আবাসিক স্কুলটা চালু হয়ে যাক। আর, হাতে নাতে মহিলাদের কাজ শেখাবার জন্য ওয়ার্ক-শেড় তৈরীর কাজটাও শুরু হয়ে যাক। বাকি প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করা যাবে প্রাথমিক সার্ভে-রিপোর্টটা পাওয়ার পর। হ্যাঁ, ভালো কথা, কিছু গারমেন্টস্' আর বেবিফুড় যাচ্ছে তোমার কাছে।'সেভ দ্য মিলিয়নস্' নামে একটি সংস্থা থেকে হেন্‌সবার্গ ওগুলো নিয়ে যাবেন তোমার কাছে। জিনিসগুলো গরীব আদিবাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দিও। কিন্তু দোহাই, এর জন্য আবার ভি. আই. পি.-দের ডেকে এনে একটা জমকালো সভা-টভা বাধিয়ে বসো না যেন। তোমাদের দেশে তো আবার ওটির খুব চল রয়েছে! আচ্ছা একটা কথা, 'জলকেলি' নাচের একটা 'ভিডিও রেকর্ডিং' করা যায় না ? দারুণ হয় ব্যাপারটা। কন্টিনেন্টে একেবারে হৈ চৈ পড়ে যাবে, এ ব্যাপারে আমি সিয়োর। যদি তোমার মত থাকে, তবে জনসনকে ফের পাঠাব যন্ত্রপাতিসহ। ভিডিও পিকচারের সঙ্গে কমেন্ট্রি'টা কিন্তু তোমার গলায় হওয়া চাই। এ ব্যাপারে খুব জলদি জবাব চাই।

আশা করছি আর মাস কয়েক বাদে রাজ্য ও জাতীয় মেলায় 'জলকেলি নাচ'-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখতে পাব। তার আগে একটা প্রতিজ্ঞা তোমাকে দিয়ে আগাম করিয়ে রাখতে চাই। জাতীয় মেলা থেকে ফিরে এলে 'জলকেলি নাচ'-এর প্রথম পাবলিক শো' ইস্ট-ওয়েস্ট ফোক ফাউণ্ডেশন-এর পক্ষে স্পনসর করবে ফাউণ্ডেশনের কোলকাতা শাখা। তার আগে ঐ পালাগান আর কোথাও দেখানো চলবে না। শো'এর সমস্ত ব্যবস্থাদি করবে আমাদের কোলকাতা শাখা। খরচ-খরচাও পুরোপুরি আমরাই বহন কবব। আশা করি, প্রতিজ্ঞা কোনও প্রলোভনেই ভাঙবে না তুমি। আমি আমাদের কোলকাতা শাখাকে এ ব্যাপারে প্রায় কথা দিয়েই ফেলেছি। আমার কথার খেলাপ হোক, এটা তুমি নিশ্চয়ই চাইবে না। গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘের জন্য আমার অতীতের যাবতীয় ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে এটুকু প্রিভিলেজ আমি আশা করতেই পারি, কি বল ? আমি এত করে বলে রাখছি কেন জান ? জাতীয় মেলায় 'জলকেলি-নাচ' দেখবার পর সারা দেশজুড়ে তুমুল আলোড়ন উঠবেই। তখন এ দেশের কত ভি.আই.-পি. মানুষজন তোমাকে ছেঁকে ধরবে শো' করবার জন্য। তখন কি আর 'কোথাকার কে' ক্যাথি বার্ড কল্কে পাবে ?

শেষ করবার আগে অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল। যে কোনদিন চলে যেতে পারি বাঁকুড়ায়, এবং সম্ভব হলে গজাশিমুলে। কাজগুলো সব ঠিকঠিক চালিয়ে যেও।

তোমার 'ভিলেন'-এর খবর কি ? রত্তীর মত শাঁসাল শিকারটি হাতছাড়া হওয়ার পর সে শোকে-দুঃখে আত্মহত্যা-টত্যা করে ফেলে নি তো ?

চিঠি থেকে মুখ তুলে ফিক্ করে হেসে ফেলে রাজীব। মেয়েটা একটু খ্যাপাটে আছে।

যত না পরিশ্রমী, তার চেয়ে ঢের বেশি খামখেয়ালী । ঝড়ের মত আসে, দু'চারদিন থাকে, খানা-পিনা, হৈ-হুল্লোড় করে, চরকির মত পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, একদিন ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে যায় । এর মধ্যেও কাজের কথাগুলো ঠিক ঠিক সেরে নিতে ভোলে না কদাপি।

হবেই তো । হ্যাফ অব্ ইণ্ডিয়ার কালচারাল মিশনকে নেতৃত্ব দিচ্ছে যে মেয়ে, সে তো কোনমতেই সাধারণ নয় । বরং তার বুদ্ধি-বিবেচনার বহর দেখে মাঝে মাঝে থ' হয়ে যায় রাজীব ।

এই তো, কোজাগরী পূর্ণিমার সময় এসে যখন ছিল দিন-কয়েক ভালুকমুড়ার চূড়োয়, একদিন পথ হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'ছ্যাঁদাপাথর থেকে গজাশিমুল অবধি রাস্তাটার যা হাল হয়েছে, সারিয়ে না নিলেই নয় ।'

'এই তো কিছুদিন আগে সারানো হল ।'

'কোথায় ?' ক্যাথি বার্ড যেন আকাশ থেকে পড়ে, 'ঐ খরার সময় তো ? তুমি যখন বিদেশে ছিলে । হেড-অফিস থেকে টাকা-পয়সা ম্যানেজ করে সামান্য রিপেয়ারিং আর ড্রেসিং করিয়েছিলুম । মাত্র হাজার বিশেক টাকা, ওতে আর কিই-বা হয় ! আসলে, তখন কাজটা তো মুখ্য ছিল না, গজাশিমুলের মানুষগুলোকেঐ দুর্দিনে প্রোভাইড করবার জন্যই —।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?' ক্যাথি বার্ডকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে রাজীব বলেছিল, 'টাকাটা বিদেশ থেকে আমি পাঠিয়েছি, এমন কথাটা রটালে কেন ?'

'নাথিং মিস্ট্রি' ক্যাথি বার্ডের ঠোঁটের ডগায় সূক্ষ্ম হাসির তরঙ্গ খেলে যায়, 'এই এলাকায় কাজ করবে তুমি । আমরা তো উড়ন্ত পাখি । এদের মধ্যে তোমার ইমেজটাই বাড়ানো দরকার ।'

ক্যাথির কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে যায় রাজীব । ভেতরে ভেতরে কতখানি ভেবে নেয় ঐটুকু মেয়ে । কত হিসেব করে পা ফেলে প্রতিটি মুহূর্তে ।

ক্যাথি বার্ড ততক্ষণে ফিরে গেছে পুরোনো প্রসঙ্গে, 'রাস্তাটা এবার ভালো করে মেরামত করা দরকার । মল্লভূম ফো-রি সেন্টারের জন্য একখানা জীপ কিনব ভাবছি । ইন্ ফ্যাক্ট, যাতায়াতের সমস্যাটা না ঘুচলে এ এলাকায় কাজ করাই মুশকিল হবে । যাগ গে, সে আমি দেখছি । অনেক সংস্থাই কাজ করছে এখানে-ওখানে । কাউকে ধরে-পাকড়ে ঠিক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে । টাকার জন্য তুমি ভেবো না । শুধু একটাই অনুরোধ — ।' এক অপরূপ চটুল ভঙ্গি করে ক্যাথি বার্ড, 'চিরদিন এমনি ভাবে আমার পাশে পাশে থেকো ।' বলেই হেসে গড়িয়ে পড়ে বাচ্চা মেয়ের মত ।

সেদিনের কথা ভাবতে ভাবতে রাজীব নিজের অজান্তেই ঐ হাসিখানির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে । হাসতে পারে বটে মেয়েটা, বাব্বা! কিন্তু ও তো এখনও জানে না, রাজীব ইতিমধ্যে আর একটি চাঁদের নাগাল পেয়ে গেছে । সুখী, ঝাড়েশ্বর কোটালের ছোট মেয়ে, ভর্তি হয়েছে দলে । রঙীই টেনে এনেছে ওকে । এখন মাত্তর বার-তের বছর বয়েস, কিন্তু রাজীবের অভিজ্ঞ চোখ নিশ্চিতভাবেই জানে, সুখী আগামী দিনে অনেক শৃঙ্গ অতিক্রম করবে । উঠন্তি গাছের পত্তনেই মালুম । আপাতত নাচের তালিম নিচ্ছে সে রঙীর কাছে, গলা সাধছে বদন কোটালের তত্ত্বাবধানে । যদি দ্রুত উন্নতি করতে পারে, তবে রাজ্যমেলায় 'জলকেলি-নাচ'-এ ওকে পেছনের সারিতে নাচিয়ে দেবে রাজীব।

খবরটা শুনে যে কি পরিমাণ উল্লসিত হবে ক্যাথি বার্ড, কত উচ্ছ্বাসেই না হেসে উঠবে বার বার, ভাবতে ভাবতে রাজীব আগাম আক্রান্ত হয় ক্যাথি বার্ডের ঐ হাসিতে ।

গজাশিমুলে গণ-অভ্যুত্থান : রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

বাঁকুড়ায়, 'মল্লভূম ফো-রি সেন্টারে'র অফিসে বসে ডাকে আসা চিঠিগুলো দেখছিল রাজীব। তখন সকাল ন'টা ।

রোজ অনেক চিঠি আসে আজকাল । আসে অসংখ্য পত্র-পত্রিকা, দেশ-বিদেশের নামী-দামী পত্রিকা সব । 'গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘ'র খবর বেরোয় ওগুলোয়, ছাপা হয় রাজীবদের লেখা প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, ছবি ...। কাঁচি দিয়ে খামগুলোকে পরিপাটি করে কাটছিল রাজীব। চিঠিগুলো বের করে একে একে পড়ছিল । অভিনন্দন, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, পরামর্শ, শো' করবার অনুরোধ, সবই থাকে চিঠিগুলোতে । রাজীব সাধ্যমত জবাব দেয়, ব্যবস্থা নেয় ... যেগুলো পারে না, পড়ে থাকে । একজন সহকারীগোছের এবার চাই-ই । সুনীলই ছিল যোগ্য ব্যক্তি । তাকে তো বারকয় বলেছে রাজীব, কোনও উচ্চ-বাচ্যই করছে না । একটু কেমন খ্যাপাটে আচার-আচরণ ইদানিং । গজাশিমুল আসা-যাওয়ার পথে মাঝে মাঝে রানীবাঁধে সুনীলদের বাড়িতে রাত্রিবাস করে রাজীব । খুবই আদর-যত্ন করে সুনীল, সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কোন ক্ষেত্রে, কিন্তু ফোক্ নিয়ে বড় একটা আলোচনা করতে চায় না । অল্পক্ষণ বাদেই কেমন যেন গুটিয়ে নেয় নিজেকে । কী যে করছে সে, করতে চায়, সারা জেলাব্যাপী চরকির মত ঘুরে ঘুরে কী খুঁজছে, কী পেয়েছে, কোনও কিছুই বলতে চায় না । শুধু এক মুখ ম্লান হাসি ছড়িয়ে বলে ওঠে, আমার কথা বাদ দিন স্যার, আমি নিজের খেয়ালেই ঘুরে বেড়াই। ঘুরে ঘুরে দেখি, দেখে বেড়ানোতেই আমার আনন্দ । ছুঁয়ে দেখতে আমার সঙ্কোচ হয় । আর নাড়াচাড়া করতো তো রীতিমত ভয় পাই । কথাগুলো সুনীল বলে বটে, কিন্তু রাজীবের তা বিশ্বাস হয় না মোটেই । শুধু শুধু ঘুরে বেড়ানোর ছেলে নয় সে । ফোকের ব্যাপারে ও যে কতখানি সিরিয়াস তা রাজীবের চেয়ে বেশি কে জানে ! একদিন এমন ছিল, ফোক নিয়ে কথা-বার্তায়, আলোচনায়, তর্কে-বিতর্কে ওদের দু'জনের দিন-রাত এক হয়ে যেত । তখনই, রাজীবের মনে পড়ে, ফোক সম্পর্কে কিছু মৌলিক কথা উচ্চারণ করেছিল সুনীল। তখন ঐ কথাগুলোর গুরুত্ব পুরোপুরি বোঝেনি রাজীব, এখন বোঝে। কিন্তু এখন তো সুনীল, তর্ক করা তো দূরের কথা, ফোক নিয়ে কথাই বলতে চায় না । এ নিয়ে অনুযোগ করলে দু'চোখ কপালে তুলে বলে, ফোক নিয়ে কথা বলব আমি ? আপনার সামনে ? লোকে পাগল বলবে যে । ফোক-এ আপনার এখন বিশ্বজোড়া নাম ! চিরকালই খুব বিনয়ী ছেলে সুনীল, খুব মধুভাষী, তবুও রাজীবের কেমন যেন খটকা লাগে । সুনীল কি হিংসে করছে রাজীবকে, ওর এত অল্পদিনে অতখানি খ্যাতি দেখে কি ঈর্ষার উদ্রেক হয়েছে ওর মনে ! ও কি অন্তরে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করছে ইদানিং ! বুঝে উঠতে পারে না রাজীব । অথচ এই বিশাল ক্রিয়াকাণ্ডে সুনীলের মত একটা ছেলেকে পাশে পেলে কি ভালই না হত ! রাজীব হাল ছাড়ে নি, সুনীলকে বুঝিয়ে চলেছে সমানে । আর, এমন একটা সংস্থার মধ্যে ঢুকতে পারলে আখেরে লাভই হবে সুনীলের ।

চিঠিগুলো পড়া শেষ হলে রাজীব কাগজ কলম নিয়ে তৈরী হল । কিছু চিঠিপত্তর

লেখা দরকার। কিছু জরুরী চিঠির জবাব দিন-কয়েক আগেই দেওয়া উচিত ছিল। আসলে, দিনের পর দিন, একটু একটু করে চাপ বাড়ছে রাজীবের পর। দিন-রাত কাজ করেও সময় পাচ্ছে না। 'গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘ'র কাজকর্ম এখন অনেকখানি সুচাঁদই চালায়। তাকে সাহায্য করে বদন কোটাল আর কান্‌চা মল্লিক। ওদের একটু একটু লেখাপড়া শিখিয়ে নেওয়া গেছে। কিন্তু সুচাঁদরা কি আর সবটুকু পারে ? পালা, শো, পার্টির সঙ্গে চুক্তি, লেন-দেন, রাজ্য এবং জাতীয় মেলার ব্যবস্থাপনা এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে সব মহলে যোগযোগ রক্ষা, এসব তো রাজীবকেই দেখতে হয়। ইদানিং লোকসংস্কৃতির ওপর প্রচুর লেখালেখি করতে হচ্ছে। দেশ-বিদেশের ম্যাগাজিনগুলো হরদম চিঠি লিখছে লেখা পাঠাবার জন্য। দিনের মধ্যে অনেকখানি সময় ব্যয় হয় ওদের চাহিদা মেটাতে। ফোক সেণ্টারের কাজকর্ম তো দিন দিন বাড়ছেই। মিস্ বার্ড মাঝে মাঝে ঝড়ের মত আসছে, এক একটা নতুন প্ল্যান গিলিয়ে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে। হেড অফিস থেকে ঘন ঘন মেসেজ পাঠাচ্ছে, গো অ্যাহেড়, হারি আপ। সবকিছু ঝক্কি সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে রাজীব। 'ব্লু-বার্ড' থেকে বসু-শবর কালচারের ওপর বইখানা বেরোবার পর খুব হৈ-চৈ পড়েছে। মিঃ খাণ্ডেলওয়াল চিঠি লিখেছেন। রাজীবের আর একখানা বই তিনি ছাপতে চান। 'জলকেলি-নাচ'—তার সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের ওপর একখানা বই লেখার ইচ্ছে রাজীবের। কিন্তু এখন নয়, জাতীয় মেলার পর এ ব্যাপারে চূড়ান্ত চুক্তি করবে সে। রাজীব চিঠি লেখায় মন দেয়।

তখন আন্দাজ ন'টা, চিঠি লেখা আধাআধি মত হয়েছে, এমনি সময়ে ঝড়ের মত ঘরে ঢোকে কান্‌চা মল্লিক। বেজায় হাঁফাচ্ছে সে।

রাজীবের হাত আপ্‌সেই থেমে যায়।

'সর্বনাশ হয়েছে মাস্টারদা।'

'কী হল ?'

'রঙলাল পুলুশ লিয়ে যাচ্ছে গজাশিমুলে।'

'কেন ?' ভুরুজোড়া কুঁচকে ওঠে রাজীবের।

'তুমরা রঙীকে উয়ার সাথে যেইত্যে দাও নাই। অন্যদেরও যেইত্যে দিবে নাই বইল্‌ছ,— ।'

'ওরা এখন কোথায় ?'

'উয়ারা এতক্ষণে রওনা দিয়ে দিল্যাক রানীবাঁধ থানা থিক্যে। ছ্যাঁদাপাথরের সন্তোষ তুঙ-এর দোরে খাবেক দুফোরে। উয়ার পর রওনা দিবেক গজাশিমুল।'

প্রায় হতভম্ব হয়ে গেছে রাজীব, 'তুই এত কথা জানলি কেমন করে ?'

'সকাল ব্যালায় আমি ছিল্যাম রানীবাঁধ বাজারে। আচমকা সুনীলদা এস্যে ধরল্যাক। উই দিল্যাক সব খবর। বলল্যাক, জলদি মাস্টারদা'কে খবর দে, উয়ারা একটা হেস্তনেস্ত করবেক আইজ।'

'সুনীল জানল কী করে ?'

'সুনীলদা বহুত কিছো খবর রাখে। থানার সাথও ভাবসাব আছে উয়ার।'

রাজীবের চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ গাঢ় হচ্ছিল। ভাবনায় ডুবে যায় সে। খানিক বাদে শুধোয়, 'সুচাঁদ আছে তো গাঁয়ে ? অন্যরা সব ?'

'সুচাঁদ আছে । অন্যদের কথা ঠিক ঠিক বইল্‌তো্য লারল্যাম্‌ । আমি ত কাল দুফোর থিকে রানীবাঁধ বাজারে । উখ্যেন থিক্যেই·বাসে চড়ে সটান আঁইছি আপনার পাশ ।'

বড় অস্থির লাগছিল কান্‌চা মল্লিককে ।

উঠে দাঁড়াল রাজীব । চৌকিদারকে অফিস ঘরটা বন্ধ করতে বলে মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিল সে । কান্‌চা মল্লিককে পেছনে নিয়ে লাল রঙের বুলেটখানা ঝড়ের বেগে ছুটে চলল গজাশিমুলের দিকে ।

লোকো তো আর লোকোমেটিভ নয় যে ধোঁয়া ছেড়ে, গর্জন তুলে ...

রাস্তাটা বেজায় খারাপ । মোটর সাইকেল চালিয়ে যাবার মোটেই উপযুক্ত নয় । তাও যতটা সম্ভব দ্রুতবেগে ছুটছে রাজীবর বুলেট । ঘড়িতে এখন একটা ।

গেল মাসে দিল্লিতে একটা সেমিনার ছিল । ক্যাথি বার্ড-এর সঙ্গে দেখা হল ওখানে।

ক্যাথি বার্ড ওকে দেখেই বলল, 'তোমাদের ছ্যাঁদাপাথর থেকে গজাশিমুল রাস্তাটা সারানোর কথা বলেছিলাম না ? টাকাটা পাওয়া গেছে। অবশেষে 'সেভ্‌ দ্য মিলিয়নস্‌'ই টাকাটা দিতে রাজি হয়েছে । তুমি ফিরে গিয়েই স্কীম বানিয়ে পাঠিয়ে দিও ওদের ঠিকানায় । টাকাটা সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে যাবে । ওদের ঠিকানা তো তুমি জানই । মিঃ হেনস্‌বার্গ তো দিয়ে এসেছেন তোমায় । তুমি ওদের কাজকর্ম নিয়ে একটা রাইট-আপও লিখেছ 'কালচার' পত্রিকায় । রাইট ? হুঁ-হুঁ, বাব্বা ! সব খবরই রাখি । আসলে,— আসলে,— তুমি তো বিশ্বেস কর না, কিন্তু আমি যেখানেই যাই, যত দূরেই, তোমার চাঁদমুখটিকে কখনোই আড়াল করিনে ।' বলেই মিস্‌ বার্ড খিলখিলিয়ে হেসে উঠল, 'যাগ্‌গে, একটুখানি দেখো, রাস্তাটা যাতে জলদি মেরামত হয়ে যায় ।'

হাজার কাজে সময় পাচ্ছে না রাজীব । আজকেই স্কীমটা নিয়ে বসবার ইচ্ছে ছিল তার। পি. ডব্লু. ডি-র অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মিঃ তালুকদারের আজ আসবার কথা ছিল বিকেল চারটেয় । এসে হয়তো ফিরে যাবে । তাতে অবশ্য ক্ষতি নেই । খবর দিলে সুদর্শন তালুকদার কালই আবার এসে যাবে । রাজীব চৌধুরীর কথায় এখন স্থানীয় প্রশাসন যে মোটামুটি একপায়ে খাড়া সেটা রাজীব বিলক্ষণ বোঝে ।

মনে পড়ে, সুদর্শন তালুকদারের কথা, 'দরকার হলে খবর পাঠাবেন মিঃ চৌধুরী । গজাশিমুল গাঁয়ের রাস্তা বলে কথা ! বলা যায় না, কবে হয়তো ঐ গাঁয়ে আপনি প্রাইম মিনিস্টারকে এনে হাজির করবেন । তখন রাস্তা খারাপ দেখলে, আমার চাকরিটি সঙ্গে সঙ্গে গন্‌ ।'

আগামী কাল অবশ্যই একটা ফোন করতে হবে তালুকদারকে ।

দূর থেকে সংস্কৃতি সংঘের বাড়িখানা দেখা যাচ্ছিল । উঁচালী-নীচালী রাস্তার ওপর দিয়ে অতি সাবধানে এগোচ্ছিল রাজীব । মাঝে মাঝে উত্তেজিত গিয়ারের আওয়াজ নির্জন বনভূমিকে চমকে দিচ্ছিল বারবার ।

খালের গাবা থেকে ওপরে উঠতেই গজাশিমুল গাঁ'খানা পরিপূর্ণভাবে ধরা দিল রাজীবের চোখে । কিনাবনী পুকুরটা পেরোলেই বিশাল মাকড়া পাথরের ডাঙা । তার একধার ঘেঁসে সংঘের অফিস ঘর । লালটালিতে ছাওয়া গেস্ট হাউস । খানিক তফাতে মূল গাঁ শুরু ।

গাঁয়ের পেছনে সারবন্দী ডুংরীর চূড়ো থেকে একের পর এক ঘন সবুজ জঙ্গলের চাদর ঝোলানো ।

ছবিটা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। পুরো ছবিখানা দেখেই চমকে উঠলো রাজীব । মাকড়া পাথরের খাঁ খাঁ উদোম ডাঙায় কে যেন বসিয়ে দিয়েছে অসংখ্য কালো কালো ফুটকি ।

গজাশিমুলের ডাঙায় অনেক মানুষ জমেছে । কিন্তু পুলিশ কই ? একজনকেও তো দেখা যাচ্ছে না । প্রবল দ্বন্দ্বে দুলতে দুলতে রাজীব অ্যাক্সিলেটরে চাপ দেয় ।

কাছে গিয়ে ভুল ভাঙল রাজীবের । পুলিশ রয়েছে । রয়েছে মানুষের বেষ্টনীর ভেতর।

মোটর সাইকেল থেকে নেবে সোজা বেষ্টনীর ভেতর ঢুকে পড়ল রাজীব ।

'এই যে, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম ।' বড়বাবুর চোখমুখ থেকে ঝরে পড়ল তীব্র বিদ্রূপ ।

ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে মাঠের মধ্যিখানে । বড়বাবুর পাশটিতে রঙলাল । চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে গজাশিমুলের তাবত মানুষ । মেয়ে-মবদ, বাচ্চা-বুড়ো । রাজীব তাজ্জব বনে যায় । অত সাহস হঠাৎ কোত্থেকে পেল গজাশিমুলের মানুষ ? এই তো সেদিনও খাঁকি দেখলেই জঙ্গলে সেঁধাত ।

বড়বাবুর ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুচাঁদ । রাজীবকে দেখেই পুরো ঘটনাটা সংক্ষেপে বলল সে । 'পুলিশের নাম শুনে সবাই জঙ্গলে সেঁধিয়েছিল । আমি বলি, কিসের তরে সেঁধাবি রে জঙ্গলে ? খুন করেছু ? ডাকাতি করেছু ? জঙ্গল থিক্যে সবাইকে বাইরে এন্যে খাড়া করেছি বড়বাবুর সুমুখে । বলেছি, করুণ আইজ্ঞা, কী করত্যে চান্ ।'

রাজীব মন দিয়ে শুনছিল কথাগুলো । বলল, 'তো, কী বলছেন বড়বাবু ?'

'উনি গাঁয়ের বাছা বাছা জনাকয়েককে গিরেফতার করত্যে চান । ঝাড়েশ্বর মামুকে, বাবাকে, আমাকে, রঘুনাথকে, কান্চা মল্লিক আর বদন কোটালকে ।'

'কেন ?'

'বলছেন, আমরাই নাকি রঙলালের বিরুদ্ধে ক্ষ্যাপাঁই তুইলেছি সক্কলকে ।'

'তো, তোরা কী বলছিস্ ?'

'আমরা বলছি— ।' বীরদর্পে এগিয়ে এল রঙী, 'শুধু উয়াদ্যার লয় । লিয়ে যেতে হল্যে পুরা গাঁ'টাকে লিয়ে চলুন, যেথা লিয়ে যাবার চান ।'

'এই লিয়ে কথা কাচা চলছে তখন থিক্যে ।' সুচাঁদ বলে ।

রাজীব স্থির পলকে রঙীকে দেখছিল । এই মেয়েটা কিনা দিন কতক আগে রঙলালের ইচ্ছের কাছে পুরোপুরি সঁপে দিয়েছিল নিজেকে। রাজীব কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগে শুনতে পেল বড়বাবুর গলা ।

'এই যে মশাই ।' বড়বাবু রুক্ষ গলায় ডাক পাড়েন রাজীবকে, 'বেশ তো তখন থেকে মুরুব্বির মত তত্ত্ব-তালাশ নিচ্ছেন । মনে হচ্ছে, যেন কোনও হাই-পাওয়ার কমিটি ইন্‌ভেস্টিগেশন করছে । একটা প্রশ্ন করতে পারি ?'

'স্বচ্ছন্দে ।' রাজীব পায়ে পায়ে এগোয় বড়বাবুর দিকে ।

'বেশ তো লেখাপড়া করে চাকরি করেন কলেজে । মাস গেলে মোটা মাইনেও পাওয়া যায়, পড়াতেও হয় না । যাকে ব'লে রাজার চাকরি । তা, এইসব খেটে খাওয়া গরীব

মানুষগুলোকে ক্ষ্যাপাচ্ছেন কেন ?'

রাজীব কী যেন বলতে যাচ্ছিল । মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বড়বাবু বললেন, 'এই সীমাহীন বেকারীর দেশে মানুষ চাকরি পেয়ে বাইরে যেতে চাইছে । আপনি তাদের আটকে দিচ্ছেন ? এটা একটা ক্রিমিন্যাল অ্যাক্টিভিটি, আপনি জানেন ?'

রাজীব মিটি মিটি হাসছিল। বলল, ' তার আগে একটা প্রশ্ন করি আপনাকে । মাঝে মাঝেই দল বেঁধে এসে গাঁয়ের এই মুখ্যু-সুখ্যু মানুষগুলোকে ভয় দেখাচ্ছেন কেন বলুন তো ?'

'আমি এখানে আমার ডিউটি করতে এসেছি ।'

'রিয়েলী !' এবার বিদ্রূপ ঝরে পড়ে রাজীবের গলা থেকে, 'তা, কোন্ ডিউটিটা এখানে করতে এসেছেন, জানতে পারি ?'

'ইয়েস ।' গলায় কাঠিন্য এনে বড়বাবু বলেন, 'এ গাঁয়ের ছ'জন, প্লাস আপনার নামে কমপ্লেন আছে । রঙলাল ভকত বহু টাকা ধার দিয়েছে এ গাঁয়ের মানুষকে, বহুদিন ধরে। টাকাগুলো সে অ্যাডভান্স করেছে কিছু টি' কোম্পানী এবং টিম্বার কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে । এখন, আপনার মত মানুষের মদত পেয়ে গাঁয়ের মানুষ তাকে কলা দেখাতে চায়। আ ক্লিয়ার কেস অব্ ব্রীচ অব্ ট্রাস্ট্ অ্যাণ্ড ব্রীচ অব কনট্রাক্ট । তারপর ধরুন, রঙলাল এ গাঁয়ে ঢুকলেই তার ওপর হামলা হচ্ছে । মানে অ্যাটেম্পট্ টু মার্ডার । তাকে ভয় দেখিয়ে রসিদ লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে, মানে ইনটিমিডেশন— ।'

বড়বাবুর মুখে ইংরেজী-বাংলা মেশানো এমন চোস্ত কথা শুনে রঙলাল চমৎকৃত । সে চোখ ডাগর করে দেখতে থাকে রাজীবের প্রতিক্রিয়া।

বড়বাবুর শেষ কথাটুকু অল্প চমকে দিল রাজীবকে । রন্তীর ব্যাপারে সব টাকা পেয়েও কি অস্বীকার করতে চাইছে রঙলাল ! ভাবতে ভাবতে তেতো হাসে রাজীব । বড়বাবুর উদ্দেশ্যে বলে ওঠে, 'বাহ্ ! কতো বুদ্ধি আপনার ! আইনের ব্যাপারে কি টনটনে জ্ঞান ! তা, অত কথা জেনেছেন, এটুকু জেনেছেন কী, রঙলালের কোনও মানি-লেণ্ডিং লাইসেন্স আছে কিনা? টি' কিংবা টিম্বার কোম্পানীর এজেন্সী-কার্ডগুলো একবার দেখতে পারি কি ?'

'দেখুন, বড্ড বাজে বকছেন তখন থেকে । আপনার কাছ থেকে আইন শিখতে হবে আমায় ?' বড়বাবু রাগে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকেন । বলেন, 'আপনার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি । আপনার বেশি কথা শোনার সময় আমার নেই । মুখে মুখে তক্কো আমি পছন্দও করিনে । আমি আপনাদের সাতজনকেই অ্যারেস্ট করলাম । বাজে তক্কো না করে জীপে চলুন । সিপাই— । ছ্যাঁদাপাথরে আমাদের জীপ রয়েছে ।'

মৃদু মৃদু হাসছিল রাজীব ।

বলল, 'সেটা কি আর অত সহজ হবে ? এরা তো বলছে পুরো গাঁ'কেই অ্যারেস্ট করতে হবে । সেটা একবার ভেবে দেখুন ।'

'বললাম না ? বাজে কথা শোনার সময় নেই আমার ।' বড়বাবু বাঁ'হাতের তেলোতে কালো তেলেতেলে রুলখানা আছড়াতে আছড়াতে বললেন, 'আপনারা আমার অর্ডার ক্যারী-আউট করবেন কিনা বলুন ?'

'করব না কেন ? একশোবার করব ।' রাজীব শান্তগলায় জবাব দেয়, 'তবে ল'ফুল অর্ডার।

আপনি জানেন রঙলালের ব্যবসাটাই বেআইনী। অ্যারেস্ট করতে হলে, আইনের মর্যাদা রাখতে হলে, ওকেই অ্যারেস্ট করা উচিত।'

রঙলাল বাঘের মত মুখ করে তাকাল রাজীবের দিকে।

বড়বাবু রাজীবের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'মিঃ চৌধুরী, এবার কিন্তু আমাকে বলপ্রয়োগ করতে হবে।'

'যা খুশী করুন আপনি।' রাজীব ততক্ষণে তিতি-বিরক্ত। চারপাশের জমায়েতের দিকে কয়েক পলক তাকাল সে। দৃঢ় গলায় বলল, 'সব গোল হয়ে শুয়ে পড় মাঠের মধ্যে।'

সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল গজাশিমুলের তাবত মানুষ। বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল রঙলাল ও পুলিশ বাহিনী। এবং রাজীবসহ সাত জন আসামী।

রাজীব বলল, 'নিয়ে চলুন দেখি, কত ক্ষমতা আপনার! মনে রাখবেন, শুয়ে থাকা এই মানুষগুলোর মধ্যে রয়েছে অন্তত তিরিশ জন শিল্পী, যাদের নাম শুধু ভারতেই নয়, ইউরোপ-আমেরিকাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশের চাকরি করেন, তাই এসব খোঁজ রাখেন না। কিন্তু জেনে রাখুন, আজ আপনি এখানে সামান্যতম বাড়াবাড়ি করলে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দিল্লি অবধি তোলপাড় হয়ে যাবে। বিশ্বেস করুন, একটুও বাড়িয়ে বলছি নে আমি।'

বড়বাবুও সেটা বিলক্ষণ জানেন। এই মাস্টারটার সঙ্গে দেশ-বিদেশের বহু রইস আদমিরই ভাল যোগাযোগ রয়েছে। প্রশাসনের অনেক উঁচু ঘাটে ওঁর নৌকাটি বাঁধা, এটাও ঘটনা। কাজেই গজাশিমুলের তাবত মানুষ বৃত্তাকারে শুয়ে পড়বার পর থেকেই বড়বাবুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে।

রাজীবের দিকে দু'পা এগিয়ে এলেন বড়বাবু। নরম গলায় বললেন, 'মিঃ চৌধুরী, কেন শুধু শুধু ঝামেলা করছেন তখন থেকে। আপনাদের পালাগানের খবর কে না জানে? আরে মশাই—।' একটু ঘনিষ্ঠ গলায় বড়বাবু বলে চলে 'ও সব 'ফোক' বলুন, 'লোকো' বলুন, এসব আমরাও একটু আধটু বুঝি। বাংলার ছাত্র ছিলাম। আশুবাবু আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আশুবাবুকে চেনেন তো? ড. আশুবাবু তারপর গিয়ে ধরুন, সুনীতিবাবুর হাত থেকে প্রাইজ নিয়েছি। 'ফোক' আমারও প্রিয় সাবজেক্ট ছিল। কিন্তু আমি বলতে চাইছি, ফোক্, লোকো, যাই করুন, সেটা করুন অন্যকে ডিসটার্ব না করে। কেন, আমরা কি 'লোকো' নিয়ে গাঁয়ে-গঞ্জে ঘুরিনি কলেজ লাইফে? কত্তো ঘুরেছি। কিন্তু আমরা কারো ট্রাবল্-এর কারণ হইনি। আর যাই হোক, 'লোকো' তো আর লোকোমোটিভ নয় মশাই যে, ধোঁয়া ছেড়ে, গর্জন তুলে চারপাশের জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে!' একখানা মোক্ষম রসিকতা করতে পেরেছেন ভেবে নিজেই কিছুক্ষণ হাসলেন বড়বাবু।

তারপর বললেন, 'আমরা তো আপত্তি করছি নে। আপনি 'লোকো' করুন না যত খুশী। কিন্তু নীরবে। নিঃশব্দে। বড় কাজের লক্ষণই তাই। আপনি আপনার মত 'লোকো' করুন। রঙলালও তার কাজকর্ম করুক। আপনার একটা ব্যক্তিগত শখ মেটাতে ও বেচারার অন্ন মারছেন কেন? বলুন। এইটুকু কথা দিন আমায়। আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।'

রাজীব অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনছিল বড়বাবুর কথা। বলল, 'একটা কথা আমি দিতে পারি আপনাকে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন ।' বড়বাবু অধীর আগ্রহে তাকালেন ।

'কথা দিচ্ছি— ।' রাজীব ধীর গলায় বলল, 'আজকের মধ্যে যেভাবেই হোক্ হোম মিনিস্টার আর আই-জি'কে জানাচ্ছি আপনার ব্যাপারটা পুরোপুরি । ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে তো বটেই। মনে রাখবেন, হোম মিনিস্টারের বিশেষ অনুরোধে সামনের মাসে সিকিম যাচ্ছে আমার দল। আপনি যদি কোনও ভাবে তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান, তবে বুঝতেই পারছেন— ।'

বলতে বলতে অফিস ঘরের দিকে পা' বাড়াল রাজীব । পেছনে পেছনে সুচাঁদরা ।

রাজীব দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'যে যার ঘরে যাও এবার ।'

সঙ্গে সঙ্গে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল গজাশিমুলের মানুষ । প্রচণ্ড উল্লাসে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ফিরে চলল যে যার ঘরে ।

রুক্ষু ডাঙার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অক্ষম ক্রোধে ফুলতে থাকেন বড়বাবু । তার পাশটিতে দাঁড়িয়ে পাথর হয়ে যায় রঙলাল । চারপাশের বনজঙ্গল, খানা-খুলিয়া আর মুখে তুলে থাকা ডুংরীগুলো যেন নিঃশব্দে হাসতে থাকে ওদের দিকে তাকিয়ে । হাওয়া যেন নাকের সামনে হাত নেড়ে দিয়ে চলে যায় । একসময় ভাঙা গলায় ককিয়ে ওঠে রঙলাল, আব ক্যা হোগা সরকার ?

১৮.রাজীবের সামনে আর এক ভিলেন

জাতীয় মেলা থেকে ফিরেই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পেল রাজীব । প্রথমটি হল, ক্যাথি বার্ড-এর অভিনন্দন বার্তা এবং তৎসহ 'জলকেলি-নাচ'এর প্রথম শো'এর প্রসঙ্গ । দ্বিতীয় চিঠিখানি মিঃ খাণ্ডেলওয়ালের । রাজীবের দ্বিতীয় বইখানির জন্য অবিলম্বে চুক্তি করতে চান । তৃতীয়টি, ড. ওরিন পোর্টা'র-এর । 'ইস্ট-ওয়েস্ট ফোক ফাউণ্ডেশন'-রে বার্ষিক সভায় রাজীবকে পেপার পড়বার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ।

এ ক'দিন যেন এক স্বপ্নের ঘোরে ছিল রাজীব । 'জলকেলি-নাচ' এর বিপুল সাফল্য তার প্রবল খ্যাতিকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে । তবুও দল নিয়ে গজাশিমুল গাঁয়ে ফিরে গিয়ে সে উত্তাপ পেল না রাজীব । ফিরতি পথে, ট্রেনে, বাসে, রাজীব বার বার খুঁটিয়ে দেখেছে, সকলের চোখে-মুখে এক গাঢ় কালিমা, এক ধরনের চাপা বিষাদ, যেন তাদের মূল্যবান কিছু সম্পদ রাজধানীতে হারিয়ে ফেলেছে, যেন নিঃস্ব-সর্বস্বান্ত হয়ে ঘরে ফিরছে গজাশিমুলের ছেলে-মেয়েগুলো । গাঁয়ে ফিরে গিয়েও সেই একই দৃশ্য, সেই একই বিষাদ দশরথ ভক্তা, ঝাড়েশ্বর কোটালদের মুখে । যেন জয় করে নয়, জেলখেটে ফিরছে ওদের আত্মজরা । যেন গজাশিমুলের ঘরে ঘরে চুরি হয়ে গেছে, চোর নিয়ে গেছে সর্বস্ব ঝেঁটিয়ে । সন্ধ্যেবেলায় আলো-আঁধারি বারান্দায় বসে দশরথ ভক্তার গলায় হা-হুতাশ আর চাপা রইল না । কি বইল্ব মাস্টার, যা ছিল আমাদের একান্ত গুপ্ত চিজ, জাতের পুরুষরাও যে চিজ দেখে নাই আইজতক্ক, সে চিজ দুনিয়ার মনিষ্যি দেইখ্যে লিল্যাক্ । এ ছিল আমাদের সাধন-লাচ, কানাইশর জীউর সাথে যোগাযোগের মাইধ্যম্, সে আইজ হইল্যাক শহরের বাবু-ভায়াদ্যার আমোদের চিজ । রাজীব ওদের প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করছে । বুঝিয়েছে অন্য পথে । তোমাদের জিনিস অক্ষতই

রয়েছে । আমি ওতে হাত দিই নি । শহরে যা দেখিয়ে এলাম তা ছায়া মাত্র । ছায়া আর কায়ার মধ্যে অনেক ফারাক, মানো তো এটা ? ছায়ার মাথায় লাঠি মারলে মানুষটা মরে না, ছায়াকে অস্ত্র দিয়ে কাটলে কায়া কখনও দু'টুকরো হয় ? সুচাঁদরা দল বেঁধে রওনা দিয়েছে কানাইশরের পূজো দিতে । সেই সঙ্গে বিভূতি-শবরকে শুধিয়ে আসবে, এই ধরনের পালাগান করলে গজাশিমুলের মানুষের ওপর কানাইশরের শাপ পড়বে কিনা, আগুন-বরণ হরে নেবেন কিনা গজাশিমুলের প্রাণগুলো । দশরথ ভক্তা কান কামড়ে বলে দিয়েছে সুচাঁদকে, 'বিভূতিকে বইলবি, যেন কথাটা ভাল কইরে জেনে লেয় খোদ কানাইশরের থিক্যে ।' ঠিক হয়ে যাবে, রাজীবের দৃঢ় বিশ্বাস, গজাশিমুলের মানুষের প্রগাঢ় প্রদাহ ধীরে ধীরে কমে আসবে । সময় হল সেরা ওষুধ, শুকিয়ে দেবে তাবত ক্ষত । যখন দুনিয়া জুড়ে নাম হবে, বিপুল অর্থ আসবে ঘরে, অর্থ এলেই আসবে ভালো খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিলাস-সামগ্রী, ক্রমে ক্রমে শিক্ষা, আধুনিকতা, — জীবনের ধারা এবং ধারণাই যাব বদলে, তখন ভাবনার প্রক্রিয়াটাই হবে পৃথক । সারা বছর হিল্লি-দিল্লি চক্কর মারতে মারতে মনটাই হয়ে উঠবে কস্‌মোপলিটন, তখন কোনও রুচি-সংস্কৃতি-প্রক্রিয়াকে আঁকড়ে থাকব, লুকিয়ে রাখব, এসব ধ্যান-ধারণা ফিকে হয়ে আসবেই । আসা উচিত রাজীব বিশ্বাস করে, শুধু গুপ্ত-আখ্যা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে রাখবার দরুন কত কিছুই যে হারিয়ে গেছে, সূর্যের আলো না পেয়ে লুপ্ত হয়ে গেছে কত বিদ্যে, কাব্য, শিল্প-সংস্কৃতির কত নিগূঢ় ধারা যে শুকিয়ে গেছে লোকচক্ষুর আড়ালে, সারা পৃথিবীতে, তার বুঝি ইয়ত্তা নেই । এদের আর্থিক অবস্থাটা বদলানো দরকার, যত জলদি সম্ভব । সেদিনের গণ-অভ্যুত্থানের পর রঙলাল আর গাঁয়ে আসেনি, খুব সম্ভব আর আসতে সাহসও পাবে না । ওপরওয়ালার ধমক খেয়ে থানাও এখন চুপচাপ, সম্ভবত আর বেগড়বাঁই করবে না । কাজেই রঙলালের লালখাতার বিভীষিকা বোধ করি দূর হয়েছে । এখন এদের একটুখানি আর্থিক সচ্ছলতা দরকার । জীবনযাত্রার মানের নিরিখে অতীত-বর্তমানের ফারাকটা উপলব্ধি করুক ওরা । ওরাও বোধ করি সেটাই চাইছে । এমনটা রাজীবের মনে হয়েছে সুচাঁদের কিছু কথা থেকে ।

জাতীয় মেলা থেকে ফেরার সময় ট্রেনের কামরায় দুলতে দুলতে সুচাঁদ তুলেছিল বিষয়টা।

'মাস্টারদা, আমাদের প্রতি-নাইট রেট কি ন'হাজার টাকা ?'

রাজীব ভুরু কুঁচকে তাকায়, 'হঠাৎ এমন প্রশ্ন ?'

'না, বলছিল্যাম— ।' সুচাঁদ খুবই বিব্রত হয়ে বলে, 'আমরা ত জানি, আমাদ্যার রেট চার হাজার, কিন্তু সুনীলদা বইল্‌ল্যাক, আমাদ্যার রেট নাকি ন'হাজার ।'

সুনীল— । রাজীব অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সুচাঁদের দিকে । সহসা কোনও কথা জোগায় না ওর মুখে ।

সুনীল অনেক দিন ধরে স্মৃতিতে ছিল না । দেখা-সাক্ষাৎ নেই, যাতায়াতও নেই ওর বাড়িতে । সুনীলই, রাজীবের কেমন মনে হচ্ছিল ইদানিং, এড়িয়ে চলতে চাইছে ।

ওর সঙ্গে শেষ দেখা, গজাশিমুল গাঁয়ে যেদিন পুলিশ গেল, তার দিন দশেক বাদে, রাজীব একদিন রাত্রিবাস করেছিল সুনীলের রানীবাঁধের বাড়িতে । ঐ শেষ রাত্রিবাস । খুব ক্লান্ত লাগছিল রাজীবের, এক ধরনের দুর্বলতা বোধ করছিল । জলকেলি-নাচের রিহার্সেল পুরোদমে চলছিল

তখন, ছ্যাঁদাপাথর থেকে গজাশিমুল অবধি রাস্তাটা মেরামত হচ্ছিল, মল্লভূম ফোক সেন্টারের কাজও তো থেমে ছিল না, সব মিলিয়ে... । রাজীবকে দেখতে দেখতে এক সময় সুনীলই বলেছিল, 'আপনার শরীরটা খুবই খারাপ হয়েছে, স্যার, খুবই রোগা লাগছে... ।'

'ও কিছু নয়— ।' ম্লান হেসে রাজীবের জবাব, 'খাটুনিটা বেশি পড়েছে তো ।'

'আমারও তাই বিশ্বাস স্যার ।' তার পরেই সুনীল কথা পেড়েছিল, 'আমার মনে হয়, স্যার, গজাশিমুল আর মল্লভূমের মধ্যে একটাকে বেছে নেওয়া উচিত আপনার । দুটো নিয়ে আপনি হিমশিম খাচ্ছেন ।'

রাজীব কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সুনীলের দিকে, 'কোনটা ছাড়তে বলছ ?'

'আমার মতে গজাশিমুলকেই ছাড়া উচিত ।' একটুও সময় না দিয়ে বলেছিল সুনীল।'

'সমুদ্দুর ছেড়ে কে আর কুঁয়ায় বসবাস মেনে লেয় ?' সুনীল খুব আন্তরিক হেসেছিল, 'গজাশিমুলের নাচগান অফুরন্ত নয়, একদিন ফুরাবেকই । মল্লভূম ফোক সেন্টারের ব্যানারে আপনি চারপাশের লোকসংস্কৃতির বিশাল জগতে বহু বছর বিচরণ করতে পারবেন, স্যার ।'

অজান্তে ভুরু কুঁচকে আসে রাজীবের । চোখ ছোট হয়ে আসে । সুনীল কি মনে মনে এটাই চাইছে, রাজীব ছেড়ে দিক গজাশিমুলের নিয়ন্ত্রণ-ভার ! খুব কি উচ্চকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছে সুনীল ? মাঝে মাঝে সুনীল গজাশিমুলে যায়, এমন খবর রাজীবের রয়েছে। কেন যায়, কী করে সেখানে, সে বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট খবর নেই । সুচাঁদ বলে, 'শুধু-মুদু আইসে আইজ্ঞা। আইসে, থাকে, খায়-দায়, গল্প-গুজব করে, চইল্যো যায়, ব্যস ।' এতদিন বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেয় নি রাজীব, কেবল সুনীলের গুম হয়ে থাকা, ফোক-জনিত কোন তথ্যই রাজীবকে না দেওয়া ইত্যাদি বিপরীত ব্যবহারে কেমন খটকা লেগেছিল মনে । খটকাটা বেড়ে গিয়েছিল কানচা মল্লিকের এক দিনের একটি কথায় । রানীবাঁধ বাজারে কথাবার্তার ফাঁকে একদিন নাকি সুনীল আক্ষেপ করে ওকে বলেছিল, 'রাজীব স্যারকে তোদের গাঁয়ে লিয়ে গিয়ে বড়ই ভুল করেছি আমি । এখন বড় আফশোস হচ্ছে মনে ।'

কানচার মুখ থেকে কথাটা শুনে খানিকক্ষনের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল রাজীব । পরমুহূর্তে সামলে নিয়েছিল নিজেকে, চোখমুখ হয়ে উঠেছিল আগের মতোই স্বাভাবিক ।

আপশোস তো হবেই—, রাজীব মনে মনে মজা পায়, তখন কি সুনীল ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করতে পেরেছিল, অর্ধ-উলঙ্গ, অরণ্যচারী একটি গোষ্ঠীর 'ধাপুর-ধুপুর' নাচ আর 'চিল-চিচ্কার', (এই সব বিশেষণে তখন ভূষিত ছিল গজাশিমুলের বসু-শবরদের নাচ-গান, চার পাশের বিত্তবান উচ্চবর্ণদের মধ্যে) গানকে ধুয়ে, ছেঁকে এমন জায়গায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে ! ফলটা তো সুনীলেরই প্রাপ্য ছিল, কারণ গাছটা তো বাস্তবিক সে-ই খুঁজে বের করেছিল, রাজীব তো গিয়েছিল ওরই পিছু-পিছু, ওরই পদচিহ্ন অনুসরণ করে ।

রাজীবকে চুপ করে গাঢ় ভাবনায় ডুবে যেতে দেখে সুনীল আকুল গলায় বলেছিল, 'একদিন আমিই আপনাকে সেধে নিয়ে গিয়েছিল্যাম গজাশিমুল গাঁয়ে, আজ সেই আমিই বলছি স্যার, গজাশিমুল থেকে আপনি সরে দাঁড়ান ।'

শোনামাত্র সুনীলের চোখে সরাসরি চোখ রেখেছিল রাজীব, চোখের পাতা ফেলতেও

ভুলে গিয়েছিল । এভাবে কেউ বলে ? কেউ এমন অকপট প্রকাশ ঘটিয়ে ফেলতে পারে নিজের অবদমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার, সুনীল যেমনটা পারল !

খুবই সংযত গলায় সেদিন জবাব দিয়েছিল রাজীব, 'ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখব সুনীল ।'

তারপর আর দেখা হয় নি ওর সঙ্গে ।

ট্রেনের কামরায় সুচাঁদের প্রশ্নখানা শুনে দ্বিতীয়বার চমক খেল রাজীব । বলেছে এটা, সুনীল ? এখন তবে এই পথ ধরেছে সে ! সঙ্গোপনে বিষিয়ে দিতে চাইছে গজাশিমুলের মানুষজনের মন ! দশরথ ভক্তাদের আজকের এই যে সর্বস্ব হারানোর বিষাদ, সেটাও সুনীলই ছড়ায়নি তো রাজীবের অগোচরে ? নিজের ব্যক্তিগত বিষাদখানি সুকৌশলে চারিয়ে দেয় নি তো এই সরল-অকপট মানুষগুলোর মধ্যে ! নইলে ভেবেচিন্তে যারা মত দিল তিন মাস আগে, তারা কেন আজ উল্টো গাইছে । রাজীবের কোনই সন্দেহ নেই, ভেতরে ভেতরে অন্তর্ঘাতী খেলায় মেতেছে সুনীল ।

উপস্থিত, মনের মধ্যে চিন্তার স্রোতখানিকে স্তিমিত করল রাজীব, সুচাঁদের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল ।

বলল, 'ঠিকই বলেছে সুনীল, ন'হাজারই রেট বাঁধব এখন থেকে । সুনীলকে সেটাই বলেছিলাম, চার হাজারে আর কতদিন ফ্যাক-খাটবি, তোদের খেতে পরতে হবে না ?'

সুচাঁদ মন দিয়ে শুনছিল ।

বলে, 'ন'হাজার আমাদিগ্‌কে দিবেক্‌, মাস্টারদা ?'

'আলবত দেবে ।' চোখ নাচিয়ে রাজীব বলে, 'তাছাড়া, জলকেলি-নাচের পর— নয় না হোক, আট তো দেবেই । তা না হলে চুক্তিই করব না আমরা ।'

সুচাঁদ যেন তখন কোন্‌ দূর আকাশের পক্ষী । তার মনখানা যেন এই কামরার মধ্যে নেই, উড়ে গেছে কোন্‌ সুদূরে আসমানে, হয়ত বা ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেছে, দু'তিন বার ডাক দিয়েও সাড়া পাওয়া গেল না ।

আজকের ডাকে সাতখানা চিঠি এসেছে । সবাই 'জলকেলি-নাচ' এর শো করতে চায় । মাদ্রাজ থেকে আলিপুরদুয়ার, বোম্বে থেকে আগরতলা,— কেউই এক মুহূর্ত ধৈর্য ধরতে রাজি নয় । কিন্তু রাজীবের পক্ষে অন্য কোথাও শো করা সম্ভব নয় । ক্যাথি বার্ড-এর কাছে প্রতিশ্রুতিতে বাঁধা রয়েছে সে, প্রথম শো ক্যাথি বার্ডদের জন্য নির্দিষ্ট । তার কাছ থেকে ডেট পেলেই তবে অন্য শো'গুলোর তারিখ ঠিক করা সম্ভব হবে ।

রাজীব চিঠি লিখল ক্যাথি বার্ডকে, প্রথম শো'এর দিন-ক্ষণ স্থির কর ম্যাডাম, আমরা তৈরী ।

১৯.হাতিলাদা ডুংরীর চূড়োয় গোলাকার চাঁদ

'রাজধানীর' রবীন্দ্রসদনে গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘের 'জলকেলি-নাচ' এই মাত্র শুরু হল। 'ইস্ট-ওয়েস্ট ফোক ফাউণ্ডেশন' এর কলকাতা শাখাই স্পনসর করছে শো । ব্যবস্থাপনা

ও প্রচারের দায়িত্বও ওরাই নিয়েছে । প্রায় একমাস আগে থেকে পোস্টার পড়েছে রাজধানীর দেওয়ালে দেওয়ালে । নৃত্যরতা রণ্ডী ও পার্বতীর ছবি সহ বিশাল বিশাল হোর্ডিং রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে । শো' শুরু হওয়ার আধঘণ্টা আগে থেকেই হলের প্রতিটি আসন ভরে গেছে । শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, বিশেষ করে সংস্কৃতি জগতের স্তম্ভ যাঁরা, সবাই এসেছেন আজ ।

দিন কয়েক আগে বাঁকুড়তে ট্রাঙ্কল করেছিল ক্যাথি বার্ড । ফাউণ্ডেশন-এর বার্ষিক সভায় পেপার পড়তে যাওয়ার দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়ে গেছে, পাসপোর্টও তৈরি । রওনা দিতে হবে ঠিক একমাস বাদে । রাজীব যেন এর মধ্যে আর নতুন শো-এর প্রোগ্রাম না করে । ক্যাথি বার্ড-এর দৃঢ় বিশ্বাস, রাজীবের এ বারের সফর দু'দেশের সংস্কৃতিকে অনেক কাছাকাছি নিয়ে আসবে, এবং এর ফলে, অদূর ভবিষ্যতে, গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘ আমেরিকা ও ইউরোপ সফরের সুযোগ পাবে । এদিকে মিঃ খাণ্ডেলওয়াল ক্রমাগত ট্রাঙ্কল করে চলেছেন, 'জলকেলি-নাচ' এর ওপর যে বইখানা বেরুবে 'ব্লু-বার্ড' থেকে, তার পাণ্ডুলিপি এবং ছবি এক্ষুনি চাই। চুক্তি সই হয়েছে আগেই, মিঃ খাণ্ডেলওয়াল তাগাদাও দিচ্ছিলেন, কিন্তু জাতীয় মেলায় 'জলকেলি-নাচ' স্বচক্ষে দেখে একেবারে হেদিয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক । ছাপানোর কাজ তিনি অবিলম্বে শুরু করতে চান। রাজীব হেঁকেছিল একলাখ টাকা, দরাদরি করে পঞ্চাশ হাজারে রফা হয়েছে । কিন্তু এখন রাজীবের মনে হচ্ছে, মিঃ খাণ্ডেলওয়াল যেভাবে এঁটুলির মত লেগে রয়েছে, ষাট-সত্তরেও রাজি হয়ে যেত । আসলে তাড়াহুড়ো করতে গিয়েই কেসটা কেঁচিয়ে ফেলেছে রাজীব । শেষ অবধি খাণ্ডেলওয়ালের সঙ্গে নার্ভের খেলায় হেরে গেছে ও । প্রথম বইটার ক্ষেত্রেও তাই, মাত্র পনের হাজারে রাজি হয়ে গিয়েছিল রাজীব । সেও ছিল ঐ নার্ভের খেলায় হেরে যাওয়ার গপ্পো ।

'ধেত্— !' রাজীব এখন মনে মনে ধিক্কার দেয় নিজেকে, 'বাংলার মাস্টারকে দিয়ে কখনও ব্যবসা হয় !'

তা সে যাগ্‌গে, যদি শেষ অবধি ফাউণ্ডেশনের বার্ষিক সভায় যেতেই হয়, তবে তার আগে নতুন বইয়ের অন্তত আংশিক পাণ্ডুলিপি রেডি করে দিয়ে যেতে হবে খাণ্ডেলওয়ালকে।

শো চলছে পুরোদমে । গ্রীনরুমের উল্টোদিকের সাজানো গোছানো ঘরখানাতে চুপচাপ বসে রয়েছে রাজীব, সামনে স্কচের গ্লাস, মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে আর ভবিষ্যতের কাজকর্ম নিয়ে এই সব আকাশ-পাতাল ভাবছে । ইদানিং খুব খাটুনি গেলে কিংবা কোনও কারণে উত্তেজিত থাকলে মাঝে মাঝেই পান করে রাজীব । সকলের সামনেই করে । কেউ কিছু মনে করে না তার জন্য । মঞ্চ থেকে ভেসে আসছে উদ্দাম নূপুরের শব্দ, টুকরো টুকরো গানের কলি, দর্শকের উচ্ছ্বাস মেশানো হাততালি । ক্যাথি বার্ড বসে রয়েছে সামনের সারিতে। আজকের পুরো অনুষ্ঠানটার ভিডিও-রেকর্ডিং করাচ্ছে ও । সামনের হপ্তায় পাঠিয়ে দেবে আমেরিকায়, যাতে রাজীব পৌঁছুবার আগেই তার সাম্প্রতিকতম কীর্তিটি আগাম ঝড় তুলে রাখে ওদেশে ।

আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে একখানা সিগারেট ধরায় রাজীব । গ্লাসে আর এক প্রস্থ পানীয় ভরে নেয় । ধীরে ধীরে ভাবনার স্রোতে ডুবে যায় সে । অনেক দিন সুতপার কোন খবর নেই । বারবার চিঠি লিখে থেমে গেছে সুতপা । মায়ের কাছেও যাওয়া হয় নি

আজ মাস ছয়েক। ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায় রাজীব। এক ধরনের অপরাধবোধে ভরে যায় মন। আসলে, আজকাল কোলকাতায় এলে ওর নাওয়া-খাওয়ার সময় জোটে না। ইন্টারভিউ, কনট্রাক্ট, আমলা-মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ, ফরেন-ডেলিগেটদের সঙ্গে মিটিং, ফিরতি ট্রেনে চড়বার আগের মুহূর্ত অবধি তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে কাজ। মাসে এক-দু'বার বাইরে যেতে হয়, রাজধানী সহ ভারতের প্রায় সর্বত্র। কলেজ থেকে লম্বা ছুটি নিয়েছে। কিন্তু এভাবে দীর্ঘদিন চলতে পারে না। ক্যাথি বার্ড অনেক দিন থেকেই বলে আসছে, এবার সত্যি সত্যিই কলেজের চাকরিটা ছেড়ে দিতে হবে।

শো' জমে উঠেছে, অতদূর থেকে কান পেতেই সেটা টের পায় রাজীব। আজকের শো'তে মূল পালার সামান্য অদল-বদল করেছে রঙী আর পার্বতীর মুখে আরও একখানা করে গান দিয়েছে। একেবারে শেষ দৃশ্যে অন্যদের ফ্রীজ করে রেখে, কেবল রঙীকে নাচিয়েছে পাক্কা দশ মিনিট। ঢিমে তালের নাচটিকে ক্রমশ জলদ করেছে। সঙ্গে অর্কেস্ট্রার যাদুকরী সূক্ষ্ম কাজ, বাহারী আলোর প্রোজেকশন, ডাইনে-বাঁয়ে পেছন থেকে। ঐ একক-নাচটি আজ অনেক হাততালি কুড়োবে।

আচমকা হলের মধ্যে তুমুল হাততালি আর উল্লাস। আরাম-কেদারায় বসেই শুনতে পায় রাজীব। তার মানে, রঙী আর পার্বতীর যৌথ নাচটি শেষ হল। আর খানিক বাদে শুরু হবে রঙীর একক-নৃত্য। তার মানে, শো' শেষ হতে আর মিনিট বিশেক বাকি। ঘড়ির ডায়ালে চোখ রাখল রাজীব। আটটা চল্লিশ। শো' শেষ হলে যত জলদি সম্ভব ফিরতে হবে হোটেলে। কাল সকালের ট্রেনে দল যাবে শিলিগুড়ি, সেখানে একটা শো সেরেই গ্যাংটক। সেখানে পরপর তিনদিন শো। কাল পুরো দিনটা গাড়িতেই কাটবে, খুব ধকল যাবে। তাই, আজ রাতে ঘুমটা দরকার পুরোপুরি। তবে যত জলদি হোটেলে ফিরবে ভাবছে, তত জলদি ফিরতে পারবে না কিছুতেই। শো-এর পরই বন্যার জলের মত আসবে রিপোর্টার আর ফোটোগ্রাফারের দল। পরিচিত লোকজন, শুভানুধ্যায়ীরা এসে অকারণে ভীড় জমাবে। খেজুরে আলাপ করতে আসবে কিছু উটকো লোক। তার ওপর আজ স্পেশাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে কে. কে. বাজেরিয়ার সঙ্গে। বাজেরিয়া বড়বাজারের 'আনন্দম্' সংস্থার সেক্রেটারি। শো-এর ব্যাপারে কনট্রাক্ট করতে চায়। একমাস আগে থেকে চিঠি দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাকা করে রেখেছে। এই সব সাত-পাঁচ সেরে, হোটেলে ফিরতে কম করেও রাত এগারোটা।

তাড়াতাড়ি গ্লাসের পানীয়টুকু শেষ করে দেয় রাজীব। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। সামান্য টলছে পা দুটো। মগজের মধ্যে কিলবিল করছে, চেনা-অচেনা ছবি, সারবন্দী মুখ, মা, সুতপা, ক্যাথি বার্ড, রঙলাল, সুনীল... । কাস্তো ভক্তার ঢুলু চোখ... । এখনও অনেক কাজ বাকি, এখনও জয়ের অপেক্ষায় অনেকগুলি শৃঙ্গ। হাতিলাদা ডুংরীর চূড়োয় গোলাকার চাঁদখানি যেন ধীরে ধীরে নেমে আসছে বনভূমির কাছাকাছি, অবিরাম হাতছানি দিচ্ছে রাজীবকে। রাজীব তার ডান হাতখানি তুলে বার দুই অকারণে নাড়িয়ে দেয় শূন্যে, গাঢ় হাসিতে ভরে যায় অক্ষিকোটর।

দূরভাষে অদূরভাষিণী

শো' শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে হুড়োহুড়ি পড়ে রাজীবের ঘরে।

প্রথমেই ঢুকল ক্যাথি বার্ড। ফর্সা হাতখানি বাড়িয়ে দিল রাজীবের দিকে। মার্ভেলাস! ফ্যানটা—স্টিক! ওনলী য়্যু কুড ডু দিস জব। তোমাকে দেখলে হিংসে হয়।

ক্লান্ত হাসি হাসতে থাকে রাজীব, থ্যাঙ্ক য়্যু ম্যাডাম।

সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার আর শুভানুধ্যায়ীরা চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরেছে রাজীবকে। অন্যদিন শো-এর খানিক আগে বেরিয়ে এসে রাজীবের ওপর হামলা চালায় ওরা। আজ আর বাছাধনরা চোখের পাতা ফেলবার ফুরসত পায়নি। সারাক্ষণ শুধু গোগ্রাসে গিলেছে। শো-এর পর, এখন, সবাই এসে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাজীবের ওপর প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার করে তুলেছে। ঝলাক ঝলাক ফোটো তুলছে ফোটোগ্রাফারের দল। রাজীব জানে, কালকের প্রভাতী কাগজগুলো ছেয়ে যাবে 'জলকেলি-নাচ'-এর খবরে, পাতা জুড়ে ছাপা হবে নৃত্যরতা রঙীর উদোম ছবি, রাজীবের সাক্ষাৎকার।

রিপোর্টারদের অত্যাচার খানিকটা থিতোতেই বিদায় নিল ক্যাথি বার্ড। আমি তবে আজ আসি, প্রফেসর। কনগ্রাট্স। তোমার আমেরিকা সফরের পাসপোর্ট আর ভিসা রেডী, প্রোগ্রামও পাকা। মোট উনিশ দিনের সফর। রওনা দেবে তেইশে মার্চ। ফাউণ্ডেশন-এর কোলকাতা শাখাই বাকি বন্দোবস্ত করবে। তুমি শুধু গুড-বয়ের মত ঠিক সময়ে প্লেনে চড়ে বসো, তাহলেই হবে। তার আগে এক কাজ করো, গজাশিমুল সংস্কৃতি সংঘর পুরো ইতিহাস, তাদের পারফর্ম্যান্স ইন-আ-নাটশেল, 'জলকেলি-নাচ', নাচের ইতিবৃত্ত এবং কিছু লেটেস্ট ফোটোগ্রাফ আমার কাছে পঠিয়ে দাও দু'এক দিনের মধ্যে : সঙ্গে পাঠাবে তোমার ফুল লাইফ-হিস্ট্রি এবং বিভিন্ন ভঙ্গিমায় তোলা খানকয়েক ফোটোগ্রাফ। অন দ্য ইভ্ অব ইয়োর ম্যাগনিফিসেণ্ট অ্যারাইভ্যাল ইন 'মেরিকা, একটা ইনট্রোডাকশন-কাম-পাবলিসিটি দিতে চাই ওদেশের কাগজগুলোতে। যদিও ইট্স্ আ রিপিটেশন, ওরা সব কিছুই জানে, তবুও—। আচ্ছা, আজ চলি। ঝড়ের বেগে কথাগুলো বলে আচমকাই বেরিয়ে যায় ক্যাথি বার্ড। রাজীবের কিছু জিজ্ঞাসা ছিল, এই ভীড়ের মধ্যে আর ক্যাথির অমন ছটফটানিতে শুধোনো গেল না।

খবরটা সুচাঁদদের দেওয়া দরকার। ওরা অবশ্যি প্রাথমিক ভাবে ব্যাপারটা জানে, শুধু নির্দিষ্ট দিনক্ষণটাই জানা নেই ওদের। কিন্তু ঘরের মধ্যে এই ভীড় খানিকটা পাতলা না হলে তো কিছুই করবার জো নেই। এদের চটানোও চলে না। ক্যাথি বার্ড-এর কাছ থেকে জনসংযোগের প্রথম পাঠটাই পেয়েছিল, কদাপি সাংবাদিকদের চটাতে যেও না, তাহলেই তোমার ক্যারিয়ারটি গেল এবং মনে রেখো, পৃথিবীর সমস্ত রক্তের রঙ যেমন লাল, তেমনি পৃথিবীর সবদেশের সাংবাদিকই কিন্তু একই জাতের। কাজেই, দু'একবার মিনমিন করে 'এবার একটু এলে ভাল হয়' গোছের ছাড়া রাজীব আর কিছুই বলতে পারছে না এদের। অথচ এরা চলে গেলেও রেহাই পাচ্ছে না রাজীব। বাজোরিয়া রয়েছে, সে এসে বাইরে অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ।

সবাই যখন ঘর থেকে বেরোল, তখন ঘড়িতে দশটা-কুড়ি। খুবই ক্লান্ত বোধ করছিল রাজীব। দু'চার মিনিট চুপচাপ বসে রইল চেয়ারে হেলান দিয়ে। তারপ টয়লেটে গেল।

টয়লেট থেকে ফিরতে না ফিরতেই ফোন। চোখে-মুখে চরম বিরক্তি ফুটিয়ে ফোনটা ধরল রাজীব।

'আমি সুতপা বলছি।'

'সুতপা! কোত্থেকে?'

'নাকতলা থেকে, আমার এক বন্ধুর বাড়ি ।'

'কবে এলে কোলকাতায় ?'

'আজই, দুপুরে ।'

'কি করে জানলে, আমি এখানে ?'

'জানা যায় ।'

'না, না, আজ এখানে শো আছে, সবাই জানে । কিন্তু এত রাত্তির অবধি এখানে থাকব, জানলে কি করে ?'

'জানা যায় ।'

রাজীব অস্বস্তি বোধ করে । কি বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না । সুতপার গলাটা কি স্বাভাবিক লাগছে ? সুতপার স্বাভাবিক গলাটা ঠিক কেমন ! একটু কি যান্ত্রিকতা রয়েছে গলায় ? শ্লেষ ? একটু বিষাদও ? টেলিফোনে অপর প্রান্তের স্তব্ধতা ভারি অস্বস্তিকর, বিভ্রান্তিকর। সুতপা ও-প্রান্তে অস্বস্তিকরভাবে স্তব্ধ । রাজীবই স্তব্ধতা ভাঙে, 'কেমন আছ ?' শব্দ দুটো উচ্চারণ করেই কেমন থতমত খায় রাজীব । শব্দগুলো নিজের কানেই কেমন বেসুরো ঠেকে ।

সুতপা কেমন আছে জানায় না । তার বদলে খুব চাপা গলায় বলে, 'একবার দেখা হতে পারে ?'

'কবে ?'

'আজ, কিংবা কাল ।'

'কাল তো ভোরের ট্রেনে শিলিগুড়ি যাচ্ছি, সেখান থেকে গ্যাংটক... ।'

'তবে আজই ?'

'আজ—আজ—আজ, এইমাত্র শো শেষ হল, বুঝলে, রিপোর্টার-ফটোগ্রাফারের দল জ্বালিয়ে খেয়েছে এতক্ষণ । দু'একটা পার্টি এখনও ওয়েট করছে বাইরে । এসব ঝামেলা চুকিয়ে টুকিয়ে— ।'

'এসব ঝামেলা তো তোমাকে সইতে হবেই । 'ফোক'কে তুমি বাণিজ্যিক সাফল্যের দোরগোড়া অবধি নিয়ে গিয়েছ, একি কম কথা ! মানুষ তো তোমাকে কাঁধে তুলে নাচবেই ।'

এমন কথার কি জবাব দেবে রাজীব, ঠিক বুঝে উঠতে পারে না । আসলে, সুতপা ঠাট্টা করছে কিনা, সেটাই বোঝা গেল না । ঠাট্টা করলে সুতপার গলাখানি কেমন হয়ে ওঠে, মনে পড়ছে না রাজীবের । সুতপা খুব সিরিয়াস মেয়ে, ঠাট্টা বড় একটা করেনি কারও সঙ্গে নিকট কিংবা দূর অতীতে ।

'তাহলে রাখছি ।'

'তুমি রাগ করলে, সুতপা ? আমি তোমায় কথা দিচ্ছি— ।'

'আমি রাখছি ।'

'শোন, সুতপা, তুমি আমাকে ভুল বোঝ না, প্লীজ... । আসলে, আমি না, —আমি না- —একটা জালে আটকে গেছি, বুঝলে, কিছুতেই বেরোতে পারছি নে । আমি কেমন যেন— ।'

ওপাশ থেকে লাইনটা আচমকা কেটে দিল সুতপা। রিসিভারখানা হাতে ধরে নির্বাক বসে রইল রাজীব। অনেকক্ষণ।

তোমার স্বদেশ লুট হয়ে যায়, প্রতিদিন প্রতিরাতে

বাজোরিয়া যখন ঘরে ঢুকল, তখন রাজীবকে অনেকখানি ফ্রেশ লাগছে। দু'চারজন উৎসাহী দর্শক তখনও ঘুরঘুর করছিল সাক্ষাতের আশায়। রাজীব ধমকে তাড়িয়ে দিল।

বাজোরিয়ার সঙ্গে করমর্দন করে রাজীব বলল, 'আর্টিস্টরা এখন ওয়াশ করছে গ্রীনরুমে। সবকিছু গুছোতে ওদের আধঘণ্টা মত লাগবে। তার মধ্যে কথাটা সেরে ফেলতে হবে মিঃ বাজোরিয়া। কারণ আমরা আজকের রাতে পুরোপুরি রেস্ট চাই। কাল সকালের ট্রেনেই...।'

বাজোরিয়ার বয়েস আন্দাজ পঞ্চাশ। কিন্তু দেখলে মনে হয় যেন কাঁচা-পাকা চুলওয়ালা পঁয়ত্রিশ বছরের তরুণ। গায়ের রঙ দুধে-আলতায়, মোটাসোটা নাকখানি পাকা টম্যাটোর মত। পরনে দামী সিল্কের কুর্তা আর পাঞ্জাবি। মথার চুল ব্যাক্‌ব্রাশ করা। কপালে সাদা চন্দনের টিপ। গলায় সোনার চেন চিক চিক করছে।

বাজোরিয়া ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভুরভুরে সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে ঘরময়। পান ও আতরের সুবাস মেশামেশি। চেয়ারে বসেই বাজোরিয়া হাসল। আর তখনই রাজীব দেখতে পেল, ওর ওপরের মাড়ির একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। পকেট থেকে একটি দামী ম্যাক্‌ডোয়েলের বোতল বের করে বাজোরিয়া বলল, 'উড য়্যু লাইক্ টু ড্রিংক? মানে, আপনার আজকের এই সাক্‌সেস্‌টাকে সেলিব্রেট—।'

রাজীব ইতস্তত করে। বলে, 'ইন্ ফ্যাক্ট, আমি বড় একটা ড্রিংক করিনে। অবশ্য কোনও রিজার্ভেশন নেই। তবে, যা করবার তাড়াতাড়ি করতে হবে। আমার হাতে সময় নেই মোটেই।'

দুটো গ্লাসে মদ ঢালল বাজোরিয়া। টেবিল থেকে জলের জাগ্‌টা এনে জল মেশাল গ্লাসে। দরজাটা সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিয়ে এল।

গেলাসে প্রথম চুমুক দিয়েই সরাসরি কাজের কথায় এল বাজোরিয়া।

'আপনাদের 'জলকেলি-নাচ'টা আমাদের 'আনন্দম্' সংস্থার পক্ষ থেকে অভিনয় করাতে চাই, মিঃ চৌধুরী।'

জবাবে রাজীব একটা হাই তুলল। '—কবে?'

'সম্ভব হলে এই মাসে।'

'এই মাসে? স্যরি। এই মাসে সম্ভব নয়।'

'তাহলে মার্চের লাস্ট উইকে।'

'মার্চে.. মার্চে...' একখানা সিগারেট ধরায় রাজীব। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'বিশের মধ্যে হলে, হতে পারে। তেইশে আমি স্টেট্‌স্-এ যাচ্ছি উনিস দিনের কাল্‌চারাল ট্যুরে।'

'তাই নাকি? কনগ্রাচুলেশন্‌স মিঃ চৌধুরী।' বাজোরিয়া তার রত্নখচিত হাতখানি বাড়িয়ে দেয় রাজীবের দিকে।

'থ্যাঙ্ক য়্যু ।' রাজীব শেষ চুমুক মারে গেলাসে ।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার গ্লাস ভরে দেয় বাজোরিয়া । রাজীবের মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে । সব কিছু যেন এলোমেলো, অগোছালো লাগছে । অনেক কিছু ভাবনা, আবছা-আবছা, টুকরো-টুকরো, ঘুরে বেড়াচ্ছে মগজের মধ্যে । সুতপার মুখখানি তার মধ্যে ঢুকতে চাইছে বারবার, পারছে না । রাজীব বারবার কপালে হাত বোলাতে থাকে । অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বাজোরিয়া বলে, 'আপনি দেখছি খুবই টায়ার্ড । এ সময়ে আপনাকে ট্যাক্স করতে খুব খারাপ লাগছে ।'

রাজীবের মনের মধ্যে তখন মৃদু তোলপাড় চলছে । টেলিফোনে সুতপার শেষ কথাগুলো এখনও কানে বাজছে । সুতপা কি বিদ্রূপ করছিল তাকে ? গেলাসে লম্বা চুমুক দেয় রাজীব। ঈষৎ অন্যমনস্ক গলায় বলে, 'নেভার মাইণ্ড, নেভার মাইণ্ড । আই অ্যাম অলওয়েজ ফ্রেশ লাইক আ লাইম্ ।'

অল্প অস্বাভাবিক লাগছে রাজীবকে । বাজোরিয়া লক্ষ্য করে । দ্রুত কাজের কথায় ফিরে যায় সে ।

'তাহলে শো'য়ের তারিখটা ঠিক করতে হয় ।'

'হুঁ ।' সংক্ষিপ্ত জবাব দেব রাজীব ।

বাজোরিয়া বলে, 'মার্চের তৃতীয় রোববারে হতে পারে কী ?'

'দাঁড়ান । এক মিনিট ।' অ্যাটাচী-কেস থেকে ডায়েরিখানা বের করে রাজীব । দেখে টেখে বলে, 'হতে পারে ।'

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বাজোরিয়ার মুখখানি, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ।

রাজীব শুধোয়, 'কোন্ হলে করতে চান ?'

'আপনি যে হলে বললেন ।'

'এই হলই ভাল । অল অ্যামিনিটিজ্ অ্যাভলেবল্ ।'

'তাই হবে ।'

'আপনাদের কি চ্যারিটি শো ?'

'না, না । স্রেফ রিক্রিয়েশন ।'

'টিকিট সেল্ করবেন ?'

'আরে না, না । 'আনন্দম্' থেকে খরচটা দেওয়া হবে । তবে এণ্ট্রি লিমিটেড । কেবল সংস্থার মেম্বাররা, কিছু ভি-আই-পি এবং কিছু ডিস্টিংগুইস্ড় গেস্ট । ব্যস্ ।'

একটা সিগারেট ধরায় রাজীব । সেই ফাঁকে বাজোরিয়া তৃতীয় বারের জন্য গ্লাসখানি ভরে দেয় ।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে আড়চোখে সেটা দেখছিল রাজীব । মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলে, 'হুইস্কিটা বেশি খাওয়া ঠিক নয় মিঃ বাজোরিয়া । কিডনির বারোটা বাজিয়ে দেয় । কথায় বলে, গলায় পৌঁছুনোর আগেই নাকি হুইস্কি কিডনিতে পৌঁছে যায় ।'

কথাগুলো বলছিল বটে রাজীব, কিন্তু খুব সিরিয়াসলি বলছে বলে মনে হয় না বাজোরিয়ার।

বাজোরিয়া সপ্রতিভ হাসে । বলে. 'কিডনি ড্যামেজ হওয়াটা কোনও প্রব্লেমই নয় ।

আজকাল কিডনি কিনতে পাওয়া যায় পয়সা দিলেই । দু'দিন বাদে দেখবেন, আর্টিফিসিয়াল কিডনিতে ভরে যাবে ওষুধের দোকানগুলো । কিংবা, আমেরিকায় যাচ্ছেন তো, দেখুন গে, হয়তো ওখানে বাজার ছেয়ে গ্যাছে অ্যাদ্দিনে ।'

দু'জনে একসঙ্গে হাসল হো-হো করে, খুব উচ্চাঙ্গের হাসি ।

আরও দু'চারটে এলোমেলো কথার পর বাজোরিয়া টাকার কথাটা তোলে ।

রাজীবের ওটাই হল দুর্বল জায়গা । আর্টটা যতখানি বুঝেছে, ব্যবসাটা ততখানি রপ্ত হয় নি । তার ফলে ঝানুলোকদের কাছে কেবল ঠকতেই আছে । হবেই তো, বাংলার মাস্টারের দ্বারা কি ব্যবসা হয় ?

গেলাসে একটা লম্বা চুমুক দেয় রাজীব । সিগারেটে বার দুই টান মারে । ধোঁয়া ছাড়ে গল্‌গল্‌ করে । বার কয় খুক খুক করে কাশে ।

'তিরিশ হাজার ।'

'অ্যাঁ ?' আঁতকে ওঠে বাজোরিয়া । চোখদুটো তার বিস্ময়ে গোল হয়ে যায় । বলে, 'তিরিশ হা-জার !'

'চমকে ওঠার কি আছে ?' ছাইদানিতে অলস হাতে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলে রাজীব, 'একটা থার্ড ক্লাশ যাত্রার দলকেই তো আপনারা ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার দেন । দেন না ?'

'সেটা অবশ্যি মিথ্যে বলেন নি— ।' বাজোরিয়া বিড় বিড় করে বলে, 'তবে আমি শুনেছিলাম আপনাদের রেট নাকি অনেক কম । চার-পাঁচ হাজারের মধ্যে । কোন্‌ একটা কাগজে যেন আপনার একটা ইন্‌টারভিউ পড়েছিলাম মাস দুয়েক আগে । তাতে আপনি দলের আয়-ব্যয়ের একটা ইকোনোমিক্স দিয়েছিলেন । ওতেও আপনাদের রেট পাঁচ-ছ' হাজারের মধ্যে বলা ছিল ।'

'ভুল দেখেন নি ।' আধপোড়া সিগারেটখানা ছাইদানিতে গুঁজতে গুঁজতে রাজীব বলে, 'তবে সম্প্রতি আমরা রেট রিভাইজ করেছি । আট হাজার । দলের ম্যানেজারকে ঐ টাকাটাই দেবেন । বাকিটা আমাকে । আপনি তার থেকে কমিশন পাবেন । টুয়েন্টি পারসেন্ট । বুঝতেই পারছেন ঐ বাইশ হাজারের কোনও রসিদ পাবেন না ।'

বাজোরিয়া পাক্কা ব্যবসায়ী । 'হুঁ' করবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে ফেলেছে ব্যাপারটা । কিন্তু বিশ্বেস করতে পারছে না । রাজীবের পুরো কথাগুলো কান দিয়ে মগজে নিয়ে যেতে খানিক সময় লাগে তার । সেই ফাঁকে রাজীব আর একখানা সিগারেট ধরায় । বাজোরিয়া গলাটা বার কয়েক ঝেড়ে নেয় । গেলাসটা হাতে নিয়ে খানিক নাড়াচাড়া করে । তারপর বলে, 'একটু কম করতে হবে মিঃ চৌধুরী । আমাদের অতোটা বাজেট নেই ।'

'দূর মশাই, বাজেট আবার কি ?' রাজীব ফুতকারে উড়িয়ে দেয় কথাটা ।' 'ফূর্তি করবেন তো ! ফূর্তিকে বাজেটের শেকলে বাঁধতে নেই ।' মুচকি হাসে রাজীব ।

'তবুও, অতটা আমরা পেরে উঠব না মিঃ চৌধুরী ।'

'বেশ । কতটা পারবেন ?' রাজীব সরাসরি চোখ রাখে বাজোরিয়ার চোখে ।

'বড় জোর পনেরো হাজার । এর মধ্যে ব্ল্যাক আর হোয়াইটের প্রপোরশন্‌টা আপনিই ঠিক করে দিন ।'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায় রাজীব। পা' দুটো অল্প টলছিল। চাপা গলায় বলে, 'স্যরি। আপনি আসতে পারেন।'

গ্রীনরুম থেকে বেরিয়ে রাজীবের ঘরের দিকে আসছিল সুচাঁদ। মনটা ফুরফুরে লাগছে। আজকের পালাটা ভীষণ উতরেছে। পাঁচ হাজার টাকা পাচ্ছে ওরা আজকের শো'তে। হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে একটা পাতি হিসেব কষছিল সুচাঁদ। দলের বত্রিশজন পাবে একশো টাকা করে। যাতায়াত, খাওয়া-দাওয়া, হোটেলভাড়া ইত্যাদিতে লাগবে হাজার টাকার মতো। বাকি রইলো আটশো। সংঘের ফাণ্ডে জমা পড়বে সেটা। প্রতি শো' থেকে এমনি করে কিছু কিছু জমা পড়লে দু'এক বছরের মধ্যে গড়ে তোলা যাবে, গজাশিমুল স্বয়ম্ভর সমিতি। তাতে ঋণ-দাদনের ব্যবস্থা থাকবে। ধর্মগোলা হবে। তারপর সবাইয়ের জন্য পড়াশুনোর ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, আরো, আরো অনেককিছু হবে। সেসব রয়েছে সুচাঁদের স্বপ্নের মধ্যে। বছর পাঁচেকের মধ্যেই, সুচাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, গজাশিমুলের ভোলই বদলে ফেলা যাবে। মাস্টারদা তো ফের টাকাটা বাড়িয়ে আট হাজার হাঁকছে। তবু সুচাঁদের বুকের মধ্যে এক সূক্ষ্ম কাঁটা নিরন্তর খচখচ করে, সইবে তো, অত সুখ, গজাশিমুলের মানুষগুলোর কপালে!

এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দলকে নিয়ে হোটেলে ফেরা দরকার। বাইরে মিনিবাস ঘনঘন হর্ন দিচ্ছে।

রাজীবের কামরার মুখে এসে থমকে দাঁড়ায় সুচাঁদ। কামরাটা ভেতর থেকে বন্ধ। ঘরের মধ্যে রাজীব আর বাজোরিয়ার মধ্যে জোর কথা চালাচালি চলছে।

সুচাঁদ বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে রাজীবের উত্তেজিত গলার স্বর, 'কি তখন থেকে পনেরো হাজার, পনেরো হাজার করছেন মশায়? পনেরো হাজারে এসব জিনেস মেলেনা।'

বাজোরিয়ার গলা থেকে অনুনয় ঝরে পড়ছিল, 'বেশ। আরো তিনহাজার নিন। দলের এক হাজার আপনার দু'হাজার। তাহলে, সাকুল্যে দলের দাঁড়াল ছয়। আপনার বারো। এতেই রাজি হয়ে যান মিঃ চৌধুরী, প্লীজ। বড় আশা নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। সংস্থার কাছে ভারি বেইজ্জত হোবে হামার।'

ফস্ করে দেশলাই জ্বালাবার আওয়াজ ভেসে আসে। রাজীব তরল গলায় বলে, 'এ দলে জনা বারো মেয়ে আছে। সবগুলোই এক একটি জুয়েল। তার মধ্যে একটা ডব্‌কা ছুঁড়ি আছে, দেখেছেন তো? ওকে দেখলে আপনার বড়বাজারের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে মশাই। ওর এক-একখানা বুকই আঠারো হাজারে বিকোবে।' বলতে বলতে সহসা অধৈর্য হয়ে ওঠে রাজীব, 'নিন, উঠুন দেখি। এখন হোটেলে ফিরতে হবে। টিমকে রেস্ট দিতে হবে। আপনারা বরং —।' আলতো হাই তোলে রাজীব, 'আপনারা বরং ঐ 'রেড-ফক্স'-এ গিয়ে, ঐসব ঝোলা বেগুন-পোড়াই দেখুন গে'। 'জলকেলি-নাচ' দেখে আর লাভ নেই। 'জলকেলি-নাচ' দেখতে হলে পঁচিশের কম হবে না। দলের আট। আমার সতের। আরে মশাই, ভাজা খেতে হলে একটু তেলের ব্যয় হবেই। আপনারা আবার চান 'হাতে-গরম-ভাজা'।

ফুটপাথ বদল হয় মধ্যরাত্রে

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল সুচাঁদের দল। যে যার কাঁধে লটবহর। রবীন্দ্রসদন থেকে হনহনিয়ে

বেরিয়ে এল রাজীব । ব্যস্ত গলায় বলল, 'একি ! এখনো মালপত্তর মিনিবাসে তোল নি ? রাত কত হল, খেয়াল আছে ?'

সুচাঁদের দল রাজীবকে নির্নিমেষ দেখছিল । স্পষ্টতই ভাষা হারিয়ে ফেলেছে ওরা । একটা হৃষ্টপুষ্ট ঘুণপোকা বুকের মধ্যে নির্মম ভাবে কুরছে ।

দু'চোখ মুছে নিয়ে সুচাঁদ বলে, 'মিনিবাসে আমরা নাই চড়বো আইজ্ঞা । হুটেলে বি নাই যাব। আপনি যান হুটেলে, আমরা চল্ল্যম্ ঘরের পানে । হু-ই, বাজোরিয়া আপনার লেইগ্যে গাড়ি লিয়ে খাড়াই আছে ।'

রাজীব স্তম্ভিত হয়ে যায় ।

'সুনীলদা, বহুদিন ধইরে বইল্যে আইছে বহুত কথা, পুরাপুরি বিশ্বাস করি নাই আমরা। ইখন ত লিজের কানেই শুনলম সব, আর ত'কুনো সংশয় নাই ।'

এতক্ষণে বুঝি সামান্য ধাতস্থ হয়েছে রাজীব, নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে যথাসম্ভব । বলে, 'এসব কথা সুনীলই বলেছে তবে !'

'শুধু ই-কথাই লয়, আরো আনেক আনেক কথা বইল্যে আইছে উ, আইজ দু'বছর । পয়লা চটকায় বিশ্বাস করি নাই, সংশয়ে দুলেছি । ধীরে ধীরে অবশ্য সন্দ হচ্ছিল, কিছো একটা গুলমালিয়া বেপার-সেপার চইল্‌ছে । আইজ ত চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল্যাক । ইখন বুঝতে পারছি সুনীলদার আন্য কতাগুলাও মিছা লয় ।'

'কি অন্য কথা ? বল্ । চুপ করে আছিস কেন ? কি করেছি আমি ? চুরি, নাকি ডাকাতি, রাহাজানি— !'

সহসা অস্বাভাবিকভাবে জ্বলে ওঠে সুচাঁদ । গলায় তীব্র ঘৃণা আর দ্বেষ ফুটিয়ে বলে, 'ওগুলার চেইয়েও ঢের বেশি । মাস্টারদা, তুমি টাকা-পইসা লিয়ে যা কচ্ছিলে কচ্ছিলে । কিন্তু সুনীলদা যেদিন বইলল্যাক, রঙীর উদোম শরীরের ফোটো খুলা-বাজারে বিক্‌কিরি হচ্ছে বিদেশে — ।' বলতে বলতে সুচাঁদের দুটি চোখ ভরে আসে জলে । অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারে না সে । পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকে লটবহরের দিকে ।

'কোথায় যাচ্ছিস ?'ভাঙা গলায় শুধোয় রাজীব ।

'ইবার থিক্যে আপনার পথ, আমাদ্যার পথ ভিনো হইয়েঁ গেল্যাক মাস্টারদা । লিজেদ্যার ভাবনা ইবার থিকে লিজেরাই ভাবব । ডুবি ডুবব, ভাসি ভাসব ।'

শেষ শীতের মধ্য রাত্রে, রাজধানীর কেন্দ্র বিন্দুতে, খোলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে রাজীবের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম । শক্ত চোয়ালখানি ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়ছে দ্রুত । তার মধ্যেও শেষ চেষ্টা চালায় সে । বলে, 'সুনীল নিশ্চয়ই খুবই পটিয়ে ফেলেছে তোদের। কিন্তু ও যে কোন্ চরিত্রের ছেলে—।'

'উয়াকে ক্যানে শুধু মুদু টানছেন ইয়ার মধ্যে ।' সুচাঁদ খুব স্পষ্ট ভাষায় বলে, 'আপনি বোধ লেয় জানেন না, মাসটাক আগে চাকরি লিয়ে হরিয়ানায় চইলে গেইছে উ ।'

মাথায় একরাশ বোঝা নিয়ে মধ্যরাতে সুচাঁদের দল গুটি গুটি হাঁটতে থাকে হাওড়া স্টেশনের দিকে ।

এ বুঝি এক অনন্ত পথ, গন্তব্যে পৌছুতে এমনিতরো কত হাজার রাত্রি যে নিঃশেষে

ক্ষয় হয়ে যাবে তার বুঝি ইয়ত্তা নেই........ ।

ওরা সারবন্দী হেঁটে যায় নির্জন ফুটপাথ ধরে । পেছনে রাজীব, বজ্রাহতের মত, নিষ্পলক, দেখতে থাকে ওদের পথ চলার দৃশ্য ।

একসময় রাজীবের দৃষ্টির আড়ালে পুরোপুরি হারিয়ে যায় ওরা ।